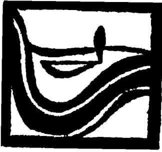


প্রথম প্রকাশ: বৈশাখ, ১৩৬৭

প্রকাশ করেছেন
চিত্তরঞ্জন সাহা
মুক্তধারা
[স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ]
৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢাকা—১
বাংলাদেশ

প্রচ্ছদ এঁকেছেন
আলেম আনসারী

ছেপেছেন
প্রভাংশুরঞ্জন সাহা
ঢাকা প্রেস
৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢাকা—১
বাংলাদেশ।

মা ও বাবার স্মৃতিতে

"নিবিড় রাতের নিভৃত বীণায়
কী বাজায় কিবা জানি"

ভূমিকা

পরম প্রীতিভাজন ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ দাসের 'নরেশচন্দ্র : জীবন ও সাহিত্য' গ্রন্থটির কোনো ভূমিকার প্রয়োজন ছিল বলে মনে করি না। প্রধান কারণ : গ্রন্থটির বিষয়মাহাত্ম্য। তথাপি ডক্টর দাসের আগ্রহে সম্মত হয়েছি, তার কারণ আছে।

যখন এই ভূমিকা লিখছি এবং গ্রন্থটি প্রকাশিত হচ্ছে, তখন অক্টোবর (নভেম্বর) বিপ্লবের আর-একটি দুনিয়াজোড়া উৎসব চলছে। ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের রুশবিপ্লব এই শতাব্দীর ইতিহাসের মহত্তম ঘটনা বললে অত্যুক্তি হবে না। এর প্রভাব ও প্রেরণা তৎক্ষণাৎ বিশ্বব্যাপী অনুভূত হয়েছিল। মানবসমাজের সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরবর্তী উল্লেখযোগ্য অগ্রবর্তিতার ইতিহাসেও এর প্রভাব ও প্রেরণা অনুভব করা যায়। বাংলা সাহিত্যও ব্যতিক্রম ছিল না। প্রমাণ, কবিতায় নজরুল, কথাসাহিত্যে নরেশচন্দ্র, সাংবাদিকতা ও সাহিত্য সাংগঠনিক ক্ষেত্রে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ (বিষয়টি 'সত্য যে কঠিন' গ্রন্থের 'সাহিত্য-বিতর্কের নেপথ্যে' শিরোনামযুক্ত সুদীর্ঘ প্রবন্ধে বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে)। এদিক থেকে নরেশচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য প্রসঙ্গে আলোচনার ঐতিহাসিক গুরুত্ব তর্কাতীত বলেই বিশ্বাস। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কথাসাহিত্যে নবীন ভাবধারার সূত্রপাত ঘটান নরেশচন্দ্র। তাঁর সাহিত্যিক সিদ্ধিও অস্বীকার করা যাবে না।

তথাপি, অবিশ্বাস্য মনে হলেও ঘটনা যে, সুপরিচিত গ্রন্থ 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর' সহ বাংলা কথাসাহিত্য আলোচনায় এই নরেশচন্দ্রই বস্তুত উপেক্ষিত। নরেশচন্দ্রের বইগুলি বহুকাল দুষ্প্রাপ্য। সেজন্য পাঠকসাধারণ তাঁকে ভুলে যেতে পারেন। কিন্তু সাহিত্য-সমালোচকগণের বিস্মরণের হেতু কী? সরোজকুমার রায়চৌধুরী, রমেশচন্দ্র সেন, অমরেন্দ্র ঘোষ প্রমুখও একইভাবে বিস্মৃত।

এই অবস্থায় ১৯৭৪ খ্রীস্টাব্দে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের বন্ধুবর ডক্টর অশোকনাথ বসু ইতিহাস বিভাগের তদানীন্তন গ্রন্থাগারিক (এখন তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে কর্মরত) শ্যামাপ্রসাদ দাসের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেন এবং বলেন, শ্যামাপ্রসাদ আমার তত্ত্বাবধানে গবেষণা করতে আগ্রহী। বাংলা সাহিত্যের ব্যাপক পরিপ্রেক্ষিতে নরেশচন্দ্র প্রসঙ্গে কাজ করতে হবে শুনে গভীর আগ্রহ বোধ করি এবং পরে নরেশচন্দ্র প্রসঙ্গেই মনঃসংযোগ করতে বলি। গবেষক সে কথায় সম্মত হন। শেষ পর্যন্ত আমাদের গবেষণার বিষয় স্থির হয়—নরেশচন্দ্র : জীবন ও সাহিত্য।

নরেশচন্দ্র সম্পর্কে অল্পবয়সেই আগ্রহ ও কৌতূহল জাগিয়ে দিয়েছিলেন প্রয়াত পিতৃদেব। নরেশচন্দ্র প্রথম থেকেই ভুলভাবে নিন্দিত ও প্রশংসিত হয়ে এসেছেন।

প্রথমদিকে প্রশংসাই পেয়েছেন। পরে ক্রমশ তিনি কমিউনিস্টদের সংস্পর্শে এসে যান, ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে ৬-৭ ফেব্রুয়ারি কৃষ্ণনগরে নিখিল বঙ্গীয় প্রজা সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। এই সম্মেলনে 'বঙ্গীয় শ্রমিক ও কৃষক দল' গঠনের প্রস্তাব আলোচিত হলেও 'বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল' গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের সম্পূর্ণ বাইরে এসে এই দল গঠিত হলো। পরে ইংরেজিতে দলের নাম হলো 'দ্য ওয়ার্কার্স এ্যাণ্ড পেজাণ্টস পার্টি অব বেঙ্গল'।

নরেশচন্দ্রের জীবনে ও কর্মে কমিউনিস্ট সংসর্গ দানা বেঁধে উঠতেই তিনি প্রতি-ক্রিয়াশীল ও কায়েমী স্বার্থবাদীদের চক্ষুশূল হয়ে পড়লেন। তেইশে ফাল্গুন ১৩৩৩ (মার্চ ১৯২৭) বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথকে লেখা সজনীকান্ত দাসের চিঠি থেকেই তার বহিঃপ্রকাশ ঘটতে থাকে। কমিউনিস্ট বা কমিউনিস্ট-ভাবাপন্ন, এই অভিযোগ প্রকাশ্যে না তুলে নরেশচন্দ্রের চরিত্রহননের জন্য বিরুদ্ধবাদীরা সাহিত্যে অশ্লীলতার অভিযোগে তাঁকে আসামীর কাঠ-গড়ায় তুলে দিল। যে সংস্কারমুক্ত দৃষ্টির জন্য এবং শোষণ ও অবিচারের বিরুদ্ধে যে সোচ্চার প্রতিবাদের জন্য তাঁর প্রাপ্য ছিল প্রশংসা, সেটাকেই অপরাধ সাব্যস্ত করতে হলে মিথ্যাচার অনিবার্য। তাই রটিয়ে দেওয়া হলো, নরেশচন্দ্রই বাংলা সাহিত্যে অশ্লীলতার জনক ও পৃষ্ঠপোষক। সাম্যবাদী দর্শনে বিশ্বাসী ও মুজফ্ফর আহ্মদ এর সহযোগী বন্ধু নজরুলের নামটাও জুড়ে দেওয়া হলো। কমিউনিস্ট বিরোধিতার উদ্দেশ্য গোপন রাখার জন্য সমকালীন আরো দু' একটি দুর্বল ও অপরিণত রচনার লেখকের নামও যোগ করা হলো। সমগ্র বিষয়টির তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ 'সাহিত্য-বিতর্কের নেপথ্যে' প্রবন্ধেই আছে। এখানে শুধু বলা দরকার, নরেশচন্দ্র তথা প্রগতি সাহিত্যের চরিত্রহননমূলক অপচেষ্টায় প্রতিক্রিয়াশীলরা শেষ পর্যন্ত দু'ভাবে সিদ্ধকাম হয়েছিল। প্রথমত, প্রায় সকলেই বিভ্রান্ত হয়ে এ পর্যন্ত নরেশচন্দ্রের রচনাবলীকে 'অশ্লীল' ও অকিঞ্চিৎকর বলে গণ্য করে এসেছেন। দ্বিতীয়ত, স্বয়ং নরেশচন্দ্রও শেষ পর্যন্ত আর মার্কসবাদের অনুশীলনে ধারাবাহিক ছিলেন না। সাময়িক হলেও দুটো ক্ষতিই প্রগতিপন্থার। প্রতিক্রিয়ার প্রচারযন্ত্রের দূষণশক্তি কী মারাত্মক। 'হয়'কে 'নয়' আর 'নয়'কে 'হয়' করা থেকে আরম্ভ করে বন্ধু ও আত্মীয়-বিচ্ছেদ সবই তার পক্ষে সম্ভব। তত্ত্বে ও জীবনাচরণে আদর্শনিষ্ঠ ও ধারাবাহিক থাকার সাধনাই কঠিনতম।

অশ্লীলতার রটনা সত্ত্বেও অল্প বয়সেই নরেশচন্দ্রের লেখা পড়বার সুযোগ পাওয়া গিয়েছিল প্রয়াত পিতৃদেবের ঔদার্যে। তিনি ছিলেন আমার সব চিন্তা, কর্ম ও আনন্দের প্রধান উৎস ও প্রেরণা। পুরোপুরি ফ্রেণ্ড, ফিলজফার এ্যাণ্ড গাইড। নিজে ছিলেন গ্রন্থাগারিক। ব্যাপক পড়াশোনা ও সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে অবাধ মেলামেশার ক্ষমতা ছিল তাঁর। আর ছিল ধারাবাহিক দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে নিয়ত সংগ্রামের অভিজ্ঞতা। সম্ভবত এই সব কারণেই তিনি ছিলেন বহু প্রচলিত সংস্কার থেকে মুক্ত। তাঁর কর্মস্থলের গ্রন্থাগারে পাঠ্য-অপাঠ্য বই ছিল বিস্তর। যথেচ্ছ নাটক-নভেল পড়ার সুযোগ পাওয়া

গিয়েছিল বিদ্যালয়পর্বেই। নরেশচন্দ্রের কথাসাহিত্যের সঙ্গেও তখনই পরিচয় ঘটে যায়। বাবার কাছে তখনই শুনেছি অতুলচন্দ্র গুপ্তের কথা, মুজফ্‌ফর অহ্‌মদ-এর কথা।

শ্যামাপ্রসাদ গ্রন্থাগারিক এবং নরেশচন্দ্র তাঁর মনোযোগের বিষয়। এককথায় রাজি হই। শ্যামাপ্রসাদ পরিশ্রমী মানুষ। নিষ্ঠাবান। দিনে-দিনে বহু তথ্য সংগ্রহ করলেন। নরেশচন্দ্রের দুষ্প্রাপ্য যাবতীয় বই পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে আমিও পড়লাম। কিছু বই অপঠিত ছিল। সব তথ্যও জানা ছিল না আমাদের। নরেশচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ পত্রাবলীর সন্ধানে শান্তিনিকেতনে যাই। রবীন্দ্রভবনে প্রাপ্ত চিঠিগুলির প্রতিলিপি সংগ্রহে আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন বিশ্বভারতীর তদানীন্তন উপাচার্য ডক্টর সুরজিৎ সিংহ, তাঁর পত্নী ও নরেশচন্দ্রের কন্যা ডক্টর পূর্ণিমা সিংহ এবং সর্বোপরি বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য অধ্যাপক ও লেখক, রবীন্দ্রভবনের তদানীন্তন ডিরেক্টর ও বিশ্বভারতীর রবীন্দ্র-অধ্যাপক পরমশ্রদ্ধাস্পদ শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়। নরেশচন্দ্র প্রসঙ্গে শ্যামাপ্রসাদের তত্ত্বাবধায়ক যদি আমি, আমার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ।

প্রকাশিত এই গ্রন্থটি লেখকের মূল গবেষণানিবন্ধের সংক্ষিপ্ত রূপ। প্রকাশকালে পরিমার্জনার সুযোগ লেখক নানাকারণে সেভাবে গ্রহণ করতে না পারলেও পাঠক-সাধারণের কথা মনে রেখে নরেশচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্যের পরিচিতিমূলক অংশটি অধিক পরিমাণে রক্ষিত হয়েছে। 'সাহিত্য বিতর্কের নেপথ্যে' প্রবন্ধটি পাঠ করে সাহিত্য অকাদেমির স্থানীয় কর্তৃপক্ষের তরফে ডক্টর শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় অকাদেমি আয়োজিত নরেশচন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে আমাদের বক্তা হিসেবে আমন্ত্রণ করেন। কলকাতার রবীন্দ্রসদন কর্তৃপক্ষও অনুরূপ অনুষ্ঠানে আমাকে বক্তারূপে আহ্বান জানিয়েছিলেন এসব কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। নরেশচন্দ্র প্রসঙ্গে অন্তত তিনটি বিস্তারিত প্রবন্ধ উল্লেখ্য—একদা-বিশ্রুত অধুনা-বিস্মৃত অবিস্মরণীয় নরেশচন্দ্র (সিসৃক্ষা, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, কার্তিক ১৩৮৮), গল্পকার নরেশচন্দ্র গল্পগুচ্ছ, পঞ্চম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, গ্রীষ্ম ১৩৮৯) এবং সাহিত্য-বিতর্কের নেপথ্যে (নন্দন, আষাঢ়-শ্রাবণ, ১৩৮৯ ও শারদ সংখ্যা, ১৩৮৯)। সাহিত্য-বিতর্কের 'নেপথ্যে প্রবন্ধটির পূর্ণাঙ্গ রূপ 'সত্য যে কঠিন' (অক্টোবর ১৯৮২) গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে, সে কথা আগেই বলেছি।

নরেশচন্দ্র তথা তাঁকে কেন্দ্র করে প্রগতিসাহিত্যের একটি বিস্মৃত অধ্যায়ের আলোচনার রীতিমতো অবতারণাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। সে উদ্দেশ্য বহুলাংশে সফল হয়েছে। শ্যামাপ্রসাদের নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের ফলে লব্ধ নানা তথ্য সে কাজে অপরিহার্য ছিল। উল্লিখিত প্রবন্ধগুলিতেও নরেশচন্দ্রের জীবনপ্রসঙ্গে ব্যবহৃত তথ্যাবলীর ক্ষেত্রে শ্যামাপ্রসাদের উপরেই পুরোপুরি নির্ভর করেছি। শ্যামাপ্রসাদের গবেষণা ও প্রকাশিত এই গ্রন্থের গুরুত্ব প্রধানত এখানেই নিহিত। শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি কর্মীদের একজন হিসেবে শ্যামাপ্রসাদকে এই কারণেই অভিনন্দিত করছি। এই অভিনন্দন তাঁর প্রাপ্য।

গ্রন্থটি প্রকাশের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী ফ্রন্ট সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের আনুকূল্যই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এই সূত্রে বামপন্থী ফ্রন্টের গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মসূচীর প্রতি সমর্থন ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ অবান্তর হবে না।

নরেশচন্দ্র ও তাঁকে কেন্দ্র করে গণতান্ত্রিক লেখক-শিল্পীদের অনুসৃত আদর্শ ও কর্মকাণ্ডের প্রতি মানুষের আগ্রহ ও সমর্থন ক্রমবর্ধিত হলেই গ্রন্থপ্রকাশ সার্থকতামণ্ডিত হবে।

লেখকের নিবেদন

নরেশচন্দ্র প্রসঙ্গে অধ্যাপক ডক্টর জ্যোতির্ময় ঘোষ তাঁর একটি প্রবন্ধের শিরোনামেই বলেছেন—'একদা-বিশ্রুত অধুনা-বিস্মৃত অবিস্মরণীয় নরেশচন্দ্র'। এত সংক্ষেপে নরেশচন্দ্রের এত সঠিক মূল্যায়ন কেউ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। সত্যিই, ডঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তকে আজকের পাঠক ভুলে গেছেন। কিন্তু একদা এই নরেশচন্দ্র বাস্তবধর্মী প্রগতিপন্থী দুঃসাহসিক প্রবন্ধ ও উপন্যাস লিখে প্রচুর নিন্দা এবং অভিনন্দন দুই-ই লাভ করেছেন। বাংলা সাহিত্যের আসরে তাঁর সোচ্চার প্রবেশ এবং নিঃশব্দ প্রস্থান নিঃসন্দেহে কৌতূহলোদ্দীপক।

'নরেশচন্দ্র : জীবন ও সাহিত্য' গবেষণাগ্রন্থ রচনার প্রাথমিক কারণও আমার নরেশচন্দ্র সম্পর্কে কৌতূহল। বর্তমান গ্রন্থটি আমার গবেষণানিবন্ধের সংক্ষিপ্ত রূপ। মূল গবেষণানিবন্ধটি বিশ্রুত শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক, কল্যানী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রথম অধ্যাপক-প্রধান ডক্টর জ্যোতির্ময় ঘোষ মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে রচিত হয়েছে। বিভিন্ন কর্মব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকে তিনি তাঁর অমূল্য সযত্ন উপদেশ দিয়ে, দোষ ত্রুটি সংশোধন করে দিয়ে যেভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন, তা সঠিকভাবে প্রকাশ করার মতো ভাষা আমার নেই। আমার চিন্তাশক্তি ও ক্ষমতার উপর আস্থা রেখে স্নিগ্ধ সম্প্রীতির সঙ্গে এই গবেষণার সকল পর্যায়েই ডক্টর ঘোষ আমাকে যথোচিত স্বাধীনতা দিয়েছেন। পরিশেষে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধে ড. ঘোষ এই গ্রন্থের মূল্যবান ভূমিকাটিও লিখে দিয়েছেন। গ্রন্থ রচনা থেকে প্রকাশ পর্যন্ত প্রত্যেকটি পর্যায়ে তাঁর সক্রিয় তত্ত্বাবধান কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি।

আমার এই গবেষণানিবন্ধটি ১৯৮১ সালের সেপ্টেম্বরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পি-এইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য অনুমোদিত হয়েছে। মূল গবেষণানিবন্ধের অপর দুজন পরীক্ষক ছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যতত্ত্ববিদ, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রবীন্দ্র-অধ্যাপক ও রবীন্দ্রভবনের ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ রায় এবং বিদ্যাসাগর স্মৃতি পুরস্কারপ্রাপ্ত যশস্বী সমালোচক ও গণতান্ত্রিক লেখক-শিল্পী সংঘের সভাপতি শ্রীযুক্ত নারায়ণ চৌধুরী।

এই গবেষণাকর্মে আমাকে উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়েছেন আমার কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধব, আর নরেশচন্দ্রের বহু দুষ্প্রাপ্য রচনা ও উপাদান ব্যবহার করার সুযোগ আমি পেয়েছি আমার তরুণ ছাত্র বন্ধুদের সহায়তায়। এই সাহায্য ছাড়া নরেশচন্দ্রের দুষ্প্রাপ্য রচনা সংগ্রহ করাও আমার পক্ষে অসাধ্য ছিল।

অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'আমাদের সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' স্মরণিকা পত্রটি বহু খুঁটিনাটি তথ্যসংগ্রহে আমাকে বিশেষ সাহায্য করেছে। অধ্যাপক

সত্যেন্দ্রনাথ রায় নরেশচন্দ্র সম্পর্কে আমাকে দু-একটি প্রশ্নে নতুন কিছু চিন্তাসূত্রের সন্ধান দিয়েছেন।

অধ্যাপক গৌতম চট্টোপাধ্যায় নরেশচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক প্রসঙ্গে বিস্তারিত মৌখিক আলোচনার মাধ্যমে আমাকে বিশেষ সাহায্য করেছেন। আমার শ্রদ্ধেয় মাস্টারমশাই ড. আদিত্য ওহ্‌দেদার আমাকে সর্বদাই উৎসাহ ও উপদেশ দিয়েছেন। অক্লান্ত দেশকর্মী সতীশ দাশগুপ্ত মহাশয় তাঁর বাঁকুড়ার আশ্রমে নরেশচন্দ্র সম্পর্কে নানা পারিবারিক ও অন্তরঙ্গ ঘটনা শুনিয়ে আমাকে মানুষ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত সম্পর্কে জানবার সুযোগ করে দিয়েছেন।

এই গবেষণাগ্রন্থ রচনার প্রথম পর্যায়ে উপকরণ সংগ্রহের জন্য আমি অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, অন্নদাশঙ্কর রায় মন্মথ রায়, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত ও রাধারানী দেবীর সঙ্গে যোগাযোগ করে বিভিন্ন সাহায্য পেয়েছি। প্রসঙ্গত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের কৃতী সন্তানেরাও আমাকে বহু অমূল্য তথ্য দিয়ে উপকৃত করেছেন। এ ব্যাপারে আমি বিশেষভাবে ঋণী শ্রীশ্বেতকেতু সেনগুপ্ত ও ড. পূর্ণিমা সিংহের কাছে। শ্রদ্ধেয় বাদলদাও (অধ্যাপক অসীমকৃষ্ণ দত্ত) এই কাজে আমাকে সবসময়েই সাহায্য করেছেন। আর 'দিদিভাই' (অধ্যাপিকা নন্দিতা ঘোষ)-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করলে অমার্জনীয় অপরাধ হবে। সময়ে-অসময়ে তাঁর আন্তরিক আপ্যায়ন থেকে বঞ্চিত হলে এই গবেষণার কাজ নীরস বোঝা মনে হতো।

আমার ভালটু-বাটুল তাদের বাবার সঙ্গে খেলা-বেড়ানো দীর্ঘদিন মুলতুবি রেখে অবসর না দিলে এই কাজ শুরু ও শেষ করা যেত না।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের অনুদানে এই গ্রন্থ প্রকাশ সম্ভব হলো। এই প্রকাশনা প্রসঙ্গে মুক্তকণ্ঠে বামপন্থী ফ্রন্টের প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক কর্ম-প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সর্বশেষে জানাই, আরো যাঁরা এই গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে আমাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছেন, তাঁদের প্রত্যেকের কাছেই আমি চিরঋণী রইলাম।

শ্যামাপ্রসাদ দাস

সূচী

প্রস্তাবনা

রবীন্দ্রযুগ এবং কল্লোলযুগ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্বীকৃত দুটি যুগ। অবশ্য কল্লোল যুগ হিসাবে চিহ্নিত হলেও আসলে তা রবীন্দ্রযুগেরই স্নেহচ্ছায়া পুষ্ট, কেননা রবীন্দ্রযুগের কোন নির্দিষ্ট সীমারেখা টানা সম্ভব নয়। কিন্তু তবু আমরা লক্ষ্য করেছি যে কল্লোল-প্রগতি-কালিকলমের লেখকেরা তাঁদের প্রথম যৌবন উন্মেষের উন্মাদনায় রবীন্দ্র ভাবধারাকে সচেতনভাবে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। সাহিত্যে এই নতুন ধারা প্রবর্তনের পিছনে কী কারণ ছিল তা ভেবে দেখা প্রয়োজন এবং সেই প্রয়োজনের তাগিদে প্রাথমিক অনুসন্ধান করে দেখা গেল, কয়েকটি সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনা, বাঙালী পাঠকের কন্‌টিনেন্টাল সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়, বিজ্ঞানের কয়েকটি নতুন আবিষ্কার এবং কয়েকজন লেখকের রচনা, যাঁরা রবীন্দ্রযুগে সাহিত্যে পদক্ষেপ করলেও নতুন আদর্শে নতুন ভাবনায় সাহিত্যে নবযুগ নিয়ে আসায় প্রয়াসী হয়েছিলেন। সাহিত্যে এই নতুন ভাবধারা নিয়ে আসার আদর্শে যাঁরা অগ্রণী নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত তাঁদের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট ব্যক্তিত্ব। অর্থাৎ রবীন্দ্রযুগ এবং পরবর্তীযুগের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে তিনি রচনা করেছেন এক সেতুবন্ধ।

এই নবযুগের বাংলা সাহিত্য নিন্দিত হল্ সর্বমহল থেকে—একী বিদেশী অনাচার বাংলা

সাহিত্যকে অপবিত্র করার চেষ্টা করেছে ! খড়্গাহস্ত হয়ে সবাই এগিয়ে এল এই নবযুগের সাহিত্যের বিনাশ অভিযানে। তখন তাঁদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন নরেশচন্দ্র, ১৩৩১-১৩৩৫ বঙ্গাব্দের মধ্যে লিখলেন একাধিক প্রবন্ধ, বলাবাহুল্য তাঁর সে সকল প্রবন্ধ নবযুগের কথাসাহিত্যের পক্ষসমর্থনেই লিখিত। আর তিনি নিজেও তাঁর কথাসাহিত্যে নিয়ে এলেন সমাজের বিভিন্ন দিক, বিশ্লেষণ করলেন মনস্তত্ত্ব, আলোচনা করলেন মার্কসবাদ। তাঁর কথাসাহিত্যে নায়কনায়িকার ভূমিকায় দেখা দিল অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ—মিথ্যা রোমান্টিক ভাবধারাকে বিসর্জন দিয়ে রূঢ়বাস্তব সাহিত্যের সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দিলেন নরেশচন্দ্র। ভাবালু স্বপ্নবিভোরতা ছেড়ে তাঁর নায়কনায়িকারা রক্ত-মাংসের শরীর নিয়ে দেখা দিল সাহিত্যে। জমিদার শ্রেণী যে একটা প্রাচীন সংস্কার মেনে উত্তরাধিকার সূত্রে কৃষকদের শোষণ করছে একথাও ঘোষিত হল, মানুষের মনের পাপপ্রবণতার কথাও প্রকট হয়ে উঠলো তাঁর সাহিত্যে। নবযুগের পাঠক স্বীকার করে নিল এই বাস্তবতাকে। তাই প্রকৃত প্রস্তাবে বলা যায় যে নবযুগের এই সাহিত্য প্রবাহের সারথ্য দিয়েছেন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত।

এই গ্রন্থে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের জীবন ও সাহিত্যের পরিচয় নয়টি প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে। বর্তমান প্রসঙ্গটির নাম 'প্রস্তাবনা'। সমগ্র নিবন্ধটির পরিকল্পনা, আলোচনা সূত্র এবং অধ্যায়গুলির পরিচয় প্রদানই এই প্রস্তাবনা প্রসঙ্গের উদ্দেশ্য।

প্রথম অধ্যায়ে তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী অংশে তাঁর শৈশব, শিক্ষা ও পরিবার সম্পর্কে আলোচনা করেছি, যৌবনে ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলন ও বিবিধ ঘটনার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নির্ণয়ে সচেষ্ট হয়েছি এবং পরিণত বয়সে তাঁর বিভিন্ন সম্মানজনক বৃত্তিগ্রহণের উল্লেখ করেছি। প্রসঙ্গত পারিবারিক জীবনে তিনি যে একজন স্নেহশীল পিতা এবং মানুষ হিসাবে বিশেষ সম্মানের অধিকারী ছিলেন সে কথা বলার চেষ্টা করেছি। বৃত্তিতে অধ্যাপক ও পেশায় আইনজীবী হলেও তিনি যে শিল্প-সাহিত্য-রসিক ছিলেন এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিত্রকলা সম্পর্কে তাঁর ধারণা যে কত গভীর ছিল তা-ও এই অধ্যায়ে আমাদের পর্যালোচনার বিষয় হয়েছে। এ সম্পর্কে তাঁর অন্বেষণ ও আলোচনা এবং সুদীর্ঘ সাহিত্যজীবন সেকথাই প্রমাণ করে। সাহিত্য রচনায় তিনি জীবনের প্রতিটি দিকে তাঁর গভীর কৌতূহল ও তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। দৃষ্টান্ত দিয়ে তাঁর এই অনুসন্ধিৎসার কথা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাঁর সাহিত্য-সাধনার প্রেক্ষাপট আলোচনা প্রসঙ্গে সমাজ, সাহিত্য, রাজনীতি—এই তিনটি দিকই দেখাতে চেষ্টা করেছি। সমাজ প্রসঙ্গে দেখানো হয়েছে সচেতনভাবে এড়িয়ে যাওয়া সামাজিক দিকটি সম্পর্কে তাঁর অনুসন্ধিৎসা এবং নবযুগের সাহিত্যে তা উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা। মূলত সমাজের অন্যায় বিধিবিধানগুলির বিরুদ্ধে বক্তব্য উপস্থাপনের ভূমিকায় সাহিত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা নবযুগের সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য। নরেশচন্দ্রের সাহিত্যে নবযুগের সাহিত্যের এই বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে এবং দেশের অর্থনৈতিক বৈষম্য, মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গী, সমাজতত্ত্ব ও মনোবিজ্ঞানে নতুন আবিষ্কারগুলির

সঙ্গে তাঁর পরিচয় সূত্রটিও নির্ণয়ের প্রয়াস এই অধ্যায়ে লক্ষণীয়। নরেশচন্দ্রের সাহিত্যকর্মে এই সব বিষয়ের প্রয়োগ নিতান্তই পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর্যায়ে রয়ে গেলেও উপকরণ হিসাবে তাঁর রচনায় এইগুলি চিহ্নিত হয়ে আছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং তার ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও মানুষের মূল্যবোধের পরিবর্তনও সাহিত্যে প্রতিফলিত হল। এই প্রেক্ষাপটে নবযুগের লেখকেরা—'শিল্পের জন্য শিল্প' এই মতবাদের বিরোধিতা করে, প্রচলিত সাহিত্যের আদর্শবাদী ঝোঁক বহুলাংশে পরিহার করে সমাজবাস্তবতাকে নিয়ে আসতে সচেষ্ট হয়েছে। প্রসঙ্গত সেযুগের সাহিত্য বিশ্লেষণে এই পর্যায়ে আলোচিত হয়েছে—বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, শরৎচন্দ্র, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এবং চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। আবার অন্যদিকে রাজনৈতিক পটভূমিকার আলোচনায় এসেছে বিশ্বযুদ্ধ, রুশ বিপ্লব, মন্টিগু-চেমস্‌ফোর্ড্‌ রিফর্ম, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড, খিলাফৎ আন্দোলন ইত্যাদি এবং প্রসঙ্গত জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাস ও তার পূর্বে কিছু কিছু ঐতিহ্যবাহী সংগঠন ও সাময়িক পত্র সম্পর্কিত আলোচনা।

তৃতীয় থেকে পঞ্চম অধ্যায়ে নরেশচন্দ্রের সমগ্র সাহিত্যের পরিচয় দানের চেষ্টা করেছি। এই অধ্যায়ে তাঁর গ্রন্থাকারে প্রকাশিত প্রায় সমগ্র সাহিত্যকর্ম আলোচিত হয়েছে। এই আলোচনায় প্রধানত আমাদের লক্ষণীয় হয়েছে তাঁর বিবিধ কৌতূহল, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা, বাস্তবতার প্রতি অনুরাগ, মানুষের মনের অনন্ত রহস্য উন্মোচনে আগ্রহ এবং সামাজিক অসঙ্গতি ও অসাম্য সম্পর্কে তাঁর নির্ভীক মন্তব্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে নরেশচন্দ্রের সাহিত্য-প্রকরণ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রোত্তর যুগের কথাসাহিত্যের কয়েকটি সুস্পষ্ট লক্ষণ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছি এবং নরেশচন্দ্রের স্বাতন্ত্র্যটি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি, বিষয় এবং রীতি উভয় দিক থেকেই।

সপ্তম অধ্যায়ে সে যুগের সাহিত্যাদর্শ ঘটিত তর্কবিতর্কের আলোচনায় দেখিয়েছি যে, নরেশচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যবিরোধ মতান্তর সৃষ্টি করলেও তা কোন স্থায়ী মনান্তরের পর্যায়ে যায়নি। নরেশচন্দ্র চিরদিনই রবীন্দ্রভক্ত এবং রবীন্দ্রনাথও একটি চিঠি লিখে এই সাময়িক বিরোধ মিটিয়ে নিয়েছিলেন।

কেউ কেউ মনে করেন বিচিত্রা ভবনের আধুনিক সাহিত্য বিষয়ক সভার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ রবীন্দ্র-নরেশচন্দ্র সাহিত্য বিতর্কের সূত্রপাত। এই ধারণা যে ভুল তার তথ্যগত প্রমাণ, এই অধ্যায়ে দিয়েছি।

এই গবেষণা প্রবন্ধের অষ্টম প্রসঙ্গটির নাম 'উপসংহার'। পূর্ববর্তী প্রতিটি অধ্যায়ের বিশ্লেষণ তথা গবেষণার ফলাফল বর্ণনাই এই উপসংহারের লক্ষ্য। আর নবম বা সর্ব শেষ অংশে নরেশচন্দ্রের সম্পূর্ণ রচনাপঞ্জী সংযোজিত হয়েছে।

ঔপন্যাসিক নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত আধুনিক পাঠকদের কাছে বিস্মৃত প্রায়, পঞ্চাশ অনূর্ধ্ব বাঙালীর কাছে অপরিচিত। তাই নরেশচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্যের একটি সামগ্রিক পরিচয় দানের এই প্রয়াস উপেক্ষণীয় হবে না বলেই বিশ্বাস করি।

১

জীবন

১২৮৯ বঙ্গাব্দের ১৮ বৈশাখ [৩ মে, ১৮৮২] বগুড়ায় মামাবাড়ীতে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মহেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ও মাতার নাম শরৎসুন্দরী দেবী। নরেশচন্দ্রদের আদি নিবাস ছিল ময়মনসিংহ জেলার 'বাঁশী' গ্রামে। পিতা মহেশচন্দ্র ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি ধনবান না হলেও ছিলেন সুপ্রতিষ্ঠিত, সম্মান প্রতিপত্তি সকল দিকেই। নরেশচন্দ্র পিতার পঞ্চম সন্তান এবং তৃতীয় পুত্র। তাঁর অন্য দু'টি ভাই অতি অল্প বয়সেই ম্যালেরিয়া রোগে প্রাণ হারান, তাই স্বাভাবিক কারণেই নরেশচন্দ্রের শৈশব ও বাল্যকাল কাটে অতিমাত্রায় আদরের মধ্যে।

মাত্র পাঁচ বৎসর বয়সে নরেশচন্দ্রের শিক্ষারম্ভ [১৮৮৭] হয় বহরমপুর কলেজিয়েট স্কুলে। ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে যখন নরেশচন্দ্র আট বৎসর বয়স তখন তাঁর জননীর মৃত্যু হয়। এই অবস্থায়, এতদিন গৃহে যে সামান্য শাসনের ব্যাপার ছিল সেটাও পুরোপুরি লোপ পেল। পরিবারের প্রত্যেকের কাছেই মাতৃহীন নরেশচন্দ্রের বেঁচে থাকাটাই তখন বড় কথা। তাই তাঁর দোষত্রুটি বা দুষ্টুমির জন্য সামান্যতম শাসনও কেউ করতেন না। নরেশচন্দ্রের নিজের বক্তব্যে—"এ অবস্থায় আহ্লাদে গোপাল হয়ে আমার গোল্লায় যাবারই ষোল আনা সম্ভাবনা ছিল।"[১]

নরেশচন্দ্রের পিতার ছিল বদলির চাকরী। ছেলেবেলায় তাই তাঁকে পিতার সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে বগুড়া, বহরমপুর, বারাসত, মালদহ, মুঙ্গের প্রভৃতি স্থানে এবং বহুবার তাঁকে স্কুল পরিবর্তন করতে হয়েছে। এই পরিবর্তনের ফলে নরেশচন্দ্রের সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুত্ব নিবিড় ও স্থায়ী হতে পারেনি আবার পিতার মর্যাদা সম্পর্কে একটা বোধ সহজেই তাঁকে শিশুসুলভ চাপল্য থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। বাড়ীর আবেষ্টনীর মধ্যেও একটা দৃঢ়তর অনায়াস গাম্ভীর্যে, স্বাতন্ত্রে এবং স্বাধীন চিন্তায় নরেশচন্দ্র নিজের একটা পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে নিয়েছিলেন এবং সেই সঙ্গে অতি শৈশবেই মাতৃস্নেহহীন পরিবেশ তাঁকে আত্মনির্ভরশীল করে তুলেছিল। এই আত্মমগ্ন নরেশচন্দ্রের মনে শৈশবেই সংমিশ্রণ ঘটেছিল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যচেতনা, কল্পনা ও সৃষ্টির। তাঁর নিজের কথায় জানা যায়—ন' দশ বছরেই তাই তিনি দু'খানি নাটক লিখে ফেলেছিলেন, আর তিনি যখন বছর বারো বয়সের, মতিহারী স্কুলের অষ্টম মানের ছাত্র তখন একদিন প্রকৃতির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। সেই সম্পর্কে নরেশচন্দ্র নিজেই লিখেছেন—"আমার বয়স তখন বছর বারো, তখন আমি মোতিহারীর স্কুলে পড়ি। আমাদের বাড়ী যেখানে ছিল, সেখান থেকে নীলক্ষেতের পাশ দিয়ে কতকটা নির্জন রাস্তা কালেক্টর সাহেবের বাড়ী হয়ে ছতৌনী, পতোরা প্রভৃতি গ্রামের দিকে চলে গেছে। একদিন সূর্যাস্তের কালে এই পথ দিয়ে একা বেড়াচ্ছিলুম। খানিক দূরে গিয়ে রাস্তার পাশের ঘন গাছের সারির ভিতর দিয়ে একটা সরু দোপেয়ে পথ দেখতে পেয়ে, সেই পথে চলতে লাগলাম ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে। সামান্য খানিকটা পথ গাছের ও ঝোপের ভিতর দিয়ে গিয়ে হঠাৎ আমার সামনে দেখলাম একটা বেশ বড় খোলা মাঠ। চারদিকে তার ঘন বৃক্ষের আবেষ্টনী, মাঝখানে নির্জন, নিভৃত এই মুক্ত প্রান্তর,—তার প্রায় কেন্দ্রস্থলে একটা ডোবা। এ স্থানে একটা অপূর্ব পরিপূর্ণ নির্জনতার ভিতর দিনান্তের পাখীদের ছাড়া ছাড়া কলগান ছাড়া অন্য শব্দ নেই। দু'একটা গরু ছাড়া অন্য জীব নেই—শুধু গাছের ফাঁকে দেখা যাচ্ছে একটা কুটিরের আভাস! কী একটা আবেশ আমাকে পেয়ে বসলো, মুগ্ধ, তন্ময়চিত্তে আমি সেখানে বসে পড়লাম।" ছেলেবয়সের এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের নিঃসঙ্গ উপলব্ধি, তাঁর পরবর্তী জীবনে রচিত 'কাঁটার ফুল' গল্পের পরিবেশ রচিত হয়েছে।

নরেশচন্দ্র যখন মুঙ্গের জিলা স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র তখন তাঁর প্রথম প্রতিবাদ প্রবন্ধ, প্রকাশিত হয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত দাসাশ্রমের মুখপত্র 'দাসী' পত্রিকায় [১৮৯৬]। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতনের আবাসিক ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক ছিলেন অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়। এই সময় 'সাহিত্য' পত্রিকায় উমেশচন্দ্র বটব্যাল এক প্রবন্ধ, লেখেন 'রামমোহন রায় ও রামজয় বটব্যাল।' সেই প্রবন্ধে, রামজয় বটব্যালের সঙ্গে রামমোহন রায়ের এক মামলার ফয়সালা বের হয় এবং সেই প্রবন্ধে, বেশ স্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল যে রামমোহন রায়, রামজয় বটব্যালের নামে মামলা করে বটব্যালকে বিব্রত করেন।[২] 'দাসী' পত্রিকায় এই প্রবন্ধের একটি উত্তর প্রকাশ

করেন অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়।[৩] উক্ত দু'টি প্রবন্ধ, পড়ে নরেশচন্দ্র একটি প্রত্যুত্তর লেখেন 'দাসী' পত্রিকায়।[৪] এই লেখাটিই নরেশচন্দ্রের প্রথম প্রকাশিত রচনা। অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নরেশচন্দ্রের এই প্রত্যুত্তর প্রবন্ধের একটি প্রতিবাদ[৫] প্রকাশ করেছিলেন এবং চৌদ্দ বছরের বালক নরেশচন্দ্রকে মনে করেছিলেন উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয়ের বন্ধু।

ছেলেবেলা থেকেই নরেশচন্দ্রের নানারকম উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল—বস্তুতঃ সেটা গড়ে উঠেছিল পিতা মহেশচন্দ্রের প্রভাব প্রতিপত্তি ও তাঁর ন্যায়নিষ্ঠ পরিশ্রমী স্বভাবকে আশ্রয় করে। পিতার আদর্শই নরেশচন্দ্রকে ছোটবেলা থেকেই নিয়মানুবর্তী, কর্মঠ ও পরিশ্রমী করে তোলে। নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন—"জীবনের গোড়ার দিকেই মনে কেমন করে যেন গড়ে উঠেছিল নানা রকমের উদ্ভট উচ্চাকাঙ্ক্ষা। যখন প্রথম শ্রেণীতে পড়ি তখনই আমি জীবনের একটি প্রোগ্রাম লিখে ফেলেছিলাম। সে প্রোগ্রামের মধ্যে ছিল সাহিত্যে শীর্ষ স্থান পাবার প্রস্তাব, বিজ্ঞানে চরম উৎকর্ষ লাভ, দেশের রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা অর্জন, শিল্পোন্নতি, পৃথিবী ভ্রমণ ইত্যাদি কতকিছু। বেশ মনে আছে, তখনই সংকল্প ছিল, গভর্নমেন্টের চাকরী করবো না ও বেশী পয়সা উপার্জন করবো না।"

১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে মাত্র পনের বছর বয়সে নরেশচন্দ্র মুঙ্গের জিলাস্কুল থেকে প্রথম বিভাগে এনট্রেনস পাশ করেন, যদিও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডারে পাওয়া যায় যে তখন তাঁর বয়স তের বছর তিনমাস।[৬] এনট্রেনস পাশ করার পর নরেশচন্দ্র কলকাতা এসে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন এবং ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিভাগে এফ.এ. পাশ করেন। এই সময়ই তিনি বিবাহ করেন ময়মনসিংহ জিলার কাঁঠালিয়া গ্রামের জমিদারকন্যা লাবণ্যপ্রভা দেবীকে। তখন তাঁর বয়স মাত্র সতের এবং লাবণ্যপ্রভা দেবীর তের। ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে বি. এ. পাশ করার পর তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা নীলিমা জন্ম গ্রহণ করেন। ১৯০২ সালে এম. এ. পাশ করার পরই নরেশচন্দ্রের চাকরী নির্বাচনের ব্যাপারে সমস্যা দেখা দেয়। তাঁর পিতা তখন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ থেকে অবসর নিচ্ছেন। পিতার ইচ্ছা নরেশচন্দ্র ডেপুটিগিরি করুন, কিন্তু নরেশচন্দ্রের ইচ্ছা অধ্যাপনা করার। পিতাকে তাই তিনি মুখে জানালেন ওকালতি করার ইচ্ছের কথা। অবশ্য তাঁর আসল ইচ্ছে ছিল ওকালতিতে নাম লিখিয়ে অধ্যাপনা করার।

এম. এ. পাশ করার পরই নরেশচন্দ্র গবেষণা করার জন্য সরকারী বৃত্তি চেয়ে আবেদন করেছিলেন। তাঁর সেই আবেদন মঞ্জুর হলো। ১৯০৩ সালের মাঝামাঝি সময়ে তিনি 'নব্য জার্মান ও প্রাচীন ভারতীয় দর্শন' বিষয়ে গবেষণা করার জন্য সরকারী রিসার্চ স্কলার হিসাবে প্রেসিডেন্সী কলেজে যোগ দেন। ঠিক এই সময়ই লর্ড কার্জন বাংলাকে ভাগ করার চক্রান্ত করছে।[৭] অবশেষে রিজলের চিঠি জনসাধারণের কাছে বাংলা ভাগ করার পরিকল্পনাটিকে পরিষ্কার করে দিল।[৮] নরেশচন্দ্র ছিলেন অতিমাত্রায় রাজনীতি সচেতন তাই তাঁর কাছে ইংরাজদের এই ভেদনীতি ধরা পড়েছিল। সেই

সময় প্রেসিডেন্সী কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রদের উদ্যোগে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। সেই পত্রিকায় ইংরাজ সরকারের ভেদনীতির তীব্র সমালোচনা করে নরেশচন্দ্র 'Muslim in India' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। প্রবন্ধটি নিয়ে সরকারী দপ্তরে হৈ চৈ পড়ে গেল। পেডলার সাহেব এই প্রবন্ধের জন্য নরেশচন্দ্রকে কলেজ থেকে বহিষ্কার করতে চেয়েছিলেন এবং সরকার থেকে সব কটি কপিই বাজেয়াপ্ত হল। নরেশচন্দ্র নতুন সেশনের স্কলারশিপের জন্য আর আবেদন করেননি।

ইতিমধ্যেই ছাত্রনেতা হিসাবে নরেশচন্দ্রের নাম সুপরিচিত হয়ে উঠেছে এবং এই সূত্রে তিনি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের অন্যতম নায়ক ব্যারিস্টার আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের 'নজরে পড়ে' যান। কলকাতার ছাত্র সমাজকে নিয়ে তখন নরেশচন্দ্র অজস্র সভা করে চলেছেন। বিভিন্ন নেতাদের সভাপতিত্বে নিয়মিত সভা হচ্ছে পান্তির মাঠ ও কলেজ স্কোয়ারে। আন্দোলনের জোয়ারে সমগ্র বাংলা তখন উত্তাল। স্বদেশী আন্দোলন, বয়কট, পিকেটিং তখন দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। ছাত্র ও যুবশক্তির এই আন্দোলন স্বচ্ছন্দ সংযোগ ব্রিটিশ সরকারের কাছে ত্রাসের কারণ হয়ে উঠলো। ছাত্রদের রাজনীতির ক্ষেত্র থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার জন্য স্কুল-কর্তৃপক্ষের কাছে Carlyle এক গোপন সার্কুলার পাঠালেন—তার বিষয়বস্তু হলো, ছাত্ররা কোনরকম রাজনৈতিক কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারবে না।[৯] উক্ত সার্কুলারের পরিপ্রেক্ষিতে একই বিষয় সম্পর্কিত আর একটি সার্কুলার কাগজে প্রকাশিত হলো।[১০] ৩১শে অক্টোবর, ১৯০৫ সালে রংপুর জিলাস্কুলের প্রধান শিক্ষক একটি নোটিশে ছাত্রদের রাজনৈতিক যোগাযোগের উপর নিষেধ জারী করলেন। রংপুরের এই ঘটনায়, কলকাতা এবং সমস্ত বাংলার ছাত্রসমাজ এর প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠলো। ৪ঠা নভেম্বর [১৯০৫] কলেজ স্কোয়ারে ছাত্রদের এক বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হয়, সেই সভায় সভাপতিত্ব করেন নরেশচন্দ্র। ঐ একই দিনে প্রতিষ্ঠিত হয় Anti-circular Society এবং নরেশচন্দ্র এর সভাপতি হন। এই সময় কলকাতার আশেপাশে ছাত্রদের মনোভাব বোঝার জন্য ও তাদের সংগঠিত করার জন্য নরেশচন্দ্রকে পাঠান হয় হুগলীতে এবং পরে পূর্ববাংলার বহু স্থানে ও বরিশালে। সে সকল স্থানে বিভিন্ন সভা সমিতির মাধ্যমে নরেশচন্দ্র নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে।

১৯০৫ সালে ডিসেম্বর মাসে বেনারস কংগ্রেস অধিবেশনে নরেশচন্দ্রর সঙ্গে পরিচয় হয় লোকমান্য তিলক, লালা লজপৎ রায় প্রমুখের সঙ্গে। পরের বছর কলকাতা কংগ্রেসে তিলককে সভাপতি করার ব্যাপারে নরেশচন্দ্রের সক্রিয় সমর্থন ছিল। কংগ্রেসের নরমপন্থীরা তাঁকে সেই কারণে সন্দেহের চোখে দেখে। কংগ্রেসের দুই ধারার বিরোধে শেষ অবধি নাগপুর কংগ্রেস বন্ধ করে সুরাটে নিয়ে যাওয়া হয়।

কংগ্রেসের প্রথম Constitution' এর খসড়ায় যে 'ব্রিটিশ শাসনাধীনে স্বাধীনতা' লাভের প্রস্তাব ছিল তা নরেশচন্দ্র গ্রহণ করতে পারেননি। Constitution' এর খসড়া

করার জন্য তাই ভার পড়লো বিভিন্ন প্রাদেশিক কমিটির উপর! বাংলা প্রাদেশিক কমিটির খসড়া করার দায়িত্ব নিলেন নরেশচন্দ্র, 'স্থূল অর্থে সেটাই গ্রহণ করা হয়েছিল।'

যে পরিবারে নরেশচন্দ্রের জন্ম তার গঠনটি ছিল বিচিত্র। নানা পরস্পরবিরোধী প্রবণতার সহাবস্থান এই পরিবারে লক্ষণীয়। একদিকে তাঁদের পরিবার ছিল আলোকপ্রাপ্ত ও শিক্ষিত, আবার অন্যদিকে প্রাচীন কিছু কিছু সংস্কারও ছিল সে বাড়ীর। নরেশচন্দ্র যুক্তি প্রয়োগ করে বার বার চেষ্টা করেছেন তাঁদের রক্ষণশীল আবেষ্টনীর অন্তঃসারশূন্যতাকে সরিয়ে দিতে। তাই তাঁকে অনেকবারই অভিভাবকদের বিরোধিতা করতে হয়েছে। নরেশচন্দ্রের পিতা মহেশচন্দ্র সে যুগে স্ত্রীকে কর্মক্ষেত্রে, এমন কি বাংলার বাইরে নিয়ে যাওয়ার প্রগতি দেখিয়েছেন, সে যুগে সেটা খুব সুলভ ছিল না। অথচ এই মহেশচন্দ্রকেই আবার কন্যার বাল্য বিবাহের জন্য তৎপর দেখা যায়। নরেশচন্দ্র অভিভাবকদের বিরোধিতা করে সবচেয়ে ছোট বোনকে স্কুলে পাঠিয়েছিলেন এবং বিবাহ দিয়েছিলেন উপযুক্ত বয়সে। নারীশিক্ষা ও নারীস্বাধীনতা সম্পর্কে তাঁর ছিল একটা স্বতন্ত্র অভিমত যেটা তাঁর উপন্যাসে অঙ্কিত নারীচরিত্রগুলির মধ্যেও আভাসিত হয়ে উঠেছে।

১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে নরেশচন্দ্র কলকাতা হাইকোর্টে ওকালতি শুরু করেন। ইতিপূর্বে তিনি সিটি কলেজে কিছুকাল অধ্যাপনা করেন। এই সময় তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসটি ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করেন। উপন্যাসটির ইংরাজী নাম Abbey of Bliss।[১১] বইটির পাঁচটি সংস্করণ হয়।

১৯০৭ সালে সুরাট কংগ্রেসে গোখলের 'শিক্ষা প্রস্তাব'-কে নরেশচন্দ্র সমর্থন করেছিলেন এবং এই ব্যাপারে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর সঙ্গে তাঁর মতভেদ হয়, অথচ একদা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর উৎসাহ এবং প্রভাব নরেশচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনে অত্যন্ত মূল্যবান ছিল। এই ঘটনা থেকে একটা জিনিস স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, স্বাধীন চিন্তায় তিনি ছিলেন অনমনীয় এবং এই একই মানসিকতার জন্য পরবর্তীকালেও তিনি কোন বিশেষ রাজনৈতিক দল বা সাহিত্যিক গোষ্ঠীভুক্ত হতে পারেন নি।

নরেশচন্দ্র ছেলেবয়স থেকেই পিতার সাথে বাংলাদেশ ও বাংলার বাইরের বহু জায়গায় বাস করলেও দেশের বাড়ী ও গ্রাম বাংলার সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ বরাবরই ছিল। নরেশ সেনগুপ্তের শিক্ষিত মন ও নাগরিক দৃষ্টিভঙ্গীর কাছে গ্রামবাংলার দরিদ্র মানুষ ও তাদের জীবনের নানা দুঃখ দুর্দশার রূপটি যেভাবে ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল পুরোপুরি গ্রামের মানুষ হলে সেটা তাঁর পক্ষে সম্ভব হত কি না সন্দেহ। হয়তো গ্রাম-বাংলার এই দুঃখ দুর্দশার রূপটিই তাঁর স্বাভাবিক বলে মনে হত। জমিদারী প্রথাই যে কৃষক সম্প্রদায় ও সাধারণ মানুষকে শোষণ করছে সেটা তিনি অনুভব করেছিলেন। তাই এই শোষণের হাত থেকে কৃষকদের উদ্ধার করার উপায় হিসাবে ১৯১১ সালে প্রস্তাব করেছিলেন 'জমিদারী প্রথা বিলোপের'। তাঁর এই অভিনব ও বৈপ্লবিক প্রস্তাবটি স্বগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতেই উচ্চারিত হওয়ায় সে যুগে ব্যাপকভাবে চাঞ্চল্য

আনতে পারেনি সত্য কিন্তু এই প্রস্তাবটির কথা মনে রেখেই পরবর্তীকালে জমিদারমহল নরেশচন্দ্রের বিরোধিতা করে তাঁকে দু-দুবার কাউন্সিলে প্রবেশাধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিলেন।

শৈলেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় যখন 'বঙ্গদর্শন [নব পর্যায়]' পত্রিকার সম্পাদক তখন তিনি নরেশচন্দ্রকে তার পত্রিকার জন্য একটি উপন্যাস লিখে দেওয়ার অনুরোধ করেন। নরেশচন্দ্রের যদিও তখনও এ ধরনের কোন রচনা প্রকাশিত হয়নি তবু শৈলেশবাবুর এই অনুরোধ থেকে বোঝা যায় যে তাঁর সঙ্গে নরেশচন্দ্রের ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল এবং সাহিত্য সম্পর্কে নরেশচন্দ্রের আগ্রহ তার অজ্ঞাত ছিল না। হতে পারে তাঁরা বিভিন্ন সাহিত্য আলোচনা সভায় একত্র উপস্থিত থাকতেন এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করতেন। যাই হোক, শৈলেশবাবুর অনুরোধে নরেশচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন নব পর্যায়ের' জন্য একটি ক্ষুদ্র উপন্যাস লিখে পাঠান এবং তা প্রকাশিত হয়। এই ক্ষুদ্র উপন্যাসটির নাম 'মুগ্ধা' এবং এই রচনাটিই নরেশচন্দ্রের কথাসাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত প্রথম রচনা।[১২]

নরেশচন্দ্র তাঁর প্রথম লেখা গল্প সম্পর্কে লিখেছেন—'আমার প্রথম প্রকাশিত গল্প বোধ হয় বঙ্গদর্শনে বের হয়েছিল, শৈলেশবাবুর সম্পাদনাকালে। কিন্তু সে গল্পের কাহিনীই আমার মনে নেই। তার চিহ্নমাত্রও আমার কাছে নেই। আর সেইটাই যে আমার প্রকাশিত গল্পের মধ্যে প্রথম লেখা,—তাও বোধহয় নয়। প্রকাশিত গল্পের মধ্যে স্পষ্ট যা মনে আছে, তাতে প্রথম বের হয় 'দ্বিতীয় পক্ষ' ভারতবর্ষে, তারপর 'ঠানদিদি' নারায়ণে! কিন্তু তার বহু আগে আমি লিখেছিলাম—'পাগল', 'কাঁটার ফুল', এবং 'ঝি'।.........'কাঁটার ফুলের' প্রথম লেখাটা আমি পাঠিয়েছিলাম 'প্রবাসীতে' গোপনে। 'প্রবাসী'র সম্পাদক লেখাটা ছাপেননি। তাতে নিরুৎসাহ হয়ে আমি আর কোন লেখা ছাপাতে পাঠাইনি।[১৩]

১৯১০ সাল পর্যন্ত ভারতের শিক্ষা বিভাগটি ছিল স্বরাষ্ট্র দপ্তরের [হোম ডিপার্টমেণ্ট] অধীনে। শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা বোধ করে এর পরবর্তী সময়ে ব্রিটিশ সরকার আলাদা ভাবে শিক্ষা দপ্তর গঠন করেন। ১৯১১—১৯১২ সালে 'দরবার'-এর সময় সরকার ঘোষণা করলেন যে, পঞ্চাশ লক্ষ টাকা সাধারণ শিক্ষাখাতে অনুদান দেওয়া হবে।[১৪] এই সময় লর্ড হার্ডিঞ্জ ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করেন। সরকার তখন বিভিন্ন স্থানে Residential and Teaching University খোলার নীতি গ্রহণ করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে নানারকম সাংবিধানিক পরিবর্তন হলেও এই নীতিটি কিন্তু ১৯১৯—১৯৩৫ সাল পর্যন্ত অনুসৃত হয়েছে।[১৫] লর্ড হার্ডিঞ্জের ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাবটির তীব্র বিরোধিতা করেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী। নরেশচন্দ্র তখন এককভাবে তাঁদের বিরুদ্ধে, মত প্রকাশ করে ঢাকায় Residential and Teaching University স্থাপনের পক্ষে মত প্রকাশ করেন যদিও তখনকার মত লর্ড হার্ডিঞ্জের সেই প্রস্তাব কার্যকর হয়নি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় যখন উপাচার্য (১৯০৬—১৯১৪) তখন বিশ্ববিদ্যালয় আইন কলেজে M. L. ও D. L. ডিগ্রী পরীক্ষা চালু হয়।[১৬] ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে নরেশচন্দ্র প্রথম শ্রেণীতে স্বর্ণপদক পেয়ে M. L. পাশ করেন এবং ১৯১৩ সালে 'প্রাচীন ভারতের ব্যবহার ও সমাজনীতি' বিষয়ে গবেষণা করে 'ডক্টর অব ল' (D. L) উপাধি লাভ করেন।[১৭]

এই সময় ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে চলছে এক নিস্তরঙ্গ অবস্থা। ইতিপূর্বেই কংগ্রেসের মধ্যে যে নানা ধরনের দলাদলি, মতানৈক্য ও বিরোধিতা দেখা দিয়েছিল তার মধ্যে নরেশচন্দ্র মনের সায় খুঁজে পাননি বরঞ্চ রাজনীতির উপর তিনি সাময়িক বীতশ্রদ্ধ ও হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। তাছাড়া অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও হাইকোর্টের বিভিন্ন মামলা নিয়ে তিনি তখন খুবই ব্যস্ত। ১৯১৪ সালে প্রমথ চৌধুরীর পত্রিকা 'সবুজপত্র' প্রকাশ লাভ করলো এবং সেই বছরই চিত্তরঞ্জন দাশের 'নারায়ণ' পত্রিকাও প্রকাশিত হয়। নরেশচন্দ্রের 'যৌথ পরিবার' নামে একটি প্রবন্ধ, সে সময় 'সবুজপত্রে' প্রকাশ লাভ করে। ইতিপূর্বে তাঁর 'শাস্ত্রের দোহাই'[১৮] প্রবন্ধটি ভারতবর্ষে প্রকাশিত হয়েছে, এবং বাংলা সাহিত্যে প্রবন্ধকার হিসাবে তিনি ধীরে ধীরে পরিচিত হয়ে উঠছেন।

নরেশচন্দ্র যখন হাইকোর্টের খুব প্রতিভাবান আইনজীবী হিসেবে প্রায় প্রতিষ্ঠিত ঠিক এমন সময়ে তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা নীলিমা আক্রান্ত হলেন এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে। ১৯১৫ সালের শেষের দিকে নরেশচন্দ্র ঢাকা ল' কলেজের উপাধ্যক্ষ পদের জন্য আবেদন করলেন। তিনি ভেবেছিলেন পূর্ববাংলার জলবায়ুতে যদি সন্তানেরা সুস্থ সবল হয়ে ওঠে, বিশেষ করে তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা নীলিমা। কিন্তু তা হলো না, কলকাতার প্রায় সব বড় বড় ডাক্তারের চিকিৎসায় বা মধুপুরে হাওয়া বদল করেও কোন ফল হলো না। ১৯১৬ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী নীলিমা লোকান্তরিত হলেন। মনে হয় জ্যেষ্ঠা কন্যার এই মৃত্যুর আঘাত স্নেহশীল নরেশচন্দ্রকে অসহায় করে তোলে, কলকাতার পরিবেশ ও কন্যার স্মৃতিভরা সংসার তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠলো। কলকাতা হাইকোর্টের জমজমাট আইন ব্যবসা ছেড়ে তিনি ঢাকা ল' কলেজের উপাধ্যক্ষের পদ নিয়ে ঢাকা চলে এলেন।

১৯১৬ সালে ঢাকার নতুন পরিবেশে এসে নরেশচন্দ্র পড়াশোনা, বাগান করা ও পশুপাখী পালনের মধ্যে বেশ কিছুদিন ডুবে রইলেন। অধ্যাপনার ফাঁকে ফাঁকে সময়ও পেতেন প্রচুর। ইংরাজী অনুবাদের মাধ্যমে লভ্য বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে এ সময়ই গড়ে উঠে তাঁর নিবিড় পরিচয়। বাল্যকালের প্রায় হারিয়ে যাওয়া সাহিত্যচর্চার অভ্যাসটিকে, তিনি আবার নতুন করে উজ্জীবিত করে তুললেন।

নরেশচন্দ্রের স্ত্রী জমিদারকন্যা লাবণ্যপ্রভা দেবীর ডাকনাম ছিল 'ননী'। তিনি চিরদিনই ছিলেন স্নায়ুরোগে রুগ্না এবং ছিলেন ননীর মতই কোমল ও স্নেহার্দ্র। গৃহকাজে নিপুণ হলেও কর্মঠ ও তৎপর মোটেই ছিলেন না, ফলে গৃহাভ্যন্তরে নরেশচন্দ্রকে সহিষ্ণু পিতা হিসেবে সন্তানদের লালনের অনেকটা দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিতে হয়েছিল।

তিনি কন্যাদের 'চুল বেঁধে সাজিয়ে না দিলে' তাদের 'বেড়াতে যাওয়াই হোত না'[১৯] সেসময়।

নরেশচন্দ্রের চরিত্রের মধ্যে ছিল একটা বহির্মুখী কর্মচঞ্চল প্রবাহ। শান্তিময় সংসার বা বই পুস্তকের স্তূপ থেকে এই প্রবাহই তাঁকে বারবার বাইরে নিয়ে এসেছে, বাইরের নানারকম কাজে তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে আত্মনিয়োগ করেছেন। বাইরের এই কাজ-কর্মগুলি ছিল তাঁর কাছে দৈনন্দিন কর্ম ও বিশ্রামের মধ্যবর্তী একটা আনন্দঘন নিরবচ্ছিন্ন অবসর কাটানো। যার ফল ব্যক্তিগত লাভ ক্ষতি নয়—কিছুটা জনকল্যাণ, কিছুটা সমাজসেবা। ঢাকায় এসে তিনি চেষ্টা করলেন অশিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিতদের উপজীবিকার নানা উপায় উদ্ভাবনের, সেই সঙ্গে সমাজের অতিরিক্ত নারীদের কর্মসংস্থানের কথা। এইসব ভাবনা ও কর্মপন্থাগুলিই পরবর্তী সময়ে প্রকাশ লাভ করেছে তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে।

ঢাকার একটি কুটিরশিল্প তখন এমন একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যে, যে কোন সময়ে তা অবলুপ্ত হতে পারে শিল্পটা হচ্ছে 'কুশিদা'। ঢাকাই শাড়ীর উপর মুগার সুতোর সাহায্যে এই কুশিদা শিল্পীরা অপূর্ব সূচীশিল্প সৃষ্টি করতো। কিন্তু এই শিল্পীরা তাদের উৎপাদনের চাহিদা ও বাজার সম্পর্কে ছিল প্রায় অজ্ঞ, অথচ এই শিল্পসম্ভারের ব্যবসার প্রসার ছিল সুদূর মধ্যপ্রাচ্য পর্যন্ত। বিদেশের বাজারে এই সামগ্রীর উচ্চমূল্য থাকলেও শিল্পীরা কিন্তু পেত খুবই সামান্য মজুরী। আর এই ব্যবসার মধ্যে ছিল একশ্রেণীর দালালদের প্রচণ্ড রকমের আধিপত্য। নরেশচন্দ্র চেষ্টা করেছিলেন এই শিল্পের কারিগরদের সাথে ব্যবসায়ী মহলের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটিয়ে দিতে এবং চেয়েছিলেন এই শিল্পের প্রসারতা। কিন্তু তাঁর সেসব চেষ্টা মোটেই সফল হয়নি। এরপর তিনি ঢাকায় কয়েকটি মহিলা সমিতি গড়ে তুলেছিলেন, সেই সব সমিতিতে দুস্থ মেয়েরা উল বুনে, লেস বুনে বা সেলাই করে কিছুটা আত্মনির্ভরশীল হতে পেরেছিল। দুঃখের বিষয় সেই সব সমিতির আয়ু ছিল খুবই সীমিত।[২০]

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম মহাযুদ্ধ, শেষ হলো। মণ্টেগু এলেন ভারতবর্ষ পরিদর্শন করতে। ভারতে স্বাধীনতা সম্পর্কে তৎকালীন নেতৃমহল তখন নতুন করে ভাবছেন। নরেশচন্দ্র কিন্তু তখন মগ্ন ছিলেন সাহিত্যচর্চা ও অধ্যাপনায়। তাঁর দুটি রচনা প্রকাশিত হয় সেবছর, 'দ্বিতীয়পক্ষ' ভারতবর্ষে এবং 'ঠানদিদি' নারায়ণে। সেবছরই ঢাকা ল' কলেজের ছাত্র প্রথম হলো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায়। সেদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও আইন বিভাগের অনেকেই নরেশচন্দ্রকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

নরেশচন্দ্র ছিলেন অতিমাত্রায় মনোযোগী পাঠক। দেশী বিদেশী সাময়িক পত্র-পত্রিকার প্রতিটি পাতাই তিনি যত্ন নিয়ে পড়তেন। স্বাভাবিক কারণেই তাই, শুধুমাত্র সাহিত্যই নয়, বিশ্বের রাজনৈতিক, সামাজিক বা বৈজ্ঞানিক ঘটনাবলীর সঙ্গেও তিনি পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন। একসময় Indian World Journal-এ তিনি এদেশের নদনদী নিয়ন্ত্রণ করার সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ, লিখেছিলেন। পরবর্তী কালে

কাউন্সিলের মেম্বার থাকাকালীন সময়ে বাংলাদেশের নদনদীগুলিকে কিভাবে সংহত করে কাজে লাগান যায় সে উদ্দেশ্যে একটি রিভার ফিজিক্‌স ল্যাবরেটরী, স্থাপন করার প্রস্তাব করেছিলেন। এ সবই সম্ভব হয়েছিল তাঁর ব্যাপক পড়াশোনার জন্য।

১৯১৯ সালে কলকাতার টাউনহলে বিপিনচন্দ্র পাল ব্যাখ্যা করেছিলেন বলশেভিক বিপ্লব ও তার তাৎপর্যের কথা[২১] ঠিক সেই সময়েই নরেশচন্দ্রও মার্ক্সবাদ ও সোভিয়েট রাশিয়ার কর্মপন্থা সম্পর্কে উৎসাহী হয়েছিলেন।

ভারতবর্ষে তখন চলছে অসহযোগ পর্যায়ের আন্দোলন, এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন গান্ধীজী। নরেশচন্দ্র অসহযোগ আন্দোলন বা চরকা ইত্যাদির উপর বিন্দুমাত্র ভরসা করতে পারেননি। তিনি মনে করতেন অসহযোগ আন্দোলন বা চরকা কখনোই স্বাধীনতা লাভের উপায় হতে পারে না, যদিও অতীতে নরেশচন্দ্র তাঁর ছাত্রাবস্থায় কাঁধে নিয়ে দেশী বস্ত্র বিক্রী করার কর্মসূচীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, সমর্থন করেছিলেন হ্যারিসন রোডের ঘটনাকে [৩রা অক্টোবর, ১৯০৫], বিলিতি দ্রব্য বয়কট আন্দোলনের সঙ্গে ছিলেন গভীরভাবে যুক্ত।

নরেশচন্দ্র বরাবরই ছিলেন রক্ষণশীল শুচিবাইমুক্ত। জীবনে যেখানেই তিনি যুক্তিহীনতা বা অসঙ্গতি অনুভব করেছেন সেখানেই বলিষ্ঠতার সঙ্গে তার প্রতিবাদ করেছেন। কিন্তু তাঁর এই চেষ্টা শুধুমাত্র বাইরের জনসমাজে আনুষ্ঠানিক বক্তব্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, ছিল না, ব্যক্তিগত জীবনে এবং নিজ গৃহাভ্যন্তরে তিনি তাঁর প্রগতিবাদী মত সর্বদাই প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছেন। একদা তিনি বাড়ীর তৎকালীন অভিভাবকদের বিরোধিতা করে ছোট বোনকে স্কুলে পাঠিয়েছিলেন এবং গান বাজনা, কাজকর্ম ও লেখাপড়া শিখিয়ে বাড়ীর মেয়েদের আত্মনির্ভরশীল করে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর সে চেষ্টা বিফল হয়নি, ভগ্নী চারুপ্রভা দেবীর [২২] জীবনীর মধ্যেই তার পরিচয় পাই।

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের অধ্যাপকসুলভ গাম্ভীর্যের আড়ালে একটি স্নেহকোমল দয়ালু মন ছিল এবং সেই সঙ্গে ছিল স্থির কর্তব্যজ্ঞান। যে কোনো প্রতিকূল অবস্থা বুঝে নিয়ে তিনি সহজেই নিজস্ব সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারতেন, এজন্য কখনোই অন্তঃসারশূন্য লৌকিকতাকে প্রশ্রয় দিতেন না। নরেশচন্দ্রের কন্যা তনিমা ঘোষের ডায়েরি থেকে প্রসঙ্গত দুটি ঘটনা উল্লেখ করা যায়—

"মনে আছে বাবা জীবজন্তু গাছপালা খুব ভালবাসতেন। একতলা বাড়ীটায় অনেক খালি জমি ছিল, তাতে থাকত কুকুর, বাঁদর, টিয়া। বাঁদরটা বাবার একটি ছেলে যেন। কেউ তাকে বকলে মারলে বাবা কলেজ থেকে ফেরা মাত্র তার নিজের ভাষায় বাবার কাছে নালিশ করতো। বাবা তার কথা ঠিক বুঝতেন এবং আদর করে কোলে নিয়ে তার দুঃখ ভুলিয়ে দিতেন। ……ঐ বাড়ীতে আমাদের এক মামাতো দাদা বেড়াতে আসেন। সে জমিদারবাড়ীর আদুরে নাতি, বাঁদরটা

তাকে ভেঙচায়, সেইজন্য সে লাঠি দিয়ে বাঁদরটাকে মারে। আমার মা ছিলেন অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির মানুষ, তিনি বারণ করেন কিন্তু 'প্রজা ঠেঙান'—দেখায় অভ্যস্ত ভাইপো পিসির কথায় কান দেন না। কলেজ থেকে ফিরে এসে বাবা দেখেন বাঁদরটা নির্জীব হয়ে পড়ে আছে, বাবাকে দেখে এগিয়ে আসছে না। মাকে ডেকে কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। মা ভয়ে ভয়ে ঘটনাটি বললেন। বাবা খুব চটে গেলেন এবং প্রকারান্তরে বলে দিলেন যারা তাঁর পোষ্যদের সহ্য করতে পারবে না তাদের তাঁর বাড়ীতে না থাকাই শ্রেয়। বলাবাহুল্য যে বাড়ীতে ছেলের চেয়ে বাঁদরের আদর বেশী সেখান থেকে জমিদারের নাতি রাগ করে পরের দিনই চলে গেলেন।"—দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে নরেশচন্দ্রের ঢাকার টিকা টুলির বাড়ীতে—

"একদিন দুপুরে হঠাৎ হই-চই ওঠে—দুটি ছেলেকে পাওয়া যাচ্ছে না। ছেলে দুটিকে আমাদের বাড়ীর পুকুরে স্নান করতে আসতে দেখা গিয়েছিল।……খবরটা শোনা মাত্র আমাদের একচোখা অর্জুনকে সঙ্গে নিয়ে বাবা ঝপাং করে জলে লাফিয়ে পড়েছিলেন এবং তুলে এনেছিলেন ডোবা ছেলে দুটিকে। তারপর দুজনে দুটো ছেলের হাত ধরে বোঁ বোঁ করে ঘোরাতে লাগলেন, ওদের মুখ দিয়ে গলগল করে জল বেরোতে লাগলো। একটু পরে ওদের শুইয়ে দিয়ে হাত ওপরে করে শ্বাস নেওয়ার ব্যবস্থা করতে লাগলেন……আমাদের মনে হল যেন মরা মানুষ বেঁচে উঠলো। বাবাকে সেদিন মনে হয়েছিল ভগবান।"

১৯২৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে একটি চমকপ্রদ তথ্য ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার উল্লেখ করেছেন—"বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ায় পূর্ববঙ্গের মুসলমানেরা যখন খুব ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল, তখন বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ ওদের সান্ত্বনা দেবার জন্য ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় করবেন বলে তাদের আশ্বাস দিলেন। কিন্তু বাংলার হিন্দুগণ এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করলেন। তাদের আপত্তির কারণ ছিল যে এর ফলে রাজনৈতিক ভাগের পরিবর্তে বাংলাদেশকে শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক থেকে দুইভাগ করা হবে। …কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ও এর বিরুদ্ধে ছিলেন, কারণ পূর্ববাংলায় একটি আলাদা বিশ্ববিদ্যালয় হলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খুব ক্ষতি হবে এবং প্রভাব ও প্রতিপত্তি খুব কমে যাবে। কিন্তু কিছুদিন পর তিনি প্রকাশ্যে এর বিরোধিতা বন্ধ করলেন।"[১৩] স্যার আশুতোষ কেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিরোধিতা বন্ধ করেছিলেন সে সম্পর্কে ডঃ মজুমদার যে তথ্যটি পরিবেশন করেছেন তা সংক্ষেপে হলো, লর্ড হার্ডিঞ্জ স্যার আশুতোষকে বলেছিলেন যে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করবেনই, কিন্তু স্যার আশুতোষের বিরোধিতা করতে চান না। তাই বড়লাট খোলাখুলি জিজ্ঞাসা করেন কি শর্তে স্যার আশুতোষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন সম্পর্কে আপত্তি করবেন না—আশুতোষ মুখোপাধ্যায় উত্তর করেছিলেন যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি চারটি অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করে সরকার খরচ বহন করেন তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে তিনি কোন আপত্তি করবেন না। লাটসাহেব স্যার আশুতোষের

শর্ত মেনে নিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে ইতিহাসে এই ঘটনা 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চুক্তি' (Dacca University Pact) নামে অভিহিত হবে।[২৪]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালে কিন্তু ঢাকার বিদগ্ধ হিন্দুসমাজ, বার বার আক্ষেপ করেছে ' They have killed a good college (Dacca college) to make a bad University'. কেননা ইংরাজ সরকার চেয়েছিল এই বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলমান ছাত্র ও শিক্ষকদের নানা রকম সুযোগ সুবিধা দিয়ে একটা সাম্প্রদায়িক কলহকেন্দ্রে পরিণত করতে। "কিন্তু ঢাকা সহরবাসীদের শংকা ও সন্দেহ এবং সরকারের দুরভিসন্ধি উভয়ই চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও প্রশাসনমণ্ডলীর যাদু স্পর্শে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সৌভাগ্য যে এর প্রাথমিক কর্ণধারগণের প্রত্যেকেরই এমন একটা উদার চিত্ত ও সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা হতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত, প্রকৃত শিক্ষকদের বিশুদ্ধ Academic Spirit ছিল যে তাঁদের পরিচালনায় প্রথম হতেই বিশ্ববিদ্যালয়টি একটি পবিত্র বিদ্যামন্দিরে পরিণত হলো। তাঁদের চোখে হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রদিগের মধ্যে কোন প্রভেদ ছিল না। তাঁরা সব ছাত্রকেই সমান দরদ ও ভালোবাসা দিয়ে নিরপেক্ষ ভাবে শিক্ষাদান করেন, এবং তাঁদের এই মহৎ সঙ্কল্পে হিন্দু মুসলমান ছাত্রদের মধ্যেও গড়ে উঠলো এক প্রীতি ও বন্ধুত্বের বন্ধন।

এ. এফ. রহমান, রমেশচন্দ্র মজুমদার, জ্ঞান ঘোষ, সহিদুল্লা, নরেশ সেনগুপ্ত শুধু তাঁদের ঔদার্য ও ব্যক্তিত্বের প্রভাবে এই অসম্ভবকে সম্ভব করলেন।"[২৫]

১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালে নরেশচন্দ্র এই নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের পদে যোগ দেন। তিনি তখন ঢাকা ল কলেজের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক হিসাবে পরিচিত। ঢাকার বাসিন্দা হওয়াতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শুরুতেই তাঁকে জড়িয়ে পড়তে হয় বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ কাজে। বাইরে থেকে অধ্যাপকের দল যখন ঢাকায় আসেন তাঁদের আপ্যায়ন ও অভ্যর্থনার ভারও নরেশচন্দ্রকেই নিতে হয়।

একদা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সমর্থনে নরেশচন্দ্র তৎকালীন শিক্ষা বিভাগের প্রধান কর্ণধার স্যার আশুতোষ ও দেশের বিখ্যাত রাজনীতিকদের সঙ্গে তর্ক করেছিলেন, কেননা তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, এ ব্যাপারে ইংরাজ বিভেদনীতি যত জোরদারই হোক না কেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে বিভেদনীতি চালানো কখনোই সম্ভব নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও সংস্কৃতিপূর্ণ পরিবেশ কোনো সাম্প্রদায়িক কলহকেন্দ্রে পরিণত হতে পারে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরও এ বিশ্বাস তাঁর ছিল এবং এই বিশ্বাসকে তিনি বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য অবিশ্রাম পরিশ্রম করেছেন। যদিও একথা অস্বীকার করা যায় না যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে এই সব সংকীর্ণতার উর্ধ্বে স্থাপন করতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে উপাচার্য হার্টগ সাহেবের সুষ্ঠু পরিচালনা ও রহমান সাহেবের শিক্ষাব্রতীসুলভ নিষ্ঠা।

ঢাকার কর্মচঞ্চল জীবনের ফাঁকে ফাঁকে নরেশচন্দ্র অবিরাম লিখে গেছেন। 'শুভা', 'পাপের ছাপ', 'রক্তের ঋণ' ইত্যাদি উপন্যাস বাংলা সাহিত্যপাঠকদের বিস্মিত করে

তুলেছে, নরেশচন্দ্রের দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা দেখে। তাঁর সাহিত্যচর্চা কিন্তু শুধুমাত্র উপন্যাস গল্পের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, একই সঙ্গে তিনি লিখেছেন কয়েকটি নাটক এবং বিচিত্র ধর্মী বিষয়ে বিভিন্ন প্রবন্ধ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালে অসহযোগ আন্দোলনের তরঙ্গে সমস্ত ভারতবর্ষ উত্তাল হয়ে উঠেছিল। খিলাফৎ আন্দোলনের জটিলতায় ঢাকার নবাব তখন স্বয়ং জড়িত, সমস্ত পূর্ববাংলার রাজনৈতিক আবহাওয়া তখন জটিলতর। একদিকে মুসলমান সংগঠন অন্যদিকে নবাবের দল আবার এর মধ্যস্থলে শিক্ষিত হিন্দুসমাজ তাদের স্বাতন্ত্র্য নিয়ে নিরপেক্ষ ভূমিকায় বিরাজ করছে। এই ত্রিধারা যে কোন মুহূর্তেই বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রবেশ করতে পারতো। কিন্তু নরেশচন্দ্রসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা সেখানে এমন একটা আদর্শ সংরক্ষণ করতে পেরেছিলেন যে পড়াশোনার এই পরিবেশকে সেই আমলের বিভিন্ন ধরনের রাজনীতি কখনোই আচ্ছন্ন করতে পারেনি। আর এ সময় নরেশচন্দ্রও রাজনীতির ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা গ্রহণ করেন নি।

নরেশচন্দ্র নারী স্বাধীনতা নিয়ে শুধুমাত্র সাহিত্যই করেন নি, ব্যক্তিগত জীবনেও নারীদের পুরুষের সঙ্গে সমান মর্যাদা দানের চেষ্টা করেছেন। নাবালিকা মেয়েদের বিবাহ দেওয়ার ব্যাপারে ছিল নরেশচন্দ্রের প্রচণ্ড আপত্তি। একদা কয়েকজন বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে তিনি এক অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন যার বিষয়বস্তু ছিল 'স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে কেহই নিজ নিজ কন্যাকে নাবালিকা অবস্থায় বিয়ে দিতে পারবে না।' নরেশচন্দ্র এই অঙ্গীকার পালন করেছিলেন। কিন্তু সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত, সম্পর্কে নরেশচন্দ্রের ভগ্নীপতি ও অন্য কয়েকজন সেই অঙ্গীকার রক্ষা করেননি ফলে নরেশচন্দ্র তাঁদের সঙ্গে তাঁর প্রীতির সম্পর্ককে অনেকটা সংযত করে নিয়েছিলেন।[২৬]

সে যুগে যে রক্ষণশীল মনোভাবের ফলে গৃহকর্তারা নারীদের প্রায় গৃহবন্দী রাখতে সচেষ্ট ছিলেন, সেই যুগেই নরেশচন্দ্র নিজের কন্যাদের পুরুষদের সঙ্গে সমান পদক্ষেপে চলার অনুমতি দিয়েছিলেন। কন্যা সুষমা সেনগুপ্তকে তিনি ভর্তি করে দিয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ ক্লাসে, বলা বাহুল্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিল কো-এডুকেশন ব্যবস্থা। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে কো-এডুকেশন ব্যবস্থা থাকলেও বি এ ক্লাসের একমাত্র এবং প্রথমা ছাত্রী[২৭] সুষমা সেনগুপ্তকে নিয়ে কর্তৃপক্ষের ক্লাস চালাতে একটু অসুবিধা হল। সুষমা সেনগুপ্তর ক্লাস শুরু হতো জেনারেল ক্লাস ছুটির পর এবং তাঁকে ক্লাসে সঙ্গ দেওয়ার জন্য উপাচার্যপত্নী (Mrs. Hartag) ও জনৈকা ইউরোপীয়ান ম্যাজিস্ট্রেট পত্নী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি নিয়ে ইনফর্মালি লেকচার শুনতেন।[২৮] এই ঘটনা থেকে একটা জিনিস পরিষ্কার বোঝা যায় যে নরেশচন্দ্র কন্যাকে কো-এডুকেশন ক্লাসে পড়ার অনুমতি দিলেও নারী-পুরুষের সহ-শিক্ষার ব্যাপারটা সে যুগে ছিল প্রায় অপ্রচলিত। শেষ পর্যন্ত অবশ্য সুষমা সেনগুপ্তকে পড়ার জন্য কলকাতা আসতে হয়েছিল, কেননা ওভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর আর পড়া চালানো সম্ভব হয়নি।

১৯২৪ সাল পর্যন্ত নরেশচন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের প্রধান ও

জগন্নাথ হলের প্রোভস্ট ছিলেন। প্রোভস্টদের 'হল টিউটর' হিসাবে সম্পর্কিত হলের (হোস্টেলের) ছাত্রদের পঠন-পাঠনের সাহায্য করতে হত। ছাত্রদের সাহায্য করার জন্য তাই নরেশচন্দ্রকে বিভিন্ন বিষয় অধ্যয়ন করতে হয়েছে। এসময় তিনি অনুভব করেছিলেন যে কেবলমাত্র পাঠ্যসূচীকে অনুধাবন করলেই জীবনবৃত্তটিকে পরিপূর্ণ করে তোলা যায় না। ছাত্রদের তাই তিনি বিভিন্ন বিষয়ে উৎসাহ দিয়েছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা খেলাধুলায় বরাবর ভালই ছিল, নরেশচন্দ্র তাদের উদ্দীপিত করলেন সাহিত্যচর্চা, অভিনয় ও সমাজসেবামূলক কাজে। তিনি নিজেও ছাত্রদের অভিনয় ও সমাজসেবামূলক কাজের সঙ্গে ছিলেন জড়িত। নরেশচন্দ্রের পরিচালনায় ঢাকা জগন্নাথ হলের সেবা সংঘ ঢাকা শহরের নিকটবর্তী 'কাজির বাগ' গ্রাম উন্নতির চেষ্টায় নিযুক্ত ছিল এবং সে সময় তাঁদের নানারকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। সে সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ, 'বাসন্তিকা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।[২৯] জগন্নাথ হলের এই ছাত্রদলের সঙ্গে নরেশচন্দ্র নিজেও সেই অঞ্চলে গিয়ে সেখানকার অধিবাসীদের আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে তোলেন।

১৯২২ সালে নরেশচন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিয়ে বেশ কয়েকটি নাটক মঞ্চস্থ করেন। সে সময়ই তাঁর রচিত 'আনন্দমন্দির' নাটকটি ছাত্রদের দ্বারা অভিনীত হয়।[৩০] অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, তিনিও নরেশ-চন্দ্রের পরিচালনায় এই নাটকে অভিনয় করেছিলেন। ছাত্রদের নাট্যাভিনয়ে উৎসাহ লক্ষ্য করে নরেশচন্দ্র ছাত্রদের প্রস্তাব করলেন যে তাদের নিজেদের লেখা নাটক করতে হবে। নরেশচন্দ্রের এই প্রস্তাবে উৎসাহ পেয়ে বিখ্যাত নাট্যকার মন্মথ রায় 'অম্বা' নামে একটি একাঙ্ক নাটক লিখে নরেশচন্দ্রকে দেখান। মন্মথ রায় তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির ছাত্র ও ক্রীড়া সম্পাদক। নরেশচন্দ্র ছিলেন নাটকের ব্যাপারে যথার্থ জহুরী। মন্মথ রায়ের নাটকটি পড়ে তিনি মোহিত হয়ে যান কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে নাটকটি অভিনয় করতে অসুবিধা ছিল, কেননা নাটকটিতে চরিত্রের সংখ্যা ছিল খুবই কম অথচ বেশী সংখ্যক ছাত্র যাতে অভিনয় করতে পারে এমন নাটকই সাধারণত বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিনয়ের জন্য নির্বাচিত হোত। ফলে মন্মথ রায়ের 'অম্বা' নাটকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিনয় করানো সম্ভব হয়নি। কিন্তু নরেশচন্দ্র এমন একটি ভাল একাঙ্ক নাটক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে আবদ্ধ রাখতে চাইলেন না। এই তরুণ নাট্যকারকে দেশের নাট্যরসিকদের কাছে পরিচিত করে তোলার জন্য তিনি ঢাকা থেকে কলকাতায় এসে চেষ্টা করলেন নাটকটিকে 'ভারতবর্ষে' ছাপাতে। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সম্পাদক হরিদাস চট্টোপাধ্যায় নাটকটি ভারতবর্ষে ছাপতে রাজী হলেন না কিন্তু নরেশচন্দ্রের অনুরোধে তিনি 'স্টার' রঙ্গমঞ্চে নাটকটির অভিনয়ের ব্যবস্থা করে দিলেন, নাটকটির নতুন নাম দেওয়া হলো 'মুক্তির ডাক'। ১৯২৩ সালের বড়দিনে 'স্টার' থিয়েটারে 'মুক্তির ডাক' উদ্বোধন হয়। পরিচালনা করলেন অহীন্দ্র চৌধুরী। নাটকটির উদ্বোধন উপলক্ষ্যে নরেশচন্দ্র নাট্যকারকে এক শুভেচ্ছাবাণীতে লিখেছিলেন 'মুক্তির ডাক' বাংলা নাট্য সাহিত্যে একটা নতুন পথ

কাগজে দেখলাম যে আর্ট গ্যালারিতে ইউরোপীয় শ্রেষ্ঠ আর্টিস্টদের যেসব ছবির নমুনা ছিল সেগুলি অধ্যক্ষের আদেশে সেখান থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। এই নিয়ে খবরের কাগজে গালাগালি দেওয়া হয়েছিল। আমরা বাইরে থেকে আমাদের প্রচুর অজ্ঞতা নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে এই কার্যের নিন্দা করলাম। আমাদের প্রথম চোখ খুলল রবীন্দ্রনাথের এক প্রবন্ধে। তাতে ভারতীয় চিত্রকলার উৎকর্ষ এবং তার সঙ্গে আমাদের দারুণ অপরিচয় নিয়ে তিনি আক্ষেপ করেছিলেন। আর সেই সঙ্গে তিনি ভারতীয় চিত্রকলার নিদর্শন আর্ট গ্যালারিতে টাঙাবার জন্য বিদেশী চিত্রগুলি সরিয়ে ফেলার প্রশংসাও করেছিলেন।

এই সময় থেকে ভারতীয় চিত্রকলার প্রসার ও প্রশংসা ক্রমশঃ বেড়ে গেল। একদিকে হ্যাভেল সাহেবের ভারতীয় চিত্রকলার প্রতি বিশেষ অনুরাগ, অন্যদিকে লর্ড কার্জনের ভারতীয় চিত্রকলার প্রতি বিশেষ পক্ষপাতের ফলেই এই অবস্থা ঘটেছিল তা স্বীকার করতে হবে।

এই সময় ৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনে অবনীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে তাঁর অনুরাগী শিষ্যদলের মধ্যে ভারতীয় চিত্রকলার চর্চা আরম্ভ হয়েছিল।

অবনীন্দ্রনাথ নিজে এবং নন্দলাল প্রভৃতি শিল্পানুরাগীর দল সেইখানে বসেই অনেক-গুলো ছবি এঁকেছিলেন, যা আর্টিস্টদের কাছে বিশেষ সমাদর লাভ করেছিল।

আমার যতদূর মনে পড়ে, অবনীন্দ্রনাথ তখনো আর্ট কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল হননি। প্রবাসীতে এই সব ছবি এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানের তৎকালীন ও প্রাচীন চিত্র রঙে ছাপা হয়ে ক্রমাগত প্রকাশিত হতে লাগল। অজন্তার গুহাচিত্রের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়েছিল প্রবাসীর মাধ্যমে। তাছাড়াও মুঘল চিত্র, রাজপুত চিত্র বহুল পরিমাণে প্রবাসীতে বের হয়েছিল। হ্যাভেল ও অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয় চিত্রকলা প্রচারের জন্য যে চেষ্টা করেছিলেন তার পাশে প্রবাসী পত্রের এই প্রচেষ্টা বিশেষভাবে ফলবতী হয়েছিল। প্রবাসীর সঙ্গে সঙ্গে রামানন্দবাবুর সম্পাদিত মডার্ণ রিভিয়্যুতেও এ সব চিত্র ছাপা হত। এর ফলে তখন লোকসমাজে ভারতীয় ও পূর্বাঞ্চলের চিত্র-কলার প্রতি অনুরাগ বিপুল পরিমাণে বেড়ে গিয়েছিল।"[৩৪] নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তও সে সময় থেকে চিত্রশিল্পে অনুরাগী হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর নিজের আঁকা ছবিগুলো[৩৫] ভারতীয় শিল্পকলার আদর্শেই অঙ্কিত।

বাল্যকালেই নরেশচন্দ্র সংকল্প করেছিলেন যে জীবনে প্রয়োজনের অতিরিক্ত আয় করবেন না। বেশী আয় হলে তা জনসাধারণের কল্যাণে ব্যয় করবেন। তাঁর বাল্যকালের এই সংকল্পের কথা তিনি ভোলেন নি। তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ যখন স্থির করলেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাজে সহায়তা করার জন্য অধ্যাপকদের একটি বিশেষ ভাতা দেওয়া হবে তখন নরেশচন্দ্র সেই ভাতা নিতে অস্বীকার করেন এবং বিকল্প প্রস্তাব করেন যে এই নির্ধারিত টাকা দরিদ্র ছাত্রদের বৃত্তি হিসাবে দেওয়া হোক। নরেশচন্দ্রের এই শুভবোধ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক অধ্যাপকদেরই উষ্মার কারণ

হয়েছিল এবং এর ফলস্বরূপ পরবর্তীকালে নরেশচন্দ্রকে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক নির্বাচনে পরাজিত হতে হয়েছিল—জনপ্রিয়তার শীর্ষে অধিষ্ঠিত হয়েও। কর্তৃপক্ষ কিন্তু সেই বিশেষ ভাতার টাকা অধ্যাপকদের দেননি—ছাত্রদেরও না।

নরেশচন্দ্রের কর্মকুশলতা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেকেরই ধারণা হয়েছিল যে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত নিশ্চয়ই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আগামীদিনে উচ্চতর পদে প্রতিষ্ঠিত হবেন। নরেশচন্দ্র কিন্তু তাঁর অদূর ভবিষ্যতের কথা চিন্তা না করে, আট ন' বছরের ঢাকা বাস তুলে দিয়ে কলকাতায় ফিরে এলেন। এর পিছনে অবশ্য কারণ ছিল, নরেশচন্দ্র বিদ্বান ছিলেন, দর্শন জানতেন, রাজনীতি বুঝতেন কিন্তু স্বার্থান্বেষী চক্রান্ত জানতেন না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে একটা পরিবর্তন তিনি লক্ষ্য করেছিলেন এবং সেই সঙ্গে তথাকথিত বন্ধু ও সহকর্মীদের ব্যবহারের মধ্যে অস্পষ্ট হলেও একটা বিরূপতা তিনি অনুভব করেছিলেন। তাঁর সত্যনিষ্ঠ সরল শিল্পীমন নিঃসন্দেহে সেই কারণে আহত হয়েছিল। স্যার আশুতোষ মুখার্জী পূর্বাহ্নেই নরেশচন্দ্রের মানসিক আঘাত পাওয়ার সম্ভাবনা অনুমান করতে পেরেছিলেন এবং সেজন্য ডেকে পাঠিয়েছিলেন নরেশচন্দ্রকে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করার জন্য এবং সেই সঙ্গে হাইকোর্টে যোগ দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন।[৩৬]

১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে নরেশচন্দ্র কলকাতায় ফিরে এলেন এবং কলকাতা হাইকোর্টে পুনরায় যোগ দিয়ে আত্মনিয়োগ করলেন আইন ব্যবসায়। কিন্তু হাইকোর্টে তাঁর একদা প্রতিষ্ঠিত গৌরবকে ফিরে পেতে তাঁর কঠিন সংগ্রাম করতে হল। নরেশচন্দ্রের আর্থিক অবস্থাও তখন মোটেই ভাল ছিল না কিন্তু স্থির দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় নিয়ে তিনি নিমগ্ন রইলেন আইনের দুরূহ যুক্তিজালে এবং শেষ পর্যন্ত হারানো প্রতিষ্ঠা অধিকার করলেন আয়াসসাধ্য প্রচেষ্টায়। চাঁপা প্রকৃতির মানুষ নরেশচন্দ্র সবরকম প্রতিকূলতাকেই যুক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করলেন অবলীলায়, দুঃখ-কষ্টকে স্বীকার করলেন বিদ্যার বিনয়ে এবং জয় করলেন সংযম দিয়ে।

১৯১৯ থেকে ১৯২৪ সালের মধ্যেই নরেশচন্দ্র প্রকাশ করেন প্রায় দশটি উপন্যাস এবং ঔপন্যাসিক হিসাবে তিনি তখন প্রতিষ্ঠিত। ঢাকা থেকে চলে এসে অর্থনৈতিক অসুবিধার মধ্যে পড়লেও তিনি কখনোই তাঁর সাহিত্যকে অর্থকরী পণ্যে পরিণত করেন নি এবং এই সম্পর্কে তিনি ছিলেন বেশ কিছুটা উদাসীন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত প্রান্তর, নির্জন পরিবেশ ও অবসরই যে নরেশচন্দ্রের সাহিত্যচর্চার অনুকূলে ছিল এ ঘটনা অবাস্তর প্রমাণ করলেন নিজেই। কেননা কলকাতার ল্যানসডাউন রোডের স্বল্প পরিসর বাসা বাড়ীতে প্রচণ্ড কর্মচঞ্চলতার মধ্যেও অপ্রতিহত ছিল তাঁর সাহিত্য-চর্চা। স্ত্রীর-অসুখ, ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা, নিজের মক্কেল আদালত এসব কিছুর ফাঁকে ফাঁকে তিনি লিখে গেছেন অবিরাম এবং দ্রুতগতিতে।

১৯৫৪ সালে 'মধ্যবিত্ত' পত্রিকার সম্পাদকের প্রশ্নের উত্তরে নরেশচন্দ্র লিখেছেন—'কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনে আমার অংশ সম্বন্ধে আপনারা প্রশ্ন করেছেন। স্বাধীন

ও স্বতন্ত্র ভাবে Socialistic outlook বাংলাদেশে হয়তো আমিই সর্বাগ্রে প্রবর্তন করেছিলাম। আর কেউ আগে তা করে থাকলেও আমার তা জানা নেই। কিন্তু ১৯২০ সালের পর বোধহয় একদল এই মত নিয়ে সঙ্ঘবদ্ধ হবার চেষ্টা করেন। তার মধ্যে ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম ও মুজাফ্ফর আহম্মদ। তাঁরা আমাকে, অতুল গুপ্তকে ও আরও অনেক লোক নিয়ে দল গঠন করেন এবং প্রথমে নজরুলের 'লাঙল' ও পরে মুজাফ্ফর আহম্মদ সম্পাদিত 'গণবাণী' কাগজ প্রতিষ্ঠা করেন। আমি ছিলাম এঁদের প্রথম সভাপতি, অতুল গুপ্ত ছিলেন সরকারী সভাপতি।

তারপর মীরাট ষড়যন্ত্রের মামলা হয়ে এদের দলের অস্তিত্ব লোপ পায়।'[৩৭]

১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে 'সবুজপত্র' প্রকাশিত হয়। 'সবুজপত্রে' প্রথম বর্ষেই নরেশচন্দ্রের একটি লেখা প্রকাশ লাভ করে।[৩৮] এই 'সবুজপত্র' পত্রিকাটি মূলতঃ নবীন লেখকদের মুখপত্র হলেও স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এর নেপথ্যে এবং প্রমথ চৌধুরীর মত তৎকালীন বিদগ্ধজন ছিলেন পত্রিকাটির সম্পাদক। প্রমথ চৌধুরী নিজেও বিভিন্ন ও বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করে পত্রিকাটিকে অনন্যসাধারণ করে তুলেছিলেন কিন্তু তবু তৎকালীন কিছু প্রবীণ সাহিত্যসেবী এই নব্যধারার পত্রিকাটিকে অভিনন্দিত করতে পারেননি। প্রায় ঠিক সে সময়ই চিত্তরঞ্জন দাস সম্পাদিত 'নারায়ণ' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে এই 'নারায়ণ' পত্রিকাটিকে 'সবুজপত্রের' বিরোধী পত্রিকা বলে অনেকেই ধারণা পোষণ করেন। প্রবীণ সাহিত্যিক ও রাষ্ট্রনীতিবিদ বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় ছিলেন 'নারায়ণ' পত্রিকার নিয়মিত লেখক। "'নারায়ণ' পত্রিকার······আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য হইল প্রমথ বাবুর ভাষা অর্থাৎ চলিত ভাষা এবং রবীন্দ্রনাথের ভাব।"[৩৯] রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের প্যারডি 'মৃণালের কথা' নারায়ণের প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। নরেশচন্দ্রও 'নারায়ণে' একটি গল্প লেখেন।[৪০] এই গল্পে রবীন্দ্রনাথের 'নষ্ট নীড়' এর ছায়া অতিমাত্রায় স্পষ্ট। জনৈক সমালোচকের মতে 'নষ্টনীড়ের গল্প সমাপ্তি সমাজ বিবেক নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ শিল্পরসিকের মনে পলায়নপরতার যে নালিশ পুঞ্জিত করেছিল, 'ঠানদি' যেন তার গাল্পিক জবাব।'[৪১] যাই হোক, মোট কথা নরেশচন্দ্র এ দু'টি পত্রিকার কোনটারই গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন না। যদিও তাঁকে পরবর্তী সময়ে 'সাহিত্যধর্মের সীমানা' প্রবন্ধ লেখার জন্য রবীন্দ্র-অনুরাগীদের বিরাগভাজন হতে হয়। দুঃখিত চিত্তে নরেশচন্দ্র সেই সময় রবীন্দ্রনাথকে একটি চিঠি লেখেন। ২২শে জুন, ১৯২৮ তারিখে রবীন্দ্রনাথ সেই পত্রের উত্তরে নরেশচন্দ্রের অভিমানের মালিন্যটুকু মুছে দেন।[৪২]

১৯২৮ সালের মধ্যেই নরেশচন্দ্র উনিশটি উপন্যাস প্রকাশ করেন। সেই সময়ই সর্বকালীন ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় গড়ে ওঠে। কিন্তু ইতিপূর্বেই সাহিত্যধর্মের সীমানার বিষয়ে নরেশচন্দ্র সম্পর্কে শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন—

"······নরেশচন্দ্রের প্রতি অনেকেই প্রসন্ন নহেন জানি। কিন্তু, মত্ততার আত্ম-বিস্মৃতিতে মাধুর্যহীন রূঢ়তাকেই শক্তির লক্ষণ মনে করিয়া পালোয়ানির মাতামাতি করিতে তাঁহাকে কোন বইয়েই দেখিয়াছি বলিয়া মনে করিতে পারি না। তাঁহার সহিত পরিচয়

আমার নাই, কখনো তাঁহাকে দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না, কিন্তু পাণ্ডিত্যে, জ্ঞানে, ভাষার অধিকারে, চিন্তার বিস্তারে এবং সর্বোপরি স্বাধীন অভিমতের অকুণ্ঠিত প্রকাশে বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার সমতুল্য লেখক কেহ আছেন বলিয়াও ত স্মরণ হয় না।"[৪৩]

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন, ১৮শ অধিবেশনে (মাজু, হাওড়া) শরৎচন্দ্রের সভাপতিত্ব করার কথা ছিল কিন্তু তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় সেই অধিবেশন পরিচালনার ভার পড়ে নরেশচন্দ্রের উপর। নরেশচন্দ্র সেই সভার অভিভাষণে একটি গল্পের অবতারণা করে শরৎচন্দ্রের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও শরৎচন্দ্রের জন্য নির্দিষ্ট আসন অধিকার করার জন্য তাঁর নিজের মানসিক অবস্থা ব্যক্ত করেছিলেন চমৎকার ভাবে—'এক গ্রামে এক যাদুকর গিয়াছিল। সে বিজ্ঞাপনে বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া দিয়াছিল যে......সে তার থলির ভিতর হইতে একটি জীবন্ত বাঘ বাহির করিবে।...এই যাদুকরেরও একটি পোষা বাঘ ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে সেইদিনই বাঘটা কেমন করিয়া পলাইয়া গেল।...শেষে সে খেলা দেখাইতে আরম্ভ করিল। সবই হইল, কেবল যখন বাঘ বাহির করিবার কথা, তখন সে থলি হইতে বাহির করিল একটি বিড়াল। মাজুর সাহিত্য সম্মিলনের উদ্যোক্তাদের দশাটা অনেকটা যাদুকরের মত। এঁরা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে আজিকার সভায় সভাপতি হইবেন সাহিত্য-শার্দূল শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।...আর এঁরা উপস্থিত করিয়াছেন আমাকে। সেই প্রসিদ্ধ যাদুকর তার দর্শকদের বলিয়াছিল যে, বিড়ালও ব্যাঘ্র বিশেষ, প্রাণীতত্ত্বের এক পর্যায়ে তাদের স্থান। এঁরাও হয়ত আপনাদের বলিবেন যে আমিও, শরৎবাবুর মত, ঔপন্যাসিক।

...আপনারা ইহাদিগকে ক্ষমা করিবেন কি না জানি না।

...আমি আজ সকালে যখন বাড়ী ছাড়িয়া আসি তখন পর্যন্ত আমি কল্পনা করিতে পারি নাই যে আজ আমাকে শরৎবাবুর জন্য কল্পিত সিংহাসন অধিকার করিতে হইবে।

...কিন্তু আসিয়া পড়িয়াছি এবং আমার নগ্ন তুচ্ছতাকে আবৃত করিবার কোন আয়োজনই করি নাই।'[৪৪] সেই বছরই নরেশচন্দ্র মেদিনীপুর ও নৈহাটিতে অন্য দুটি সাহিত্য সম্মিলনে সভাপতিত্ব করেন।

'প্রবাসী' পত্রিকার ভাদ্র সংখ্যায় (১৩২৬) শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী 'বেদান্ত ও সেবাধর্ম' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধ সম্পর্কে নরেশচন্দ্রের কিছু ভিন্ন বক্তব্য ছিল। নরেশচন্দ্র সংস্কৃত জানতেন এবং অত্যন্ত অধ্যবসায়ের সঙ্গে তিনি মূল বেদ ও বেদান্ত (অপানিনীয় সংস্কৃত লেখা) পড়েছিলেন। তিনি 'প্রবাসী'র পৌষ সংখ্যায় (১৩২৬) ঐ প্রবন্ধের উত্তরে একটি প্রতিবাদ প্রবন্ধ লেখেন। নরেশচন্দ্রের সংস্কৃত জ্ঞান তাকে তাঁর পরবর্তী জীবনে এক অভিনব পরিবেশে সাহায্য করেছিল, ঘটনাটি ঘটেছিল কলকাতার হাইকোর্টে। এক অবাঙ্গালী ব্যক্তিকে নরেশচন্দ্র জেরা করার জন্য আদালতের কাঠগড়ায় তোলেন। কিন্তু ভদ্রলোক নরেশচন্দ্রের কোন প্রশ্নেরই জবাব দেন না কেননা তিনি জানান যে বাংলা ইংরেজী বা হিন্দী কোন ভাষায়ই তিনি কথা

বলতে পারেন না। নরেশচন্দ্র প্রশ্ন করে জানতে পারেন যে ভদ্রলোক সংস্কৃত জানেন তখন তিনি আগাগোড়া সংস্কৃতে সওয়াল জবাব করেছিলেন।[৪৫]

জীবনের অধিকাংশ সময় নরেশচন্দ্র শহরে বাস করলেও পল্লীগ্রামের উন্নতি সম্পর্কে তিনি সব সময়ই সচেষ্ট ছিলেন। তিনি অনুভব করেছিলেন যে কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের উন্নতি, পল্লীগ্রামের উন্নতি ছাড়া সম্ভবপর নয়। বাংলাদেশের নদনদী নিয়ন্ত্রণ, পাট চাষের সুবিধা অসুবিধা ইত্যাদি সম্পর্কে একাধিকবার তিনি সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করেছেন, যদিও তাঁর সেসব প্রস্তাব গৃহীত হয়নি। কলকাতায় এসে তিনি বিপিনচন্দ্র পালের পুত্র জ্ঞানাঞ্জন পালের সঙ্গে 'পল্লী স্বরাজ' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। গ্রাম বাংলার পরিচয়, সমস্যা, সমাধান ইত্যাদিই ছিল সেই পত্রিকার মূল বিষয়বস্তু।

১৯২৩ সালে (বৈশাখ, ১৩৩০) 'কল্লোল' পত্রিকা প্রকাশকালে নরেশচন্দ্র ঢাকায় ছিলেন। কলকাতায় চলে আসার পরেও অনেকদিন পর্যন্ত 'কল্লোল' পত্রিকার নবীন লেখকদের সঙ্গে তাঁর কোন পরিচয় ছিল না, 'কল্লোল' পত্রিকার পাঠকও তিনি ছিলেন না। কিন্তু কল্লোলগোষ্ঠী নরেশচন্দ্রকে শ্রদ্ধা করত খুব কাছের মানুষ হিসাবে। তাই কল্লোলগোষ্ঠীর অন্যতম দীনেশরঞ্জন দাস একাধিক বার নরেশচন্দ্রের কাছে এসেছেন লেখার আবেদন নিয়ে। ব্যস্ত মানুষ নরেশচন্দ্র কল্লোলের জন্য লিখতে পারেননি। কল্লোলে তাঁর কোন রচনা প্রকাশিত হয়নি। তবে এই নবীন লেখকদের তিনি সব সময়ই উৎসাহ এবং সাহস দিয়েছেন।

১৩৩০ থেকে ১৩৩৬ সাল পর্যন্ত 'শনিবারের চিঠি'র প্রতিটি সংখ্যায়ই 'মণিমুক্তা' প্রভৃতি বিভাগে আলোচনার প্রধান বিষয় ছিল ডঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের উপন্যাস এবং 'কল্লোল-কালিকলম-প্রগতি' পত্রিকায় প্রকাশিত রচনা। এঁদের বিরুদ্ধে 'শনিবারের চিঠি'র প্রধান অভিযোগ যে এঁরা অশ্লীল সাহিত্য প্রচার করছে। 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক 'বিরহ সংখ্যায়' (আষাঢ় ১৩৩৩) ছদ্মনামে[৪৬] একটি নাটকের অবতরণিকায় লিখলেন—

"আমরা নূতন যুগের প্রবর্তন করিতে চাই। পুরাতনের দিন চলিয়া গিয়াছে, ক্রিমিনলজি ও সাইকো-এনালিসিসের শুষ্ক পাতায় যৌন সম্বন্ধীয় আধুনিক থিওরিগুলি নষ্ট হইতে বসিয়াছে। আমরা সরস নাটকে তাহাদিগকে সজীবভাবে জগতের সম্মুখে ধরিতে চাই।...শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় ও ঢাকাপ্রবাসের পর চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের গুরু এবং কলিকাতার 'কল্লোল' সম্প্রদায় আমাদের পৃষ্ঠপোষক। শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয়ের 'শুভা', 'শাস্তি', 'পাপের ছাপ,' 'ব্যবধান,' 'দত্তগিন্নী' প্রভৃতি পুস্তক ও শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'নষ্টচন্দ্র', 'হাইফেন', ফটো চিত্র সম্বলিত 'রূপের ফাঁদ' প্রভৃতি পুস্তকগুলির ভিতর দিয়া আমাদের সূক্ষ্ম প্রতিভার উন্মেষ হইয়াছে এবং কল্লোলের নব নব রূপ আমাদিগকে নব নব ভাবের আহার্য যোগাইতেছে। ইহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করিলে পাপ হইবে।"—উক্তিটি ব্যজস্তুতি বলাবাহুল্য। নরেশচন্দ্র কিন্তু শনিবারের চিঠির এই ধরনের সকল দৌরাত্ম্য লক্ষ্য করেও অসীম

ধৈর্যের সঙ্গে স্থির ছিলেন। শনিবারের চিঠি নরেশচন্দ্রের এই সহ্য করার শক্তিকে দুর্বলতা ভেবে ভুল করলো। তাঁরা বেপরোয়াভাবে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় নরেশচন্দ্রকে আক্রমণ করে চললো। এ সময় নাকি নরেশচন্দ্র সাহিত্য আসর থেকে বিদায় দেওয়ার সংকল্প করেছিলেন, এই তথ্যকে পুঁজি করে শনিবারের চিঠি নরেশচন্দ্রের একটি কার্টুন প্রকাশ করে। কার্টুনের বিষয় নৃত্যরত শামলা ও ওড়না পরিহিত নরেশচন্দ্র। হাতে বিদায় বেলার মালা। এই ঘটনায় নরেশচন্দ্র বিরক্ত হয়ে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে একটি চিঠি দেন এবং শনিবারের চিঠিও কিছুদিন চুপচাপ থাকে।

'কালি কলম' পত্রিকার সঙ্গে নরেশচন্দ্রের যোগাযোগ ছিল। তাঁর 'রূপের অভিশাপ' উপন্যাসটি এই 'কালি কলম' পত্রিকায়ই ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।[৪৭] এই সূত্রেই নবীন লেখকদের সঙ্গে তাঁর একটা সস্নেহ সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

কাশী থেকে মহেন্দ্র রায় নামে জনৈক সমালোচক 'কালি কলম' পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি রচনা সম্পর্কে আপত্তি তোলেন এক প্রবন্ধে। তাঁর মতে শৈলজানন্দ [লেখারাজ সামন্ত] রচিত 'দিদিমণি', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পোনাঘাট পেরিয়ে', নজরুল ইসলামের 'মাধবী প্রলাপ' এবং মোহিতলালের 'নাগার্জুন', ইত্যাদি রচনা অশ্লীল এবং প্রকাশের অযোগ্য। এই প্রবন্ধের একটি প্রতিবাদ প্রবন্ধ লেখেন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত [সত্যসন্ধ সিংহ] ছদ্মনামে। সে প্রবন্ধে সাহিত্যে শ্লীলতা অশ্লীলতা নিয়ে মৌলিক আলোচনা করেছিলেন তিনি। এই মহেন্দ্র রায় শেষ পর্যন্ত 'শ্রাবণ-ঘন গহন মোহে' নামে একটি গল্প লিখলেন। পুলিশের খাতায় গল্পের নাম উঠলো 'সাহিত্যে অশ্লীলতা' দোষে। 'কালি কলমের' সম্পাদক ও প্রকাশকও অভিযুক্ত হলেন। সেই ঘটনায় বিভ্রান্ত হয়ে সম্পাদক ও প্রকাশক পরামর্শ চাইলেন নরেশচন্দ্রের কাছে। নরেশচন্দ্র 'একে সার্থকনামা উকিল, তাঁর উপর সাহিত্যিক, সর্বোপরি অতি আধুনিক সাহিত্যের পরাক্রান্ত পরিপোষক। অভিযুক্ত লেখাদুটি মন দিয়ে পড়লেন অনেকক্ষণ। বললেন, নট গিল্টি প্লিড করুন।[৪৮] নরেশচন্দ্র স্টেটমেন্ট লিখে দিলেন। কোর্টে বেনিফিট অব ডাউটে ছাড়া পেলেন সবাই। তাই তখনকার সব সাহিত্যিকের মনে যখন আইন আদালতের ভয় ঢুকেছে তখনও কিন্তু তরুণদের ভয়ডর নেই। তাঁদের নরেশচন্দ্র আছেন।'[৪৯]

ঢাকায় চলে যাওয়ার পর থেকেই নরেশচন্দ্র প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন নি। সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের মতে নরেশচন্দ্র দেশ, সমাজ ও রাজনীতি সম্পর্কিত চিন্তাভাবনা থেকে কখনোই বিরত থাকেন নি। ব্যস্ত জীবনে বিভিন্ন কাজ কর্মের মধ্যে থেকে সরাসরিভাবে দেশের কাজের সঙ্গে হয়ত তিনি জড়িয়ে পড়তে পারেন নি কিন্তু তিনি বিভিন্ন উপন্যাসের মধ্যে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আর উদারচেতা নরেশচন্দ্র যুক্তি ও বিচার আলোকে কখনোই কোনো ভিন্নপন্থীকে ছোট করে দেখেন নি। নরেশচন্দ্র গান্ধীবাদী ছিলেন না কিন্তু যথার্থ গান্ধীবাদীদের কখনো অশ্রদ্ধা করেন নি। তাঁর মূল আদর্শ ছিল কর্মে ও আচরণে সত্যনিষ্ঠা।

১৯৩০ সাল থেকে ১৯৩৫ সালের মধ্যে নরেশচন্দ্রের আবার কিছুটা রাজনীতির সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে। 'আত্মকথা'য় তিনি উল্লেখ করেছেন—'...১৯৩০ সালের পর কাউন্সিলে একটা তথাকথিত প্রজাপার্টি হয়, সেটা ক্রমে হয়ে গেল নাজিমুদ্দিনের মন্ত্রীদলের ধামাধরা। তার বাহিরে একটা কৃষক প্রজা দল ছিল, মৌলানা আক্রাম খাঁ ছিলেন তার সম্পাদক। তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল। ময়মনসিংহে এই দলের যে সভা হয় তাতে সভাপতি নিয়ে আক্রাম খাঁর সঙ্গে মতবিরোধ হয় ফলতঃ তিনি দল ত্যাগ করেন। ফজলুল হক হলেন সভাপতি। ১৯৩৫ সনের প্রথম নির্বাচনের প্রাক্কালে ঢাকায় আর একটা সম্মেলন হয়, তাতেও ফজলুল হককে আমরা সভাপতি নির্বাচিত করেছিলাম। ১৯৩৫ সালের নির্বাচনে এই দল মুসলিম লীগকে পরাজিত করে সংখ্যাধিক্যে নির্বাচিত হন। কিন্তু তারপর এঁরা মুসলীম লীগের সঙ্গে মিতালি করে যে সব কাজ করেন, তাতে আমি তাঁদের সঙ্গে সব সম্পর্ক ত্যাগ করি এবং সেই থেকে আমি সম্পূর্ণভাবে পলিটিক্স থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করি।'[৫০]

১৯৩৭ সালে প্রগতি লেখক সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীযুক্ত নীহারেন্দু দত্তমজুমদার মহাশয় নরেশচন্দ্রকে প্রথম সভাপতিত্বের ভার দেন। ঐ সংঘ সে বছরই একটি সাহিত্য সংকলন বের করে। এই সংকলনের সম্পাদক ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী এবং হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। এই সংকলনের 'মুখবন্ধে' তিনি লিখেছেন—

'...আমরা শুধু বলতে পারি যে যারা এতে লিখেছেন, তাঁরা বিশ্বাস করেন না যে সামাজিক চৈতন্য সাহিত্যসৃষ্টির পরিপন্থী, তাঁরা মনে করেন যে, কোন লেখকই সমাজ সমস্যা সম্বন্ধে নির্বিকার হতে পারেন না। রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে তাঁদের পরস্পরের মতভেদ আছে বটে, কিন্তু তাঁরা সকলেই ফ্যাসিজমের বিরোধী, ফ্যাসিজম্ সংস্কৃতিকে ধ্বংস করছে, প্রগতির পথ রুদ্ধ করছে, গণশক্তিকে খর্ব করছে বলে। ...আমাদের দেশের লেখকরা সাধারণতঃ আর্থিক দুশ্চিন্তা থেকে সহজে অব্যাহতি পান না, আর সেজন্যই আমাদের সাহিত্যের বিশেষ ক্ষতিই হয়ে থাকে। প্রগতি লেখক সংঘের একটা উদ্দেশ্য হচ্ছে লেখকদের ন্যায্য অধিকার সংরক্ষণ... .'

সভাপতি হিসাবে নরেশচন্দ্র সেই সংকলনের ভূমিকায় সাহিত্যে প্রগতির লক্ষণ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করলেন। প্রসঙ্গতঃ লিখলেন অর্থবৈষম্যের কথা, মনুষ্যত্বকে নিষ্পেষিত করা সমাজবন্ধনের কথা। প্রগতি সংঘের পরিচয় দিতে গিয়ে লিখলেন 'প্রগতি লেখক সংঘ সাহিত্য ও সমাজে প্রগতিকামী সে অভীপ্সিত প্রগতি সাধনের পক্ষে সংঘের উপায় সাহিত্য।'

১৯৩৯ সালে নরেশচন্দ্র অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এই অসুস্থ অবস্থায়ও কর্তব্য থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হননি। উপন্যাস এবং প্রবন্ধ লিখেছেন সে সময়ও। তাঁর তখন বিরাট সংসার। এই বিরাট সংসারের বড় দায়িত্ব থেকে আরম্ভ করে খুঁটিনাটি সমস্তই নরেশচন্দ্রের নিজেকেই দেখতে হতো। শান্ত, গম্ভীর নরেশচন্দ্র

এক কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মধ্য দিয়ে সংসারে যে আদর্শ আবেষ্টনী গড়ে তুলেছিলেন তার ফলেই তাঁর প্রতিটি সন্তান হয়ে উঠেছে উচ্চশিক্ষিত। কিন্তু অন্যদিকে তিনি ছিলেন বেশ কিছুটা উদাসীন ও আত্মভোলা তাই দিনলিপি লেখেননি কোনদিন, এমন কি সংরক্ষণ করেননি নিজের অজস্র রচনাও।

অসম্ভব ধৈর্য ছিল নরেশচন্দ্রের, অস্থির বা বিচলিত হননি কখনো—শিশুবয়সে মাতার মৃত্যুতে নয়, যৌবনে কন্যার মৃত্যুতেও নয়। হতে পারে শৈশব কালের একটা অভিমান, যা সঞ্জাত হয়েছিল মাতার আকস্মিক মৃত্যুতে, শোকতাপের ব্যাপারে তাঁকে দৃঢ় ও নিরুত্তাপ করে তুলেছিল। বহু শোকাবহ ঘটনার দিনেও তিনি স্বাভাবিকভাবেই নিজের দৈনন্দিন কাজকর্ম করেছেন অন্যান্য দিনের মতই। কিন্তু মানুষের জীবনে মাঝে মাঝে ব্যতিক্রম দেখা দেয়—নরেশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুসংবাদে ভেঙ্গে পড়েছিলেন শোকে। অসময়ে কোর্ট থেকে ফিরে এসেছিলেন সেদিন—সারা দিনরাত ঘরে বসেছিলেন স্তব্ধ হয়ে। কবির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন সেদিন একান্তে নীরব স্মৃতিচর্চায় স্বীকৃতিময় কৃতজ্ঞতায়। সমাজজীবনের একটা প্রচলিত নিয়ম মৃত্যুর পর সব রকমের বিরোধ ভুলে যাওয়া কিন্তু নরেশচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কোন বিরোধও ছিল না। যা ছিল তা হচ্ছে সাহিত্যাদর্শের কিছু পার্থক্য মাত্র। নরেশচন্দ্র তাঁর 'আনন্দমন্দির' নাটকে[৫১] রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধার কথা উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ৭০তম জন্মজয়ন্তী কমিটির সহ সভাপতি ছিলেন নরেশচন্দ্র। পরবর্তী সময়ে মজফ্ফরপুর সাহিত্যসভায় রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সশ্রদ্ধ প্রবন্ধ পাঠ করেছেন আর 'আত্মকথায়' লিখেছেন—

'তাঁর [রবীন্দ্রনাথ] সঙ্গে বিরোধ আমার কখনও হয়নি। আমি শুধু তার সাহিত্য ধর্ম সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধের আলোচনায় ভিন্ন মত প্রকাশ করেছিলাম। তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত ভাবে নিবিড় সম্পর্ক কখনও হয়নি, তবে এককালে তিনি আমার লেখার অনুরাগী ছিলেন। আমি চিরদিনই তাঁর ভক্ত এবং আমার যা কিছু সাহিত্য চেষ্টা তার প্রধান উৎস যে তাঁর সাহিত্য একথা আমি চিরদিনই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছি।'[৫২]

১৯৪২ খ্রীস্টাব্দে নরেশচন্দ্র রংপুরে একটি আইন সংক্রান্ত কাজে যান, সে সময় স্থানীয় ছাত্রদের একটি সাহিত্য সম্মেলন ছিল, কাজের অবসরে নিমন্ত্রিত হয়ে তিনি সেই সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন। সাহিত্যের আসরে তখন নরেশচন্দ্রের স্নেহধন্য নবীন লেখকদের প্রতিপত্তি। তিনি নিজেও তখন খুব কম লিখছেন এবং যে পথে তিনি সাহিত্যযাত্রা শুরু করেছিলেন নবীন লেখকরা সেই পথ ধরেই তখন অনেকটা এগিয়ে গেছে, অর্জন করেছে জনপ্রিয়তাও। এই নবীন লেখকদের সূক্ষ্ম কারুকার্যখচিত আধুনিক ভাষা ও কাব্যধর্মী প্রকাশ পাঠকসাধারণের মনোরঞ্জনের পক্ষে ছিল যথেষ্ট আর সেই সঙ্গে নরেশচন্দ্রও যেন পাঠকদের কাছ থেকে ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছিলেন।

এই সময়ই গান্ধীজীর নেতৃত্বে এক বিরাট আন্দোলন আরম্ভ হলো। নরেশচন্দ্র কিন্তু

নির্দেশিকা

১। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। 'আত্মকথা', যুগ পরিক্রমা, ১ম খণ্ড ১৯৬১।

২। 'সাহিত্য'। ৫ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা অগ্রহায়ণ, ১৩০১, পৃঃ ৫৩১-৫৩২।

৩। 'দাসী'। ৫ম ভাগ, ৫ম সংখ্যা মে, ১৮৯৬, পৃঃ ২২৫-২২৮।

৪। পূর্বোক্ত পত্রিকা। ৫ম ভাগ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, জুন ১৮৯৬, পৃঃ ৩৩০-৫৩১।

৫। পূর্বোক্ত পত্রিকা। পৃঃ ৩৩২-৩৩৩।

৬। Calcutta University Calendar, 1898. Page 249

৭। Lovat Fraser, 'India under Curzon and after', London, 1911. Page 380.

৮। Rinsley Letter No. 3678 dated: Calcutta, The 3rd December, 1903.

৯। Circular No 1679, P.D dated: Darjeeling, The 10th October, 1905.

১০। An 'Extraordinary Circular', The Statesman, Sunday 22nd October, 1905.

১১। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। 'বঙ্কিম রচনাবলী', ১ম খণ্ড, ২য় প্রকাশ, সাহিত্য সংসদ, মাঘ ১৩৬৩, পৃঃ ৪৫। 'সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান', পৃঃ ২৪৮ গ্রন্থে উল্লেখিত এর প্রকাশকাল ১৯১০। সম্ভবত ৪র্থ সংস্করণ।

১২। 'বঙ্গদর্শন'। নব পর্যায়। শৈলেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত, ১১শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা অগ্রহায়ণ, ১৩১৮ থেকে ১২শ সংখ্যা চৈত্র ১৩১৮ পর্যন্ত।

১৩। 'গল্প লেখার গল্প' জ্যোতিপ্রসাদ বসু সম্পাদিত। প্রথম প্রকাশ ১৩৫৩। পৃঃ ১-৭২।

১৪। Majumdar, R. C 'Struggle for freedom', 1969. Page 880.

১৫। Ibid, Page 881.

১৬। Ibid, Page 889-894.

১৭। Sengupta, Nareschandra, 'Sources of Law and Society in ancient India' Calcutta, The University, 1913

১৮। ভারতবর্ষ, ১ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৫ম সংখ্যা। ১৩২০। পৃঃ ৬৬২।

১৯। তনিমা ঘোষ। অপ্রকাশিত ডাইরি।

২০। ঢাকার পরবর্তী মহিলা সমিতি 'দীপালী সংঘ' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন প্রখ্যাত সমাজসেবিকা লীলা রায়।

২১। জীবেন্দ্র সিংহ। 'কল্লোলের কাল',। এপ্রিল ১৯৭৩। পৃঃ ১২৯।

২২। বিখ্যাত সমাজসেবিকা ও কংগ্রেসকর্মী চারুপ্রভা সেনগুপ্ত, জন্ম ১৮৯৭, মৃত্যু ১৯৭৫।

২৩। রমেশচন্দ্র মজুমদার। "ঢাকার স্মৃতি", আমাদের সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, স্মরণিকা ১৯৭৪। পৃঃ ২৬।

২৪। পূর্বোক্ত রচনা, পৃঃ ২৭।

২৫। প্রফুল্লকুমার গুহ। 'আমাদের সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' পৃঃ ৭।

২৬। নরেশচন্দ্রের কন্যা পূর্ণিমা সিংহের মুখে শোনা।

২৭। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম এম. এ. ক্লাসের ছাত্রী ছিলেন লীলাবতী নাগ বিখ্যাত নেতা অনিল রায়ের স্ত্রী লীলা রায়।

২৮। মৃণাল দাশগুপ্ত। ১৯৪৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুনর্মিলন উৎসবে সভানেত্রীর ভাষণ। 'আমাদের সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্মরণিকা', ১৯৭৪।

২৯। পরিমল রায়। "পল্লী সমস্যা" বাসন্তিকা ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা ১৯২২, পৃঃ ১০২।

৩০। নরেশচন্দ্রের কন্যা সুষমা সেনগুপ্তের মুখে শোনা, অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ও কথাটি সমর্থন করেন।

৩১। মন্মথ রায় "ধাত্রীমাত্রা" আমাদের সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৪, পৃঃ ৩১।

৩২। আশুতোষ ভট্টাচার্য 'বাসন্তিকা, শতদল, সুপর্ণা' আমাদের সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭৪, পৃঃ ৭৬-৮৭।

৩৩। সুকুমার সেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস,. ৪র্থ খণ্ড ৩য় সংস্করণ, ১৯৭৯, পৃঃ ২৫৩-২৫৪।

৩৪। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। "আত্মস্মৃতির হীরক জয়ন্তী" শারদীয় অমৃত, ১৯৭০।

৩৫। চিত্রগুলি পূর্ণিমা সিংহের কাছে সংরক্ষিত আছে।

৩৬। সুষমা সেনগুপ্তের মুখে শোনা।

৩৭। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। "আত্মকথা" যুগপরিক্রমা ১ম খণ্ড ১৯৬১, পৃঃ ১০।

৩৮। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। 'যৌথ পরিবার', সবুজপত্র, ১ম বর্ষ ১৯১৪ ১৩২১, পৃঃ ৪৪৫।

৩৯। সুকুমার সেন। বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ২৩৯।

৪০। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। "ঠানদিদি" নারায়ণ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪, পৃঃ ৪৯৫।

৪১। ভূদেব চৌধুরী। বাংলা সাহিত্যের ছোট গল্প ও গল্পকার ১৯৬২, পৃঃ ৪৪৭-৪৪৮।

৪২। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। 'আত্মকথা' যুগ পরিক্রমা, পৃঃ ১৪-১৫।

৪৩। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় "সাহিত্যের রীতি ও নীতি", বঙ্গবাসী, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় অর্ধ, আশ্বিন ১৩৩৪, পৃঃ ২৪৬।

৪৪। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন, ১৮শ অধিবেশন, সভাপতির ভাষণ, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩৩৫।

৪৫। নন্দগোপাল সেনগুপ্তের মুখে শোনা।

৪৬। শনিবারের চিঠি, বিরহ সংখ্যা আষাঢ়, ১৩৩৩। ছদ্মনাম—কেবলরাম গাজনদার, নাটকের নাম কালপুরুষ।

৪৭। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। রূপের অভিশাপ, 'কালি কলম', ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৯২৭।

৪৮। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। কল্লোলযুগ। ১৩৫৭। পৃঃ ২৬৫।

৪৯। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত', 'দেশ' ১৭ই আশ্বিন, ১৩৭১ পৃঃ ৮২৫।

৫০। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। আত্মকথা, যুগপরিক্রমা, ১ম খণ্ড। ১৯৬১।

৫১। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। আনন্দ মন্দির, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ১৯২৩।

৫২। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। আত্মকথা, যুগপরিক্রমা, ১ম খণ্ড পৃঃ ১৩।

৫৩। শৈলবালা ঘোষ জায়া, ভাগের পূজা, ১৯২৩। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রসচক্র, ১৩৪৩। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, পঞ্চদশী ১৩৪৮, ও বান্ধবী।

৫৪। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। আত্মকথা, যুগ পরিক্রমা ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪, ১৫।

৫৫। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩৪৮ সাল। প্রকাশক, তারকদাস দত্ত, বাণীভবন।

৫৬। গল্পলেখার গল্প, জ্যোতিপ্রসাদ বসু সম্পাদিত, ১৩৫৩।

৫৭। যুগ পরিক্রমা ১ম ও ২য় খণ্ড ও 'স্বপ্ন সৌধ' উপন্যাস।

২

সাহিত্য সাধনার প্রেক্ষাপট

এক : সমাজ

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (১৮৮২-১৯৬৪) নিয়মিতভাবে উপন্যাস লিখতে শুরু করেন ১৯১১ খ্রীস্টাব্দ থেকে, তখন তাঁর বয়স প্রায় সাঁইত্রিশ। সেই সময় তিনি একজন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ আইনজীবী ও আইনশাস্ত্রের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক। এই মোটামুটি পরিণত বয়সে জীবনে প্রতিষ্ঠিত একজন ব্যক্তি যখন সাহিত্যচর্চা আরম্ভ করেন তখন ভেবে দেখা উচিত, এর পিছনে বিশেষ কোনও কারণ ছিল কি না। হতে পারে, সে-সময়কার প্রচলিত সাহিত্যের মধ্যে তিনি মনের সায় খুঁজে পাননি। সম্ভবত তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, সে-সময়কার সাহিত্য পুরোপুরি জীবনবিমুখ না হলেও তার মধ্যে অনেক ফাঁক ও ফাঁকি থেকে যাচ্ছিল। কিন্তু কথা-সাহিত্যের একটা প্রাথমিক শর্ত সামগ্রিক জীবনের সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করে চলা। তাই জীবনের অংশবিশেষকেও পরিহার করলে সাহিত্য কিছুটা জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। আর জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন কথা সাহিত্যে নরেশচন্দ্রের মতো জীবননিষ্ঠ লেখক তৃপ্তি পেতে পারেন না।

১৯১১ খ্রীস্টাব্দের আগে এবং তার পরেও বাংলাসাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা ও আধিপত্য ছিল চারজন প্রসিদ্ধ কথা-সাহিত্যিকের। তাঁরা হলেন বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। উৎকর্ষের বিচারে যাই হোক, জনপ্রিয়তার শীর্ষে

নিঃসন্দেহে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন শরৎচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্রের সুস্পষ্ট আদর্শবাদী মনোভাব, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে অতীন্দ্রিয় অনুভূতির সঞ্চার এবং প্রমথ চৌধুরীর কাহিনীর দুর্লভ বুদ্ধিদীপ্ত বঙ্কিম রশ্মি সেযুগের পাঠকদের হৃদয় পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারে নি। কিন্তু শরৎসাহিত্যে প্রতিফলিত আবেগ ও সহানুভূতি সাধারণ পাঠকের মন কেড়ে নিতে পেরেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ছাড়া উপরোক্ত তিনজনই বয়সে কমবেশী ছোটবড় হলেও সাহিত্যক্ষেত্রে প্রায় সমসাময়িক। বাংলা সাহিত্যের আসরে যখন রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী এবং আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৃত প্রস্তাবে সেই সময়েই কথা-সাহিত্যে নরেশচন্দ্রের আবির্ভাব।

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ছাত্রাবস্থায় ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, স্বর্ণকুমারী দেবী, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি এবং অবশ্য রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। তার স্মৃতিকথা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ থেকে এ বিষয়ে সাক্ষ্যপ্রমাণ উদ্ধার করা সম্ভব। তাই একথা অনুমান করা যায় যে, তিনি বাংলা সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন এবং তাঁর পক্ষে নতুনত্ব নিয়ে সাহিত্যের আসরে পদক্ষেপ অনেকটা সহজ হয়েছিল। এ ছাড়াও তৎকালীন সাহিত্যের সচেতনভাবে এড়িয়ে যাওয়া দিকটাকে উদ্ঘাটন করতে তিনি নিজেও ছিলেন উদ্‌গ্রীব।

কথাসাহিত্যের পাঠক যদি সমাজ সচেতন দৃষ্টিভঙ্গী আশা করেন, তা অন্যায় নয়। কেন না লেখক এবং পাঠক উভয় সম্প্রদায়ই সমাজে বাস করেন এবং কাহিনীতে বর্ণিত চরিত্রও সমাজ বহির্ভূত হতে পারে না। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে প্রায় সব ঔপন্যাসিকই কমবেশী সমাজের ত্রুটি বিচ্যুতি ও অন্ধ সংস্কারের কথা বারবার তুলে ধরেছেন। তাঁদের উপন্যাসে তাই সমাজ উপেক্ষিত তো নয়ই উপরন্তু ক্ষেত্রবিশেষে প্রাধান্যই লাভ করেছে। সেই সব উপন্যাসে যে সব চরিত্র নিয়ে কাহিনী শুরু হয়েছে সমাজের বিধিবদ্ধ প্রথার চাপে তারা নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে কাহিনীর পারম্পর্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এগিয়ে যেতে পারে নি। সামাজিক রীতিনীতি ও বিধিনিষেধের বলি হয়ে সেই চরিত্রগুলি হয় ভাবালুতার মধ্যে ডুবে গেছে, নয়ত বা লেখকের সুসংবদ্ধ কৌশলের ফলে নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ আদর্শের বাহন হয়ে পড়েছে।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে কিন্তু এই প্রথাসিদ্ধ সমাজ ও তার বঞ্চনার অভিযোগ অনেকাংশে কম। সমাজ তাঁর উপন্যাসে চরিত্র সৃষ্টির পটভূমি মাত্র। তবু তাঁর সৃষ্ট নায়ক-নায়িকারা তদানীন্তন সমাজের তুলনায় প্রগতিশীল এবং বেশ কয়েক ধাপ উন্নত। এর কারণ হয়ত সে-যুগের মুষ্টিমেয় শিক্ষিত পরিবার ও তাদের সুরুচিপূর্ণ ব্যবহার, যার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ অধিকতর পরিচিত ছিলেন। যাই হোক, রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট চরিত্রগুলি কিন্তু সমাজের বাইরে ছিল না। সমাজের নানা সমস্যা ছাড়াও মানুষের মনে যে জটিলতর সমস্যা থাকতে পারে, এ চিন্তা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে ছড়িয়ে থাকলেও, সেই ব্যক্তিগত

সমস্যা যে সমাজকে অনেকখানি অতিক্রম করতে পারে, রবীন্দ্রনাথের আগে তা এভাবে ব্যক্ত হয়ে ওঠে নি।

রবীন্দ্রনাথ মানুষের অন্তর্লোককে প্রাধান্য দিলেন সাহিত্যে। তাঁর হাতে উপন্যাস ক্রমশঃ সমাজ প্রধান থেকে ব্যক্তিপ্রধান হয়ে পড়ল। মোটকথা সেই সময়কার উপন্যাসে এবং গল্পে ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক যেমন বর্ণিত হয়েছে তেমনি ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক ও সংঘর্ষও ব্যক্ত হয়েছে। আবার ব্যক্তি যেখানে তার নিজের সঙ্গে সতত লড়াই করে চলেছে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের মধ্যে সে পরিচয়ও রয়েছে। অর্থাৎ রবীন্দ্র কথাসাহিত্যের ভিতর কুশীলবদের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণও এসে পড়েছে। কিন্তু এই মনস্তত্ত্ব আধুনিক জীবনের ক্লান্ত ভারবাহী আসক্তির প্রকাশ নয় বা একক নিঃসঙ্গ জীবনের দুঃখবাদী মানসিকতার অভিব্যক্তিও নয়। যে সব চরিত্র কোন একটি বিশেষ চিন্তা বা নির্দিষ্ট ইচ্ছার সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকতে পারে না সেই বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রকাশও রবীন্দ্র-নাথের নায়ক-নায়িকাদের মনস্তত্ত্বের মধ্যে অনুপস্থিত নয়। এই পর্বে এসে আমরা দেখতে পেলাম যে, বাংলা কথাসাহিত্যে পর্যায়ক্রমে সমাজ, চরিত্র ও মনস্তত্ত্ব স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

রবীন্দ্রনাথের ঔপনিষদিক আনন্দবাদ এবং শরৎচন্দ্রের হিন্দু আদর্শবাদ বস্তুনিষ্ঠা নরেশচন্দ্রকে প্রভাবিত করে নি বরং তাকে ভিন্নতর পথে পরিচালিত করেছিল। সাহিত্যের আসরে নেমেই তিনি তাই বিশেষ কয়েকটি দিকে পাঠককে সচেতন করে দেওয়া কর্তব্য বলে মনে করলেন। যেমন, সমাজব্যবস্থার সঙ্গেই এসে পড়ে অর্থনীতি কারণ সমাজ অর্থনৈতিক ভারসাম্য হারালেই দেখা দেয় কুৎসিৎ ব্যভিচার, শোষণ ও বিকৃতি। এ সবই আমাদের অশিক্ষা ও সমাজ ব্যবস্থার নষ্ট ফল, যেদিকে সাহিত্য এতদিন মুখ ফিরিয়ে ছিল। নরেশচন্দ্র সচেতনভাবে এই দিকটিকে সাহিত্যে নিয়ে এলেন। সমাজবিজ্ঞানী সুলভ তাঁর এই প্রয়াস যে তদানীন্তন কথাসাহিত্যে একটি নতুন সূত্র, একথা অস্বীকার করা উচিত হবে না।

নরেশচন্দ্রের পক্ষে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া সহজ হয়ে উঠেছিল কতকগুলি বাস্তব কারণে। তিনি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম ডিগ্রীধারী এবং গুরুত্বপূর্ণ পেশার সঙ্গে যুক্ত। তাঁর আর্থিক অবস্থা মোটামুটি সচ্ছল ছিল। তিনি পেশাদার লেখক ছিলেন না, তাই তাকে পাঠকদের মনোরঞ্জনের সহজ চেষ্টা করতে হয়নি। জনপ্রিয়তা লাভ করা ও হারানোর ব্যাপারে তিনি ছিলেন প্রায় নিরাসক্ত অর্থাৎ তিনি অর্থ উপার্জন বা পাঠকের মনোরঞ্জনের দিকে তাকিয়ে সাহিত্য রচনা করেন নি। তিনি লিখেছেন মনের তাগিদে—যার পেছনে ছিল সমসাময়িক মানুষ ও সমাজ সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিজস্ব কিছু বক্তব্য জনসাধারণের কাছে তুলে ধরার একটা প্রয়াস। উপরোক্ত কারণে সাহিত্যের আসরে নতুন পদক্ষেপ নিতে তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধাগ্রস্ত হননি—একক অভিযান চালিয়ে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে

আগামী দিনের দুঃসাহসিক লেখকদের জন্য নতুন ও পাকা সড়ক নির্মাণের কাজে ছিলেন আত্মনিবেদিত।

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, সে সময় তাঁর সহপাঠী ও সমসাময়িকদের মধ্যে ইউরোপীয় সাহিত্য পাঠের প্রবণতা ছিল। নরেশচন্দ্র নিজেও ছিলেন ইউরোপীয় সাহিত্যের উৎসাহী পাঠক। পাশ্চাত্য সাহিত্যের পরিধি ও বৈচিত্র্য, তথ্য ও তত্ত্বের প্রয়োগ, মুক্ত স্বচ্ছন্দ গতি এবং গতানুগতিকতা বর্জনের প্রয়াস তাঁকে আকৃষ্ট ও অনুপ্রাণিত করেছিল। তদানীন্তন ইউরোপীয় সাহিত্য বাংলা সাহিত্যকে তখনও পর্যন্ত সেভাবে স্পর্শ করেনি এবং সে-সময় ইউরোপীয় সাহিত্যপাঠ এদেশে তেমন ব্যাপকতাও লাভ করেনি।

দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালেই এদেশে জীবনবোধের আশ্চর্যরকম পরিবর্তন ঘটে যায়। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক জটিলতর রূপ নেয়। সততা, বিশ্বাস কার্য কারণের নিক্তিতে নির্ধারিত হতে থাকে। মানুষের দেহ ও মনের তৃষ্ণা নিয়ে নতুনভাবে চিন্তার সূত্রপাত ঘটে। এর স্পষ্ট দুটি কারণ—এক, যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর শিল্প সমৃদ্ধির ফল হিসাবে শিল্প ও যান্ত্রিক সভ্যতার প্রসার এবং দুই, মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞানের নতুন দিগন্ত সিগমণ্ড ফ্রয়েড (১৮৫৬-১৯৩৯) ও হ্যাভলক এলিস (১৮৫৯-১৯৩৯) এর মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা। এছাড়া সে সময়ের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল রুশ বিপ্লব (১৯১৭-১৯২৩)।

মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞানের এই নতুন আবিষ্কারের স্থূল বৈশিষ্ট্য এই যে, এর সাহায্যে মানুষের প্রবৃত্তির জান্তব দিকটি একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার ভিত্তিতে প্রকাশিত হলো। মানবমনের সচেতন প্রকাশের নেপথ্যে অবচেতনের কতগুলো স্তর কাজ করে তার রূপান্তর ঘটায়। সভ্যতা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে মানুষের মনের মূল ইচ্ছা অনিচ্ছা স্তিমিত হয়ে অন্যপথ ধরে এবং তৎসত্ত্বেও যেটুকু প্রকাশিত হয়ে পড়ে তা সম্পূর্ণ অন্য বস্তু। যেমন প্রেম উৎপত্তির কেন্দ্রবিন্দুটি যাই হোক, প্রেমের পবিত্রতা ও সৌন্দর্য মাহাত্ম্যই কীর্তিত হয়, কেননা প্রেমিক-প্রেমিকা হাসি গান কথা কবিতার মধ্য দিয়ে একটা প্রস্তুতির পর্ব অতিক্রম করে দৈহিক সম্পর্কে এসে দাঁড়ায় এবং তার পরেও লালন করে একটা স্বতন্ত্র অনুভূতি। সম্ভোগকারী আর প্রেমিকের প্রভেদ এখানেই। একজন জোর করে তার ইচ্ছাকে চরিতার্থ করে, অন্যজন ইচ্ছাকে চরিতার্থ করার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করে নেয়। এই দ্বিতীয়টির মধ্যেই সংযম, সৌন্দর্য ও স্বাভাবিকতা বর্তমান। একটিতে তাৎক্ষণিকতা, স্থূল প্রয়োজন মেটানোর তাগিদ, অন্যটিতে অনন্তকালের আনন্দ ও সৃষ্টির অভীপ্সা।

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের উপন্যাসের অনেক চরিত্রই বিচিত্র কামনায় তাড়িত। তাদের আচরণের রূঢ় বাস্তবতার কাছে শিক্ষা সংস্কৃতি যেন অনেকটা নির্বাক বা অপসৃত। যদিও একথা খুবই সত্য যে বাস্তবতা শুধুমাত্র নরনারীর দৈহিক সম্পর্কের মধ্যেই আবদ্ধ নয়, অথচ নারীপুরুষের মধ্যে যে রহস্যময় আকর্ষণ অনন্তকাল থেকে অনুভূত

হচ্ছে তাও অনস্বীকার্য। কেননা এর অস্তিত্ব প্রকৃতি আশ্রিত এবং চিরকালীন সত্য। কিন্তু এই অনুভূতি সৃষ্টির কারণ এবং কোন্ অনুভূতিটুকু মানবমনে এ ব্যাপারে কমবেশী ক্রিয়াশীল তা এখনও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় পরিমাপ করা সম্ভব হয়নি। মানবমনের এই অনন্ত রহস্যময়তাও উপন্যাসের উপজীব্য হয়ে উঠলো। উপন্যাস, কাব্য-সাহিত্য শাখায় আধুনিক হলেও।

সাহিত্যে মনস্তত্ত্বের অনুপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনের অবদমিত ইচ্ছার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া উপন্যাসে এসে পড়ল। এটা খুবই সত্যি যে ইচ্ছা অনেকটা নদীর মতই গতিশীল। নদীর স্বাভাবিক প্রবহমানতাকে বাধা দিলে প্লাবন হয়, তেমনি সহজ ইচ্ছা যখন বাধাপ্রাপ্ত হয়—যেখানে প্রাকৃতিক কারণে অফুরন্ত প্রাণশক্তির প্রবহমানতা বর্তমান, তা ভীষণ প্লাবনের রূপ নিয়ে ধ্বংসের উন্মাদনায় প্রকট হয়ে ওঠে, পাপের পিছল পথে, বিকৃত কামনার বশবর্তী হয়ে অন্ধকারের অতলে তলিয়ে যায়। অথচ সমাজের নানা বিধিনিষেধ থাকলেও মানুষের মনের অবদমিত ইচ্ছাকে কোন সুস্থপথে প্রবাহিত করার মতো যথেষ্ট নির্দেশ নেই, শিক্ষার ব্যবস্থা নেই এবং উপায়ও নেই। তাই এই সামাজিক বিধিনিষেধের বলি হয়ে ভুক্তভোগীর দল সমাজকে বিদ্রূপ করে, সংসারকে ছারখার করে দেয়। আবার অপরাধবোধে তারাই সেই দাহ ও দহনে জ্বলেপুড়ে মরে বা অনুশোচনায় উন্মাদ হয়ে বেঁচে থাকে। এই অসুস্থ মানসিকতা অভিশাপ, কেননা, নারী পুরুষ তাদের পূর্বার্জিত সংস্কার ও ন্যায়ের আদর্শকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে পারে না আবার প্রতিবেশ তাদের সেই সংস্কার লঙ্ঘন করতে বাধ্যও করে। এই সব দ্বিধাবিভক্ত মন পাপ পুণ্য পেরিয়ে সুস্থ থাকতে পারে না, হয়ে ওঠে অস্বাভাবিক চরিত্র। নরেশচন্দ্রের উপন্যাসে এই সব কামনা বাসনা তাড়িত চরিত্র পরিণতিতে স্বাভাবিকভাবেই তাই উত্তরণ খুঁজে পায়নি, তারা অপরাধের উত্তেজনার মধ্যে তৃপ্তি খুঁজেছে অথবা উন্মাদনায় স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে পড়েছে, বাস্তবের সংঘাত তাদের পক্ষাঘাতগ্রস্ত মনের অসাড়তা দূর করতে পারেনি।

আমাদের সমাজে নরনারীর স্বাভাবিক সম্পর্কের ব্যাপারে যে প্রচণ্ড বাধা, তার ইতিহাস ও পরিণতি সে যুগের বাংলা উপন্যাসের একটা প্রধান উপজীব্য বিষয় ছিল। নরেশচন্দ্রও এই বিষয় নির্বাচনের ব্যাপারে এর থেকে খুব বেশী দূরে যেতে পারেন নি। তবু এই সব সামাজিক বাধা অতিক্রম করার চেষ্টা করেছে তার সৃষ্ট নায়ক নায়িকারাই সব চাইতে বেশী। তাঁর রচিত অনেক নারীচরিত্রই অবকাশ পাওয়া মাত্র স্বচ্ছন্দবিহারিণী আর পুরুষচরিত্র সমাজকে অস্বীকার করে নৈতিক দৃষ্টিতে হয়ে উঠেছে উচ্ছৃঙ্খল। নরেশচন্দ্রের উপন্যাসে বর্ণিত সমাজ টলমল অবস্থায় ধ্বসে পড়ার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে দিন গুনছে। কিন্তু সমাজের সুস্থতা শুধু নারীপুরুষের সম্পর্ক বা বাধা নিষেধের উপর নির্ভর করে না। তাঁর বিশ্বাস ছিল এই সব অসঙ্গতি দূর হয়ে যাবে, যথার্থ শিক্ষার প্রভাবে সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই। তাঁর মতে সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন মানে অর্থনীতির মূল কাঠামোর পরিবর্তন। যে সমাজে জমিদারী প্রথা, প্রজাপীড়ন, অত্যাচার

অবিচার দীর্ঘদিন বাসা বেঁধে আছে, যে সমাজে কুশাসনের ফলে প্রতিটি রন্ধ্রে, দুর্নীতি পরিব্যাপ্ত, সেই সমাজ সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে হবে। নরেশচন্দ্র বুঝেছিলেন যে, শুধু অকালবৈধব্য আর ব্রাহ্মণ শূদ্র কলহই আমাদের সামাজিক সমস্যার কারণ নয়, এই সব সমস্যা সমাজব্যবস্থার কুফল মাত্র। আসলে এর মূল প্রোথিত অনেক গভীরে।

মানবমনের রহস্যময়তাও নরেশচন্দ্রকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বিচিত্র গতিবিধি ও তাদের অদ্ভুত আচরণের কার্যকারণ সম্পর্কে বিশ্লেষণে তিনি ছিলেন পরম উৎসুক। এই সব জীবনের উপর অনুসন্ধানী তির্যক আলো ফেলে তিনি তাদের স্বরূপ সন্ধানের চেষ্টা করেছেন। নরেশচন্দ্রের অনেক চরিত্রই মনে-প্রাণে রহস্যময়। এরা প্রত্যেকেই অপরের কাছে মুখোস এঁটে, নিজেদের মধ্যে কানামাছি খেলছে, অর্থাৎ এই চরিত্রগুলি দুরন্ত গতিতে পরস্পর পরস্পরের সান্নিধ্য কামনা করছে কিন্তু পাচ্ছে না। স্বাভাবিক পথে তাদের আশা মেটেনি তাই তারা বিচিত্র প্রক্রিয়ায় জীবনকে নতুন করে আস্বাদ করার অবকাশ খুঁজেছে। কিন্তু এভাবে বেঁচে থাকার কোন সার্থকতা নেই, প্রাণ নেই, উত্তরণ নেই, একটা স্থাবর ঊষর মরুবৃত্তের চারপাশে নিষ্প্রাণ যান্ত্রিক মূর্তির মত আছে শুধু অবিরাম আবর্তন।

বাংলা উপন্যাসে সমাজের অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিষয়টি অনেকটা স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়েছিল। কিন্তু এই সমস্যা মানুষকে যে কোন অতলে নিয়ে যেতে পারে তা সব চাইতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল নরেশচন্দ্রের কথাসাহিত্যে। তাঁর সাহিত্যে আমরা দেখতে পেয়েছি যে একজন অর্থের প্রাচুর্য দিয়ে ফূর্তি ক্রয় করে আর অন্যজন ক্ষুধার তাড়নায় বাজারে এসে ফূর্তির উপকরণ হিসাবে পসরা সাজায়। একজনের পক্ষে যেটা আসক্তি-পূর্ণ বিলাসিতা অন্যজনের পক্ষে সেটা নিরাসক্ত পেশা মাত্র। যারা দরিদ্র, নিঃস্ব, সমাজের কাছে মানুষ হিসাবে সামান্য শ্রদ্ধাটুকুও তারা পায় না [রাজগী দ্রষ্টব্য] আবার ধনীগৃহের খেয়ালী ছেলে বন্ধুত্বের বিলাসিতায় শ্রমিকবন্ধুর হাতে গুচ্ছের টাকা তুলে দিতে পারে কিন্তু তাদের আন্দোলনের শরিক হতে পারে না, নিজের সহকর্মীকেও সমান মর্যাদা-সম্পন্ন ভাবতে পারে না, প্রতিটি ক্ষেত্রেই নিজেকে স্বতন্ত্র মনে করে। অবশেষে সখের শ্রমিকগিরি ত্যাগ করে ধনী পিতার গৃহে ফিরে যায়—বাস্তব অভিজ্ঞতার কণ্টকাঘাত আসলে তাকে ঘরে ফিরে যেতে বাধ্য করে, যেহেতু সমাজে নানা বৈষম্যের ফলে বহুতর শ্রেণীচরিত্র বর্তমান ['খেয়ালের খেসারত' দ্রষ্টব্য]।

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের কথা সাহিত্যে খুব বেশী পরিমাণে এই সমাজতাত্ত্বিক আলোচনা আছে কিন্তু তবু তাঁকে এই বলে অভিযুক্ত করা হয়েছিল, যে, তিনিই বাংলাসাহিত্যে প্রগতি ও বাস্তবতার নামে নরনারীর জৈব সম্পর্কের বর্ণনা করেছেন। কিন্তু বলাই বাহুল্য আমরা এ অভিযোগ সত্য বলে স্বীকার করি না। উপন্যাসে নরনারীর জৈব সম্পর্ক তিনি যতটুকু এনেছেন, তাঁর বক্তব্য প্রতিষ্ঠার জন্য তা ছিল অপরিহার্য।

প্রথম সার্থক সামাজিক উপন্যাসের সৃষ্টি বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে। বঙ্কিমচন্দ্রের পর রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলা কথাসাহিত্য দিগন্তপ্রসারী মহিমায় বিকশিত হয়ে উঠেছিল।

বস্তুতঃ বাংলা কথাসাহিত্যও সেযুগেই কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণ করেছিল। কথা-সাহিত্যের এই বিচিত্র বিকাশ পর্বে আরেকজনের দানও অনস্বীকার্য—তিনি হলেন শরৎচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের পাত্রপাত্রী প্রায়ই ধনী ও উচ্চবিত্ত, বাংলা উপন্যাসে শরৎচন্দ্র নিয়ে এলেন মধ্যবিত্ত সমাজ—তাদের জীবনের সুখ-দুঃখ ব্যথা বেদনার ইতিহাস ও সমস্যা। মধ্যবিত্ত সমাজের কন্যাদায় সমস্যা, বালবিধবা সমস্যা, একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙ্গনের সমস্যা যেমন এল তেমনি আবার নিম্নবিত্ত অতি সাধারণ মানুষও তাদের নানান সমস্যা নিয়ে এল সাহিত্যে। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে বিত্ত নির্বিশেষে মানুষ এসে দেখা দিয়েছে, সেখানে দরজা খোলা ছিল সবার জন্যই। উপন্যাসে যেমন 'চোখের বালি' [১৯০২], 'নৌকাডুবি' [১৯০৬], 'গোরা' [১৯১০], 'চতুরঙ্গ' [১৯১৬], 'ঘরে বাইরে' [১৯১৬] বা 'যোগাযোগ' [১৯২৯], এ শুধুমাত্র উচ্চবিত্ত ও আলোকপ্রাপ্ত অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি-চরিত্র পাওয়া যায় তেমনি আবার ছোটগল্পে এল অতি সাধারণ মানুষ, রাইচরণ, রামকানাই বা ছিদাম, কলকাতাবাসী কেরানীবাবুও এল কাবুলিওয়ালা গল্পে। যাই হোক, মধ্যবিত্ত মানুষের হৃদয় ও চিত্তবৃত্তি প্রকাশ করে শরৎচন্দ্র দুটি জিনিস লাভ করলেন—এক : বাংলা উপন্যাস পাঠকদের কাছে অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা এবং দুই : রবীন্দ্র-ভক্ত'দের তুষ্টি ও সহানুভূতি লাভ। কেননা সে যুগে বিদগ্ধ পাঠককুল মাত্রই ছিল রবীন্দ্র-ভক্ত এবং তাদের মতামতের উপর সে-যুগের সাহিত্যমূল্য অনেকাংশে নির্ভরশীল ছিল। শরৎচন্দ্র সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন সমস্যা কথাসাহিত্যের দরবারে হাজির করতে সমর্থ হলেন বটে কিন্তু জাতবিচারে শরৎ-সাহিত্য রবীন্দ্র-সাহিত্যের খুব বেশী ব্যতিক্রম হল না—কিছুটা সহজ ও সুখপাঠ্য হয়ে উঠলো মাত্র। আর আমরা লক্ষ্য করলাম যে, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র তাঁদের কালের পারম্পর্য রক্ষা করে প্রায় এইভাবে বাংলা কথাসাহিত্য ভাণ্ডার ভরে তুলেছিলেন।

অগ্রণী সাহিত্য জীবনের মতই সচল। পাশ্চাত্য সাহিত্যও তাই কয়েকটি নির্দিষ্ট নীতি আদর্শ বা বিষয়ের উপর দাঁড়িয়ে নেই। সাহিত্যের অবিরাম প্রবাহের মধ্যে চলেছে গ্রহণ বর্জন ও নিত্য-নতুনের সৃষ্টি। বাংলা সাহিত্যও তার এই নবমুকুলিত যৌবনে অকাল স্থবিরতা নিয়ে নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি। বাংলা কথাসাহিত্যের প্রবাহও তখন অনেক পথ পরিক্রমা শেষে প্রায় মোহনায় এসে শতধারায় বিভক্ত হতে চলেছে তার দেহে ও মনে পরিবর্তনের চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কথাসাহিত্যে তখন পাওয়া যাচ্ছে 'চতুরঙ্গ' [১৯১৬], 'ঘরে বাইরে' [১৯১৬], 'চরিত্রহীন' [১৯১৭], 'দেবদাস' [১৯১৭], 'শ্রীকান্ত' ১ম ও ২য় পর্ব [১৯১৭/১৮] এবং 'গৃহদাহ' [১৯১৯]-এর মত উপন্যাস। পাঠকসমাজ রোমান্টিক সাহিত্যকে স্বীকৃতি ও মর্যাদা দেওয়ার পরও বাস্তববাদী সাহিত্যের জন্য উৎসুক ও সচেতন হয়ে উঠলো আর বাংলা কথা-সাহিত্যে ধীরে ধীরে বাস্তবতার স্পর্শ লাগলো কাহিনী ও ভঙ্গী উভয় দিকেই। ১৯১৯ থেকে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই বাংলা সাহিত্যে নব্য লেখককুল যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখা দিলেন, পাঠক সমাজ সে সম্পর্কে উদাসীন থাকতে পারলেন না।

রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র যখন তাঁদের মহিমান্বিত খ্যাতিতে প্রতিষ্ঠিত, প্রায় সেই সময়েই নতুনদের জয়যাত্রা শুরু হলো। এই নবাগতদের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল আরো পরে। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল বিশ্বভ্রাতৃত্ব, হিউম্যানিজম, পাশ্চাত্য রেঁনেসাঁস ও য়ুরোপীয় সাহিত্যের রোমান্টিসিজিম-এ তাই পরিচ্ছন্ন শিল্পমণ্ডিত সংযম এবং দর্শন ছিল তার সাহিত্যের পশ্চাৎপট। নতুনদের দৃষ্টি ছিল বাস্তবতার দিকে—ফরাসী, জার্মান, স্কানডিনেভিয়ান, রুশ ও ইংরাজী সাহিত্যের দিকে। যুদ্ধের ধোঁয়ায় ধূসরিত মানব-জীবনের মূল্যবোধের পরিবর্তনকে তাঁরা সাহিত্যে পরিবেশনে প্রয়াসী হলেন। দারিদ্র্য, অনাহার, ব্যভিচার আর ধ্বংসের রূঢ়তা ধরা পড়ল তাঁদের চোখে। তাঁদের অনুপ্রেরণা জোগাল ইবসেন [১৮২৮-১৯০৬], ফ্লবেয়ার [১৮২১-১৮৮০], জোলা [১৮৪০-১৯০২], মোঁপাসা [১৮৫০-১৮৯৩], ডস্টয়ভস্কি [১৮২১-১৮৮১], টলস্টয়, [১৮২৮-১৯১০] মেটারলিংক [১৮৬২-১৯৪৯], গোর্কি [১৮৬৮-১৯৩৬] এবং এলিয়ট [১৮৮৮ ১৯৬৫] রচিত সাহিত্য সম্ভার। স্বাভাবিকভাবেই এই নতুন লেখকগোষ্ঠীর ঝোঁক ছিল মানুষের জৈবিক আকৃতি ও ব্যর্থতার দিকে, জীবন ও সমাজের অন্য এক পরিমণ্ডলের দিকে। মোটকথা সাহিত্যের পথে একটা স্পষ্ট বাঁক দেখা দিল।

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এই নতুন পথে আধুনিকতা ও বাস্তবতা নিয়ে সাহিত্যের আসরে উপস্থিত হলেন। মধ্যবিত্ত দৈনন্দিন জীবনের ঘাত প্রতিঘাতের হিসাব বা মানসিক জটিলতার বিশ্লেষণ ছাড়াও এমন কতগুলি নিষিদ্ধ বিষয়ের দিকে তিনি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন যেদিকে তৎকালীন সাহিত্য—সেই অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়েও, প্রায় নীরব ছিল। নরেশচন্দ্র সাহিত্যে নিয়ে এলেন নারীপুরুষের জটিল জীবন, সমাজের বিচিত্র দ্বন্দ্ব। পতিতাবৃত্তি, পাশবিকতা এবং জৈব কামনা বাসনার বিচিত্র তরঙ্গভঙ্গী অগ্রাধিকার পেল তাঁর রচনায়। রূঢ় বাস্তবের চিত্র তুলে ধরলেন তিনি—পুত্রের চোখে ধরা পড়ল জননীর প্রবৃত্তি ও আসক্তি, নারী অস্বীকার করলো তার তথাকথিত পতি-দেবতাকে, মুক্তির সন্ধানের জন্য নতুন পথে পা বাড়ালো সে। শরৎ সাহিত্যে নারী মাত্রই সতীত্ব, মমতা, স্নেহশীলতা, ধৈর্য ও শুচিতার প্রতীক কিন্তু সমাজের বাস্তব চিত্র কি তাই? সামান্য গ্রাম্য নিন্দা, কলহ, স্বার্থপরতা বা পঙ্কিল পথের প্ররোচনার মধ্যেই এর যথার্থ রূপ প্রকাশিত হয় না, এর চাইতে অনেক সাংঘাতিক অপরাধপ্রবণতাও মানুষের আছে, আছে অনেক সহজাত জৈবিকবৃত্তি—যা মানুষ গোপনে অন্তরের মধ্যে লালন করে। নরেশচন্দ্র সেই সব প্রবৃত্তির কথাও সাহিত্যে তুলে ধরলেন। অর্থাৎ সাহিত্যের বিষয় শুধুমাত্র শিব ও সুন্দরের ঘেরাটোপেই আবদ্ধ রইল না, রূঢ় নিষ্ঠুর বাস্তব সত্যেরও প্রতিফলন ঘটলো সেখানে।

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে বিচিত্র দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিলেও তিনি মানুষের ও সমাজের মসীলিপ্ত দিকটিকে প্রাধান্য দেননি। মানুষের অর্থনৈতিক অসাম্য, ব্যভিচার বা কুৎসিত বিকারগ্রস্ত চরিত্রকে তিনি তার সাহিত্যে স্থান দেননি বললেই হয়। এর কারণ, সৌন্দর্য সচেতনতা ও শুচিতার প্রতি তাঁর আত্যন্তিক প্রীতি। তাঁর চিত্রশিল্পে

অবচেতনলোকের অদ্ভুত আলো-আঁধারের ছায়াপাত অবশ্য ঘটেছে। চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে তাঁর কোনো প্রথাগত শিক্ষা ছিল না, সাহিত্যের আদর্শ থেকে তা ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সম্পূর্ণ এক অন্য জগৎ। এটা লক্ষণীয় যে, চিত্রশিল্পে রবীন্দ্রনাথ হাত দেন যখন তিনি প্রৌঢ়ত্বের সীমা পার হয়ে গেছেন, বিশ্বখ্যাতির এক সুনির্দিষ্ট আসনে তিনি তখন প্রতিষ্ঠিত। ত্রিশ থেকে চল্লিশ বছরের মধ্যেই কবিতা ও ছোটগল্পে তাঁর প্রতিভার বিকাশ সম্ভবপর হয়েছিল। একদিকে মানসী, চিত্রা, চৈতালী, সোনারতরী অন্যদিকে ছিন্নপত্র ও ছোটগল্পের উৎকৃষ্ট সম্ভার—সেখানে তিনি সচেতন শিল্পী, কিন্তু পরিণত জীবনে পৌঁছে তাঁকে যে চিত্রশিল্পের উন্মাদনায় পেয়ে বসলো সেখানে তিনি আর সচেতন শিল্পী থাকতে পারলেন না। কাব্যে, সঙ্গীতে, কথাসাহিত্যে তিনি যা ব্যক্ত করতে পারেন নি সেই অব্যক্তের প্রকাশ ঘটেছে তাঁর চিত্রশিল্পের মাধ্যমে।

কবির চিত্রশিল্পের বিষয় ও জগৎ শুধুমাত্র শিব ও সুন্দরের মধ্যেই আবদ্ধ রইল না। মানবমনের জটিল অন্ধকার প্রকাশ পেল তাঁর চিত্রশিল্পে। বিশ্বের দরবারে নবরূপে প্রতিষ্ঠা পেলেন তিনি চিত্রশিল্পী হিসাবে—চিত্রশিল্পের জগতে সৌন্দর্য ও শুচিতার পূজারী না হয়েও। তাতে একথাই প্রমাণ হলো—শিল্প শুধু সুন্দর নিয়েই নয়, অসুন্দরও শিল্প হতে পারে, শিল্প সৃষ্টির উপাদানরূপে ভালো মন্দ দুটোই সমমূল্যবান।

নরেশচন্দ্রের কয়েকটি গল্প ও উপন্যাস প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙালী পাঠকসমাজ তাঁকে বাস্তববাদী সাহিত্যিক হিসাবে মেনে নিয়েছিলেন। কন্টিনেণ্টাল সাহিত্য ও বাংলা সাহিত্যের পঠনীয় গ্রন্থের সঙ্গে পরিচিত থাকলেও নরেশচন্দ্রের বাস্তব চেতনার মূলে ছিল তাঁর কতকগুলি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। কোনো একজন বা বিশেষ কয়েকজন লেখকের প্রভাব তাঁর সাহিত্যের উপর নির্দিষ্টভাবে পড়েনি। তবে রবীন্দ্রনাথের রচনা যে তাঁকে বিশেষভাবে সাহিত্য রচনায় অনুপ্রাণিত করেছিল সেকথা অস্বীকার করা যায় না, যদিও নরেশচন্দ্র উপাদান সংগ্রহের ব্যাপারে বিচিত্র রকমের পারিপার্শ্বিকতার আনুকূল্য লাভ করার দরুণ বিষয় ও কাহিনী নির্বাচনে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে নিঃসন্দেহে অনেক বেশী মূল্য দিয়েছিলেন।

বাল্যকালে নরেশচন্দ্র পিতার সঙ্গে অনেক জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং বিভিন্ন বিচিত্র প্রকৃতির মানুষের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। বাল্যকালের সেই বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টির কাছে এমন অনেক ঘটনা উদ্ঘাটিত হয়েছিল পরবর্তী জীবনে যেগুলি সাহিত্য সৃষ্টির রসদ হিসাবে তাকে বহু পরিমাণে সাহায্য করেছে। তিনি ছিলেন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের বিশিষ্ট ছাত্রনেতা। ছাত্র ও যুবসমাজের মানসিকতা, আদর্শ, ব্যক্তিত্ব ও আচরণ তিনি খুব কাছ থেকে লক্ষ্য করার সুযোগ পেয়েছিলেন। এই অভিজ্ঞতার ফলে তাঁর উপন্যাসে চিত্রিত যুবসমাজ অনেক বেশী বাস্তবধর্মী। সমাজসেবামূলক কাজের সঙ্গে আজীবন জড়িত থাকায় সমাজের অতি সাধারণ মানুষ, বস্তিবাসী, শ্রমিক, মজুর প্রভৃতির সংসর্গ লাভেও তিনি বঞ্চিত ছিলেন না। বস্তিবাসী কিংবা নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের দারিদ্র্যের বর্ণনায় তাঁর সাহিত্য তাই মুখর। আবার, অধ্যাপনার সঙ্গে যুক্ত

থাকায় বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের পরিবেশে ছাত্র, অধ্যাপক ও সাহিত্যসেবীদের জীবনধারা, তাঁদের জীবনের সংগতি অসংগতি ইত্যাদিও তাঁর পর্যবেক্ষণ থেকে বাদ যায় নি। সমাজ ও মানবজীবনের বিচিত্র গতিবিধি, চক্রান্ত, প্রতারণা, অর্থের ও বৈভবের পরিপ্রেক্ষিতে পিতা ও সন্তান, মাতা ও পুত্রের, স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্কের জটিলতা, বিচ্ছিন্নতা, জিঘাংসা এবং আরও বহু বিচিত্র ও চমকপ্রদ ঘটনার সঙ্গে নরেশচন্দ্রর পরিচয় হয়েছিল তাঁর দীর্ঘ ওকালতি জীবনে আদালতের প্রকোষ্ঠে ও সাক্ষী মক্কেলদের জবানবন্দীর মাধ্যমে। সমাজ ও জীবনের এই বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও কুটিল গতিপ্রকৃতি তাঁর সাহিত্য প্রয়াসকে অনুপ্রাণিত করেছিল, অর্থাৎ মানবজীবনের এই বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রবাহই তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির উৎস ও প্রেরণা। তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণী শক্তিই ঔপন্যাসিক নরেশচন্দ্রের অমোঘ অস্ত্র।

নরেশচন্দ্র ছিলেন দর্শনের ছাত্র। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র নিয়ে তিনি দীর্ঘকাল গবেষণার কাজে নিযুক্ত ছিলেন এবং পাশ্চাত্য দর্শনের ধারা ও মতবাদও তিনি গভীর অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করেছিলেন। কার্ল মার্কসের অর্থনৈতিক দর্শন তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তনের সঙ্গে সমাজ ব্যবস্থা ও জনসাধারণের জীবনযাত্রার সম্পর্ক তিনি জানতেন। তিনি তাঁর বহু উপন্যাসে সমাজ ও মানুষকে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচারে প্রয়াসী হয়েছেন। আবার, ভারতীয় দর্শনের যুক্তিবিজ্ঞানের দিকটিও তিনি দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করেছিলেন। অর্থাৎ সাহিত্যের মাধ্যমে তিনি ইউরোপীয় বস্তুবাদ ও ভারতীয় যুক্তিবাদ উভয়কেই সমাজের কষ্টিপাথরে নরিখ করে নিতে সচেষ্ট ছিলেন, তাই তাঁর বিভিন্ন কাহিনীতে এই দুটি দৃষ্টিভঙ্গী বা তত্ত্বকেই পৃথক কোণ থেকে প্রতিফলিত করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। লেখকের এই দৃষ্টিভঙ্গী সর্বাংশে আধুনিক, যদিও তাঁর এই প্রযত্ন অনেক ক্ষেত্রেই পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর্যায়ে রয়ে গেছে এবং কোনো নির্দিষ্ট উপসংহারে পৌঁছয়নি তবু এই প্রচেষ্টাই পরবর্তী সাহিত্যিকদের সামনে একটা নতুন পথ খুলে দিয়েছে।

প্রথম মহাযুদ্ধ, সুদূর য়ুরোপে ঘটলেও তার প্রতিফল শুধু য়ুরোপ মহাদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল না। এই যুদ্ধের ফলে পৃথিবীর সর্বত্রই একটা পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। ভয়, অর্থনৈতিক অসাম্য ও সঙ্কট, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ভারতবাসীদেরও আচ্ছন্ন করে তুলেছিল। এই সময় একদিকে ভারতে চলছিল স্বরাজের আন্দোলন অন্যদিকে ভারতবাসী পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিল ইউরোপের মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞানের নতুন আবিষ্কারের সঙ্গে। নরেশচন্দ্র মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞানের নতুন আবিষ্কারকে সাহিত্যে গ্রহণ করলেন। মানবমনের সচেতন ও অবচেতন দুই অবস্থাই সাহিত্যে স্থান পেলো। বহিরঙ্গ জীবনের সুন্দর সাত্ত্বিক চেহারা যেমন বর্ণিত হলো, তেমনি অবচেতন মনের দুর্বলতা ও অসুস্থতাও স্থান লাভ করলো তাঁর সাহিত্যে। নরেশচন্দ্রের অংকিত অনেক চরিত্রই প্রচলিত সামাজিক দৃষ্টিতে স্বীকৃত নয়। তারা খুব পরিচিত জগতের নয়, তাদের আমরা পছন্দ করি না। তারা খারাপ, খেয়ালী। তারা সমাজের কালো দিকের প্রতিনিধি কিন্তু নরেশচন্দ্র

দেখিয়েছেন, মনের দিক থেকে সভ্য মানুষের সঙ্গে তাদের কোন বড় রকমের প্রভেদ নেই।

সে যুগের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পুত্র নরেশচন্দ্র বনেদী ও আভিজাত্যপূর্ণ পরিবেশে মানুষ হয়েছিলেন। ফলে সুযোগ পেয়েছিলেন সমাজের উঁচুতলার বাসিন্দাদের অন্দরমহলে তাঁর সজাগ সন্ধানী দৃষ্টি ফেলতে। উঁচুতলার সমাজের মেকী অহিমকার আড়ালে তাঁর চোখে ধরা পড়েছিল তাদের জীবনের অন্ধ সংস্কার, অসংগতি ও অন্তঃসারশূন্যতাও। এই অসংগতির জন্যই এ সমাজের কেউ কেউ পণ্ডিত হয়েও বাস্তববুদ্ধিরহিত. কেউ বা সাজসজ্জাবিলাসী কেউ বা বৈভব প্রদর্শনে ব্যস্ত। এদের মনেও অতৃপ্তি আছে, যন্ত্রণা আছে কিন্তু বিদ্রোহ নেই এই মেকী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। বিশ্বের কর্মচঞ্চল উদ্দীপনার মধ্যে এই সব মানুষ শুধু অলস ভোগ বিলাসের মধ্যেই বেঁচে থাকে। তারা সম্পদ উৎপাদন করতে জানে না, জানে শুধু ভোগ করতে ও অপচয় করতে। তাই সমাজে যা কিছু সংগঠনমূলক ও ফলপ্রসূ প্রয়াস তার সঙ্গে এদের কোনও প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই, অথচ সমাজের নির্দিষ্ট একটা উঁচু আসন এদের জন্য সব সময়ই আছে। কেউ কেউ অবশ্য এই নিয়মকে অস্বীকার করে এই আবর্তের বাইরে ছিটকে পড়ার চেষ্টা করে, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হতে পারে না। নরেশচন্দ্র এই শ্রেণীর চরিত্রেরও বাস্তবানুগ বর্ণনা করেছেন।

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের উপন্যাসের মধ্যে তথ্যের ও তত্ত্বের আধিক্য চোখে পড়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু তার কথাসাহিত্যে তথ্য এবং তত্ত্বের অবতারণা স্বতঃস্ফূর্ত। একথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে, সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে কল্পনার স্থান থাকলেও অলীকতার কোন স্থান নেই, বিশেষতঃ কথাসাহিত্যে। আর যেহেতু সাহিত্য কালের প্রভাবকে অতিক্রম করতে পারে না, তাই কালোপযোগী তত্ত্ব সাহিত্যে অনুপ্রবেশ করবেই। সাহিত্যিক যদিও কিছুটা দূরদ্রষ্টা ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনুমান করতে সক্ষম তবু তাকে সেই হিসাব কষতে হয় বর্তমানের গতিপ্রকৃতির উপরই নির্ভর করে। সাহিত্যের রূপরস বৈচিত্র্য স্বীকার করে নিয়েও একথা বলতে হয় যে যথার্থ সাহিত্যিক মাত্রেই মূলত তাত্ত্বিক, তাৎপর্য বিচারে দার্শনিক। সাহিত্যিক তাঁর কালের অবিসংবাদিত আবিষ্কারের দ্বারা প্রভাবিত বা অনুপ্রাণিত না হয়ে পারেন না। কোন কালের বিশেষত্বপূর্ণ আবিষ্কার বা ঘটনার তাৎপর্য কালকে স্পর্শ করবেই। বিজ্ঞানের যে কোন আবিষ্কারই বাস্তব ঘটনা আর কল্পনাপ্রধান গীতিসাহিত্য বস্তুনিরপেক্ষ হলেও হতে পারে কিন্তু কথাসাহিত্য এই বাস্তবকে অস্বীকার করতে পারে না। এমন কি কাব্যেও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ব্যবহার কবিত্বকে সব সময় ম্লান করতে পারেনি তার প্রমাণ শেলী, রবীন্দ্রনাথ, এলিয়ট। বস্তুতপক্ষে সাহিত্যের কোন বাঁধা বিষয় নেই। ব্যাপক অর্থে জীবনই সাহিত্যের বিষয়বস্তু। তবে সাহিত্য বিষয়বস্তুকে ব্যাখ্যা করে না, তাকে শিল্পরূপ দান করে। সমগ্র জীবনই কথা-সাহিত্যের উপাদান মাত্র, কাজেই তত্ত্ব এবং তথ্যও সাহিত্যের উপাদান হতে পারে।

তবে এই বিষয় নির্বাচন, তত্ত্ব ও তথ্যের প্রয়োগের মধ্যেই সাহিত্যিকের উদ্দেশ্য, রুচি ও অভিমত প্রকাশ পায়, আভাসিত হয় সাহিত্যিকের জীবনদর্শন।

নরেশচন্দ্রের সাহিত্যে বিচিত্র বিষয়বস্তু, ঘটনা ও অভিজ্ঞতা স্থান পেয়েছে। কোন একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব তিনি করেন নি। সমাজে যা কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি বা অসংগতি সেদিকেই তিনি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বাংলা সাহিত্যের আসরে অন্যান্য যারা এই দায়িত্বের কথা স্মরণে রেখে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, তাঁরা প্রায় সকলেই ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও হাস্যরসের সাহায্য নিয়েছেন কিন্তু নরেশচন্দ্র এ ব্যাপারে অনেক বেশী স্পষ্ট বক্তব্য রাখার পক্ষপাতী ছিলেন এবং সেইজন্যই তাঁর রচনা অনেক বেশী গভীর, গম্ভীর তথা বাস্তবধর্মী হয়ে উঠেছে।

শিল্পের জন্য শিল্প, এই আদর্শ নিয়ে যারা উপন্যাসকে বিশুদ্ধ, শিল্পের স্তরে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, তাঁরা কেউ কেউ কাব্যধর্মী উপন্যাস রচনা করেও আধুনিকতার চরম শিখরে উঠতে পেরেছেন হয়তো, কিন্তু আধুনিক বস্তুনিষ্ঠা নিয়ে জীবনের যথাযথ জীবন্ত চিত্র আঁকতে সচেষ্ট ছিলেন না। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ও অন্যান্য দু-একজন যখন এই নির্মম বাস্তবতাকে উপন্যাসে স্থান দিলেন, তখন বাংলা সাহিত্যের এই নির্দিষ্ট দিকটি আর অবহেলিত অবস্থায় পড়ে রইল না। রবীন্দ্রোত্তর কথাসাহিত্যে এই প্রবাহকেই অব্যাহত দেখি।

দুই : সাহিত্য

ইংরাজী সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস স্যামুয়েল রিচার্ডসনের 'পামেলা অর ভারচু রিওয়ার্ডেড' [১৭১৫]। দরদী, মধ্যবয়স্ক, ধর্মবিশ্বাসী এই মুদ্রক পরিচারিকাদের চিঠি লিখে দিতেন। সেই পরিচারিকা শ্রেণীর ঘটনা বৈচিত্রে ভরা জীবন, তাদের ধর্মবোধ ও বিশ্বাস ছিল 'পামেলা…'উপন্যাসের উপকরণ। দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত চিঠি-পত্রের ভাষাই ব্যবহার করা হয়েছিল সেই উপন্যাসে এবং সেই উপন্যাসের বক্তব্য ছিল ধর্ম, পুণ্য ও নৈতিক উৎকর্ষের জয়গান। রিচার্ডসন চিঠিপত্রের গদ্যই ব্যবহার করে-ছিলেন তার উপন্যাসে, গদ্যের বিকাশ নিয়ে তিনি কোনো অনুশীলন করেছিলেন কি না তা অনুমান করা সহজ নয়, কেননা সমসাময়িককালে ইংরাজী গদ্য বিশিষ্ট লেখকবৃন্দের হাতে একটি নির্দিষ্ট মানে পৌছে গিয়েছিল। ইংরাজী উপন্যাসের জন্মলগ্ন থেকে প্রায় একশ পঞ্চাশ বছর পর বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' [১৮৬৫] প্রকাশিত হলো। ১৮০০ সাল থেকে বহু প্রচেষ্টা ও প্রযত্নের মধ্য দিয়ে বাংলা গদ্য দ্রুত গতিতে উৎকর্ষ লাভ করলেও তখনও একটা স্বীকৃত মানে পৌছয়নি। বঙ্কিমচন্দ্র তাই উপন্যাসের উপযোগী গদ্য ভাষার সন্ধানে সচেষ্ট হলেন এবং উপন্যাসের জন্মলগ্নেই ভাষার এক আশ্চর্য রূপান্তর পরিলক্ষিত হলো।

• উপন্যাস মানবজীবন নিয়েই রচিত এবং তা বস্তুনিষ্ঠ হওয়া উচিত। আর উপন্যাস-

শিল্পী যতই কৌশলের সাহায্য নেননা কেন তার নিজস্ব ধ্যান-ধারণা ও ঝোঁক উপন্যাসে বর্তমান থাকবেই যেহেতু উপন্যাসের বিষয় নির্বাচন তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব। এ কারণেই বঙ্কিমচন্দ্রের পাঠক তাঁর আদর্শ ও নীতিবাদকে সহজেই অনুধাবন করতে পেরেছিল।

সর্বদেশেই প্রথম পর্যায়ের উপন্যাসগুলি ঘটনাপ্রধান। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসও মূলত ঘটনাপ্রধান। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম সামাজিক উপন্যাস 'বিষবৃক্ষ' [১৮৭৩]। কিন্তু 'বিষবৃক্ষ' সামাজিক উপন্যাস' হলেও ঘটনার প্রাধান্য ও অলৌকিকতার স্পর্শ থাকায় রোমান্সের আভাস পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসটির চাবিকাঠি হিসাবে ব্যবহার করেছেন অতিপ্রাকৃত প্রসঙ্গ যা স্বপ্ন দর্শনের মাধ্যমে প্রতিফলিত। এই উপন্যাসে কুন্দনন্দিনী'র দুঃখময় পরিণতি যেন অনেকাংশেই তার পূর্বদৃষ্ট স্বপ্নকে সফল করার প্রয়াসেই উপস্থাপিত যদিও কাহিনী ও ঘটনার মধ্যেই কুন্দর করুণ প.রণতি সম্ভবপর ছিল এবং গল্পের প্রবহমানতার মধ্যে পাঠকেরা সেই স্বপ্নের বৃত্তান্ত বিস্মৃত হয়ে যায়, এমন কি কুন্দ নিজেও যেন সেই স্বপ্নের প্রভাব থেকে অনেকটা মুক্ত হয়ে পড়েছিল। তাই একথা অনুমান করা হয়ত অসঙ্গত হবে না যে, বঙ্কিমচন্দ্র এক্ষেত্রে শুধুমাত্র অতিপ্রাকৃত পরিবেশ সৃষ্টির কারণেই স্বপ্নের অবতারণা করেছেন যদিও সেই স্বপ্নদৃষ্ট নারী পুরুষকে পরবর্তী সময়ে আমরা নগেন্দ্র-হীরা' হিসাবে সনাক্ত করতে পেরেছি। দ্বিতীয় স্বপ্নটি ঠিক এভাবে চি'হ্নত কর' না গেলেও এই স্বপ্নের জন্যই কুন্দর যন্ত্রণাকাতর উপলব্ধির পরিমাপ করা পাঠকদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে। এই প্রয়াসও রোমান্সের প্রভাব বর্জিত নয়।

এই রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গী থাকা সত্ত্বেও বিষবৃক্ষের পরিবেশের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায় যে, তৎকালীন সামাজিক প্রতিবেশ সম্পর্কেও বঙ্কিমচন্দ্র উদাসীন ছিলেন না। দেবেন্দ্র ও হীরার সাহায্যে তিনি সে সময়কার গ্রামীণ সমাজকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন এবং প্রসঙ্গত ব্রাহ্ম আন্দোলন, বিধবা বিবাহ ইত্যাদি উত্থাপনের মধ্যেও তা ব্যক্ত হয়ে উঠেছে। দেবেন্দ্রর বেপরোয়া লাম্পট্যের কারণের যে আভাস বঙ্কিমচন্দ্র দিয়েছেন তা তাচ্ছিল্য করার উপায় নেই, তেমনি আবার হীরার নিজের সঙ্গে সূর্যমুখীর তুলনা করাও এতটুকু অতিরঞ্জিত নয়—কেননা সামাজিক প্রতিষ্ঠা হীরার না থাকলেও সে মূলত রমণী।

আধুনিক উপন্যাসের উপকরণ হিসাবে মনস্তত্ত্বের ব্যবহার যে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে, 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে ব্যবহৃত চিঠিপত্রের মধ্যে আমরা তার পরিচয় পাই। শ্রীশচন্দ্র ও হরদেব ঘোষালকে লেখা নগেন্দ্রর পত্রের মধ্যে আমরা নগেন্দ্রর অন্তর্দ্বন্দ্বের অনেকটা সন্ধান পাই। মোট কথা, 'বিষবৃক্ষ' প্রথম উল্লেখযোগ্য সামাজিক উপন্যাস হলেও আমরা সেই সমসাময়িক জীবনের এক বিস্তৃত পটভূমিকায়, জীবন্ত মানুষের বিভিন্ন সমস্যার উপস্থাপনা দেখতে পাই। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গী ও নীতিবাদের বিধিনিষেধ তাঁর উপন্যাসের বক্তব্যকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। বিষবৃক্ষের বিষফল আস্বাদনের বিভীষিকাময় পরিণতি উপন্যাসটিকে সীমিতলক্ষ্য করে তুলেছে আর সেজন্যই নায়ক-নায়িকার ব্যবহারে আমরা লেখকের নিয়ন্ত্রণ লক্ষ্য করেছি। কুন্দের আত্মহত্যা বা রোহিণী হত্যা অথবা শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্তের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শবোধ দুর্লক্ষ্য নয়।

রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলা উপন্যাসের বক্তব্য ও বিষয়বস্তুর বেশ কিছুটা রূপান্তর হল। উপন্যাসের বহির্জগত আর ঘটনার প্রাধান্য বহুলাংশে দূর হল। 'চোখের বালিতে' [১৯০২] রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমপ্রভাব মুক্ত না হলেও, যত্ন নিয়েছেন তাঁর রচিত পাত্রপাত্রীর 'আঁতের কথা' তুলে ধরতে। এই পর্যায়ের উপন্যাসে আবার এও লক্ষ্য করা যায় যে বাহিরঙ্গ ঘটনার চাপ কমে যাওয়ায় চরিত্রগুলো তাদের নিজস্ব ভঙ্গীতে চলাফেরা করার সুযোগ পেয়েছে এবং প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। স্বাভাবিকভাবেই তাই এখান থেকেই পাত্র-পাত্রীর মানসিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া গুরুত্ব লাভ করেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'রজনী' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' অনেকটা মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস হলেও, 'চোখের বালি' বাংলা মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস হিসাবে অনেক বেশী অগ্রসর। 'বিষবৃক্ষে'র সঙ্গে 'চোখের বালি' উপন্যাসের কাহিনীগত সাদৃশ্য লক্ষণীয় হলেও, 'চোখের বালি' উপন্যাসের বিন্যাস, বক্তব্য ও মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের জন্য উপন্যাসটিকে আধুনিক বাংলা উপন্যাসের সূচনারূপে অনেকেই দেখে থাকেন।

"গোরা" উপন্যাস সর্বকালের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। 'গোরা'র কাহিনী, চরিত্র, ভাষা ও বক্তব্য সবই উচ্চাঙ্গের এবং উৎকৃষ্ট শিল্পসৃষ্টির উপযোগী কিন্তু সেখানে সুদীর্ঘ বর্ণনা, আলোচনা, তত্ত্বের ভার ও যুক্তির তীক্ষ্ণতা কখনও কখনও প্রয়োজনকেও ছাড়িয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সাহিত্যে যে আভিজাত্যপূর্ণ একটা প্রতিবেশের আভাস পাওয়া যায় 'গোরা' উপন্যাসেও তা আছে। তাঁর অন্যান্য উপন্যাসের মত 'গোরা'র পাত্রপাত্রীরাও তাদের সেই বিশেষ শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অর্থ নৈতিক পরিমণ্ডল থেকে কখনোই বিচ্যুত হয়নি।

'যোগাযোগ' উপন্যাসেও পাত্রপাত্রী সবদিক থেকে তাদের আভিজাত্য বজায় রেখেছে। উক্ত উপন্যাসটির মধ্যে যে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ প্রাধান্য পেয়েছে তা হচ্ছে অতি সচেতন ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষ। মধুসূদন যে ধাতুতে গঠিত, কুমু ঠিক তার বিপরীত, উপরন্তু দুটি চরিত্রই তাদের নিজ নিজ মর্যাদা সম্পর্কে প্রখরভাবে সচেতন। আবার তাদের দুজনার বয়সের যথেষ্ট ব্যবধান থাকায় তাদের মধ্যে প্রেমপ্রীতি বা বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে পারে নি। স্বাভাবিক কারণেই তাই এরকম দাম্পত্য জীবন সুখের হতে পারে না। আবার, কুমুর চরিত্রের উপর তার দাদা বিপ্রদাসের প্রচণ্ড প্রভাব এবং সেই সঙ্গে তার প্রাক-বিবাহ জীবনের বোধ, বিশ্বাস, সংস্কার ও উপলব্ধি তাকে প্রায় সর্বদাই আচ্ছন্ন করে রেখেছে। কিন্তু এইসব সূক্ষ্ম জটিল মানসিকতা থাকা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত কুমু ও মধুসূদনের যোগাযোগ সম্ভব হয়ে উঠেছে কুমুর মাতৃত্বে। কাহিনীর এই পরিণতি সহজ বাস্তবতার ঊর্ধ্বেই প্রতিষ্ঠিত।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসেও আমরা দেখতে পেলাম যে, বাস্তবতার সমগ্র চিত্রটি সেখানেও সম্পূর্ণভাবে উপস্থাপিত হয়নি। মনে হয় শরৎচন্দ্রের রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রচলিত আদর্শের প্রতি সশ্রদ্ধ রক্ষণশীল মনোভাবই এর কারণ। জীবনের স্বাভাবিক

গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে তিনি অসচেতন ছিলেন না কিন্তু জীবন পথের প্রতি পদক্ষেপেই যে সামাজিক বাধা প্রাপ্তির সম্ভাবনা হয়েছে সেইটুকু সাহিত্যে তুলে ধরেই তিনি থেমে গেছেন সমাজবিদ্রোহীরূপে নরনারীকে নতুন দিগন্তে পৌছে দিয়ে তিনি তাদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি। শরৎচন্দ্রের আরো একটা প্রচেষ্টা প্রায় সব উপন্যাসেই দেখতে পাওয়া যায় যার মোট যোগফল হচ্ছে আদর্শের সঙ্গে আদর্শহীনতার দ্বন্দ্বে আদর্শের জয়। ধর্ম, বিশেষতঃ মানবিক গুণের আধার যে ধর্ম, সেই ধর্মের লাঞ্ছনা বা পরাজয় তিনি চোখে দেখেও সব সময়ে নিরাসক্তভাবে চিত্রিত করতে পারেন নি। অধর্ম ও আদর্শহীনতার বিচারের ভার অবশ্য তিনি পাঠকের হাতেই তুলে দিয়েছেন। সম্ভবত এই কারণেই তার উপন্যাসের পাত্রপাত্রী পাঠককুলের কাছে যেমন সহানুভূতি লাভ করেছে, অন্যদিকে আবার লেখকের জনপ্রিয়তার কারণও সেখানেই সুপ্ত। কিন্তু এই ব্যাপারটি পাঠকের অনুভূতি ও উপলব্ধির মধ্যেই ঘটেছে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে। লেখক প্রকাশ্যে সাধারণতঃ পাঠকদের এই অনুভূতি সঞ্চারে বাধ্য করেন নি। এটা নিঃসন্দেহে উপন্যাসের ক্ষেত্রে একটা বিরাট সাফল্য। কাহিনী ও বিষয়বস্তুর নেপথ্যে ঔপন্যাসিকের যে উপলব্ধি সেই ভাবের সঙ্গে পাঠককে একাত্ম করে তোলা অতি উঁচু দরের শিল্প সন্দেহ নেই, কিন্তু বস্তুতান্ত্রিক উপন্যাসের জন্য অপরিহার্য বা একমাত্র কখনো নয়।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের প্রধান পাত্রপাত্রীরা প্রায় সকলেই উচ্চস্তরের আদর্শবাদী। তারা মহত্বের আভিজাত্য নিয়ে, উদারতার গরিমা নিয়ে সর্বপ্রকার পাপ ও অন্যায়ের উর্ধ্বে বিচরণ করতে পছন্দ করে। তাদের যে সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতি তাও যেন তাদের মহত্বকে আরও বেশী মহিমান্বিত করার জন্যই অঙ্কিত। আর যে সমস্ত হীন চরিত্র তাদের নীচ প্রবৃত্তি নিয়ে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে দেখা দিয়েছে তারা কেবল মহৎ পাত্রপাত্রীর বিরুদ্ধাচরণ করার জন্যই উপস্থিত হয়েছে। শরৎ সাহিত্যে প্রায় সব চরিত্রই হৃদয়রসে আপ্লুত হয়ে স্বার্থহীন ভালোবাসার পসরা নিয়ে দেখা দিয়েছে, মানুষের দুঃখে তাদের সহানুভূতি অপরিসীম। কিন্তু প্রেমের ক্ষেত্রে এই সব আদর্শবাদী চরিত্রের যতটুকু সংযম থাকা আবশ্যক বলে বিবেচিত হতে পারে তাদের ততখানি সংযম নেই। কেননা এইসব চরিত্র বুদ্ধিবৃত্তির চাইতে হৃদয়বৃত্তিকেই বেশী প্রশ্রয় দিয়েছে। উপন্যাসের এই ভাবাবেগের প্রাধান্য শরৎচন্দ্রের রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গীরই পরিচয় দেয়।

শরৎচন্দ্রের কথাসাহিত্যকে অনেকেই বাস্তবধর্মী বলে দাবী করে থাকেন। কিন্তু কথাসাহিত্য সাহিত্যের এমন একটি শাখা, যা কখনোই বাস্তববর্জিত হতে পারে না। শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে যতটুকু বস্তুতন্ত্রের ইশারা আভাস আছে তা কখনোই তার রোমান্টিক অভিব্যক্তিকে অতিক্রম করতে পারেনি, তা হয়ে উঠেছে এক কৃত্রিম বাস্তবতার প্রকাশ। তাঁর উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার আচরণ ও ব্যবহার অনেকাংশেই বস্তুতন্ত্রের বিরোধী, প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে তাদের যা কিছু বক্তব্য তা বুদ্ধি বা যুক্তিনির্ভর না হয়ে

হয়ে উঠেছে হৃদয়সঞ্জাত। আসলে শরৎচন্দ্র বাস্তবতার খুঁটিনাটি আঁকতে চেষ্টা করেন নি, রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বাস্তবের সমগ্রতাকে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীকে তাই বলা যেতে পারে, বাস্তবতা বিরোধী নয়, বরঞ্চ বাস্তবতার পরিপূরক। যদিও তাঁর সাহিত্যের মূল উপজীব্য জীবনের আদর্শরূপ আর তার কাহিনীর মধ্যে যে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ অনেক সময়েই প্রধান হয়ে উঠেছে তা হচ্ছে আদর্শ ও আত্মমর্যাদার সংঘর্ষ।

শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ' উপন্যাসে প্রেমের ব্যাখ্যা ও সতীত্বের সংজ্ঞা দানের এক অভিনব প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। এই ব্যাপারে অনেকেই শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের মধ্যে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধাচরণ দেখতে পেয়েছেন। কিন্তু 'গৃহদাহ' উপন্যাসে পাত্রপাত্রীর আচরণ শরৎসাহিত্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্যকে ছাপিয়ে যায় না, বিষয়বস্তুও শরৎসাহিত্যের ক্ষেত্রে অভিনব নয় এবং কাহিনীর পরিণতিও প্রত্যাশিতভাবে করুণ ও বিয়োগান্ত। যুক্তি ও সম্ভাব্যতার বিচারে এই পরিণতি কিন্তু পীড়াদায়ক, কেননা কাহিনীকারের সংস্কারটি যথার্থই সক্রিয় এবং তাঁরই সৃষ্ট পাত্রপাত্রীরা সংস্কারমুক্ত হতে গিয়েও সংস্কারের কাছেই পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছে। আর শরৎচন্দ্রের মতাদর্শের অন্তর্গত দ্বিধাও এইভাবেই প্রতিফলিত হয়েছে।

'গৃহদাহ'-র পাত্রপাত্রীর আচরণ মনস্তাত্ত্বিক বিচারে অদ্ভুত ও অসংগতিপূর্ণ। তারা যেন প্রেম ভালোবাসা ছাড়া অন্যান্য বাস্তব দিকগুলি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অসচেতন। বাইরের সংঘাতে তাদের অন্তরের পরিবর্তন ঠিকই ঘটেছে কিন্তু উপন্যাসটিতে তার যথেষ্ট অন্তরঙ্গ বিশ্লেষণ নেই। এমন কি পূর্ব থেকে কার্যকারণের পরিণতি অনুধাবন করতে পেরেও পাত্রপাত্রীরা কোন বিকল্প সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি এবং তারা সমাজের বলি না হয়ে হৃদয়বৃত্তির বলি হয়ে পড়েছে। একটি বিবাহিতা নারীর পক্ষে অন্য পুরুষের প্রতি আসক্ত হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়, তবে তা এই সমাজব্যবস্থায় অপ্রচলিত। বিবাহিতা নারীর অন্য পুরুষের প্রতি আসক্তির কারণ ধরে নেওয়া হয় স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের উপর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার অভাব যা তাদের সম্পর্কের ভারসাম্য নষ্ট করে—কিন্তু এই ব্যাখ্যাও রক্ষণশীল মনোভাবেরই প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরের' নায়িকা বিমলা তার স্বামী নিখিলেশের মধ্যে যে অভাব অনুভব করেছিল, সেই অভাব পূরণের সম্ভাবনা আবিষ্কার করেছিল সন্দীপের মধ্যে। অর্থাৎ যে পরিপূর্ণ পুরুষ বিমলার কল্পনার আদর্শে গড়ে উঠে মনের মধ্যে আসন করে নিয়েছিল তা হচ্ছে নিখিলেশ ও সন্দীপের যোগফল। বস্তুতঃ বিমলার এই অনুভূতি তার মনে সঞ্জাত হয়েছে সন্দীপকে দেখার পর। এই ঘটনার মধ্যে কোথাও শ্রদ্ধা বা ভালোবাসার ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার দৃষ্টান্ত নেই, নিখিলেশের উপর বিমলার শ্রদ্ধার পরিমাণ কখনো কমে যায় নি- স্বদেশী আন্দোলন ও সন্দীপের প্রভাব তাকে তার স্বামীর প্রতি কিছুটা উদাসীন করে তুলেছে মাত্র কিন্তু এই উদাসীনতা স্থায়ী হয়নি। অপরদিকে সন্দীপের প্রতি তার ব্যবহার ও আচরণকে মুগ্ধ মোহাবেশ বলে মনে হয়। 'গৃহদাহের' অচলার কিন্তু সুরেশ সম্পর্কে শুধু মোহই নয়,

গভীর কোনো আগ্রহের অভাবও লক্ষণীয়। অচলার হৃদয়ও তাই দ্বিধাবিভক্ত। কিন্তু তার জন্য মহিমের প্রতি তার প্রেম ও শ্রদ্ধা প্রায় অকারণে শূন্যতায় রূপান্তরিত হবে কেন? এই প্রসঙ্গে 'গৃহদাহ' কাহিনীতে কিন্তু কোন বিশ্লেষণ নেই এমন কি অচলার মনোবিশ্লেষণও এই প্রসঙ্গে যথোচিত নয়। সুরেশের প্রতি তার প্রায় প্রেমহীন আকর্ষণের ঘটনা যেন পাত্র-পাত্রীর দায়িত্বে ঘটে নি, ঔপন্যাসিকের প্রযত্নেই সংঘটিত হয়েছে।

শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে যে সমাজকে তুলে ধরেছেন সে সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেছে এমন এক শ্রেণীর মানুষ যারা বর্তমানে মধ্যবিত্ত হলেও নিকট অতীতে ভূ-সম্পত্তির মালিকানার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল। এই কারণেই মনে হয় শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে এদের প্রত্যেকেরই আভিজাত্য, কৌলীন্য ও বদান্যতা সর্বাংশে রক্ষা করেছেন। তাই এইসব পাত্র-পাত্রী কখনোই তাদের সেই একদা হারিয়ে যাওয়া আভিজাত্যের আবরণটিকে ছুঁড়ে ফেলে ঠিক সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের সমপর্যায়ে এসে দাঁড়াতে পারে নি। কোন না কোন বৈশিষ্ট্য তাদের যেন সব সময়ই স্বতন্ত্র করে রেখেছে। ফলে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলিও তাঁরই মতো কখনোই ঠিক আদর্শচ্যুত হতে পারেনি। এই আদর্শবাদ রোমান্টিকতারই সাক্ষ্য দেয়।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে 'সবুজপত্র' আত্মপ্রকাশ করলো এবং সবুজপত্রের মধ্যমণি প্রমথ চৌধুরী গল্পকার হিসাবেও সাহিত্যের আসরে পদক্ষেপ করলেন। যুগটি নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রযুগ। সেই যুগেই প্রমথ চৌধুরী একটি ফরাসী গল্পের অনুবাদ প্রকাশ করে বাঙ্গালী পাঠকদের বুঝিয়ে দিলেন যে সাহিত্যের বিষয়বস্তুর ব্যাপারে তিনি রক্ষণশীল নন। শরৎচন্দ্রের উপন্যাস পাঠকসমাজে তখন বিশেষ কোন সাড়া জাগায় নি আর বাংলা ছোটগল্প তখন রবীন্দ্রনাথের হাতে আশ্চর্য রকমের সমৃদ্ধি লাভ করেছে। কিন্তু প্রমথ চৌধুরী তাঁর ছোটগল্পে একথা প্রমাণ করতে সমর্থ হলেন যে রবীন্দ্রধারা থেকে তাঁর ছোটগল্পের ধারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সাধারণ মানুষের ছোটখাট সুখদুঃখের ছবি, নিকট অতীত বা বর্তমান যার পটভূমি, সেই সব ঘটনা বা জীবনের কাহিনী বর্ণনা থেকে তিনি বিরত রইলেন, কেননা একই ধরনের কাহিনীর আনন্দঘন বা অশ্রুসজল পরিণতির পৌনঃপুনিকতার মধ্যে বা বহু ব্যবহারের ফলে জীর্ণ বিষয়বস্তুর মধ্যে তিনি নিজের সাহিত্যপ্রবাহকে মিশিয়ে দিতে পারলেন না। প্রমথ চৌধুরী তাঁর সাহিত্যে যে পরিবেশ রচনা করলেন তা এক ভিন্ন জগতের। তাঁর গল্পের মধ্যে দেখা দিল মধ্যযুগোচিত সামন্ততান্ত্রিক পটভূমিতে প্রেম ও প্রতিহিংসার আদিম রূপ, আরও দেখা দিল বিদেশী পটভূমির বৈচিত্র্য। গল্পকার প্রমথ চৌধুরীর বিশেষত্ব এই যে তিনি আনন্দ খুঁজেছেন ক্ষণপরিচিত বা অপরিচিত জগতের সৌন্দর্যে—যেখানে মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী সমাজ ও জীবনের জরাজীর্ণ অবস্থা, কান্নাকাটি, অভাব, অনটন এবং সমস্যার কোন স্থান নেই। তাই তাঁর কাহিনীর চরিত্র, বিষয় বা পরিবেশ কোথাও আমাদের পরিচিত সমস্যাসঙ্কুল বাস্তবতার উপস্থাপনা নেই। যে গ্রাম বা শহরের ছবি তিনি এঁকেছেন, তা আমাদের অভিজ্ঞতার

অন্তর্গত নয়, যে পরিবেশ তিনি বর্ণনা করেছেন তাও অপরিচিত। কিন্তু কোন পরিবেশই তিনি একাধিকবার বর্ণনা করেন নি এবং তার অসংখ্য চরিত্রও বৈচিত্রে এবং বিন্যাসে ভিন্ন।

বাংলা কথাসাহিত্যে প্রমথ চৌধুরীই প্রথম ব্যক্তি যিনি সচেতন ভাবেই সাহিত্যে সমস্ত রকমের জটিলতাকে বর্জন করেছেন। তাই তাঁর রচিত চরিত্রগুলির জটিল মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণের চিরাচরিত প্রথাটি নেই, গল্পগু'র কাঠামো সরল দৃঢ় ও ঋজু। তাঁর কাহিনীর মধ্যে ঈর্ষা, ঘৃণা, কামনা, লোভ, সংস্কার ইত্যাদি এলেও তার মধ্যে কোন আবেগ বা উচ্ছ্বাস নেই। নিরপেক্ষ ও নিরাসক্ত ভাবেই তাঁর গল্প পরিবেশিত। প্রমথ চৌধুরী সম্ভবতঃ বিশ্বাস করতেন যে, মানুষের লোভ, মোহ, কামনা-বাসনা, হিংসা-দ্বেষ বা ছলনা-প্রতারণা কখনোই কোন নির্দিষ্ট কালের বা ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ নয়, বস্তুনিষ্ঠবৈচিত্র্য নির্দিষ্ট যুগ বা কালের দাবীকে অতিক্রম করতে পারে। তৎকালিন বাংলা সাহিত্যে সহজলভ্য রোমান্টিক কল্পনাবিলাসও পরিণতিতে যে রূপকথাসুলভ ইচ্ছাপূরণের আধিক্য দেখা দিয়েছিল, প্রমথ চৌধুরী সে চেষ্টাকে বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় দেন নি বরঞ্চ অলীক স্বপ্নকে ভেঙ্গে চুরে খান খান করে দিয়েছেন। মন্ত্রশক্তির ব্যাখ্যা তাঁর চিন্তায় অলৌকিক কিছু নয়, মনঃসংযোগ ও একনিষ্ঠতার নামান্তর, যে শক্তি আয়ত্ত করার পিছনে থাকে একাগ্র অনুশীলন।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প আর প্রমথ চৌধুরীর ছোটগল্পের জাত আলাদা। রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের আশ্চর্য্য কাব্যধর্মিতা, সূক্ষ্ম অনুভূতি, প্রগাঢ় মানবতাবাদ এবং সেই সঙ্গে সৌন্দর্যবোধ ও অতীন্দ্রিয় প্রেমচেতনা থেকে প্রমথ চৌধুরীর উপলব্ধি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। রবীন্দ্রপ্রভাব মুক্ত হয়ে তিনি নতুন ভাবে ও ভাবনায় সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন বাংলা কথাসাহিত্যের ভাণ্ডার। তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে বস্তুনিষ্ঠ সাহিত্য মানেই মানবজীবনের খুঁটিনাটি বর্ণনা বা মানুষের জীবনের অসংগতির কাহিনীই নয়, তার অতিরিক্ত অনেককিছুই বস্তুনিষ্ঠ হতে পারে, এমনকি জাঁকজমকপূর্ণ বর্ণাঢ্য উজ্জ্বল সামন্ততন্ত্রের কাহিনীর মধ্যেও বস্তুতন্ত্রের ঘাটতি নাও থাকতে পারে। আধিভৌতিক বা অলৌকিক রহস্যলতিকায় যে কুসুম ফোটে তারও মূল প্রোথিত থাকে মাটিতেই। তবু প্রমথ চৌধুরীর মার্জিত ও বুদ্ধিদীপ্ত বিষয়বস্তুর মধ্যে সাধারণ বাঙ্গালী পাঠক পরিতৃপ্তি পায় নি—তাদের ভাবপ্রবণ হৃদয়ে তাঁর আসন প্রতিষ্ঠিত হয়নি, শুধুমাত্র শিক্ষিত রুচিবান একশ্রেণীর পাঠকদের কাছেই প্রমথ চৌধুরী স্বীকৃতি পেয়েছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে সমাজের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে যে অস্ফুট গুঞ্জন শোনা গিয়েছিল তা আরো উঁচু পর্দায় দেখা দিল রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' ও 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে। প্রাচীন কু-সংস্কারাচ্ছন্ন সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে তিনি কাব্যে ও কথাসাহিত্যে প্রগতিবাদী মনোভাবের দুঃসাহস নিয়ে এগিয়ে এলেন, কিন্তু সে যুগের সেই রক্ষণশীল সমাজপতিদের তথাকথিত নৈতিকতার কাছে রবীন্দ্রনাথকেও তিরস্কৃত হতে হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের সমকালীন কিছু লেখক সেই একই দৃষ্টিভঙ্গী

থেকে রবীন্দ্রনাথকে মেনে নিতে পারেন নি। কিন্তু আমরা দেখতে পেয়েছি যে এতকাল সাহিত্য যে আদর্শের আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিল সেই আদর্শ থেকে সাহিত্য তখনও সাধারণ মানুষের সমতলে নেমে আসতে পারে নি।

রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কালেই সাহিত্যকে আদর্শের উঁচু আসন থেকে নামিয়ে মর্তলোকে নিয়ে আসার একটা প্রয়াস সাহিত্য আসরের নবাগতদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। শরৎচন্দ্রের মধ্যেও যে এই প্রবণতা ছিল না তা নয়—সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখ নিয়েই তিনি কারবার করেছেন যদিও মর্যাদা ও আভিজাত্যের নিদর্শনহীন পাত্রপাত্রী তার সাহিত্যেও বড় একটা পাওয়া যায় না। সাহিত্যের একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য এই যে তা প্রায়ই যুগের প্রভাবকে অস্বীকার করে না। স্বাভাবিকভাবেই তাই সাহিত্যের মধ্যে কালোচিত বাইরের ঘটনা বা অন্তরের বিশ্বাস লিপিবদ্ধ হয়। কিন্তু কালের প্রত্যক্ষ প্রভাবস্বরূপ চিন্তার অগ্রগতি যদিও সাহিত্যকে অনেকাংশে উদার ও মুক্ত করে তোলে, তথাপি সমাজের পুরোনো বিশ্বাস ও সাহিত্যে টিকে থাকে, যেহেতু প্রগতিবাদী চিন্তাধারা কোন সময়ই সমাজের সর্বস্তরে পৌঁছায় না। আর সমাজে যখনই একটা নতুন চিন্তা আলোড়ন সৃষ্টি করে বা প্রচলিত বিধিব্যবস্থার একটা পরিবর্তন আসন্ন হয়ে ওঠে তখন সকলেই কিন্তু তা মেনে নিতে পারে না। এটা বাস্তব ঘটনা। সমাজে এই কারণেই চিন্তা ও নীতির মধ্যে এত বিভিন্নতা। তাই কালের গতির সঙ্গে পা মিলিয়ে সাহিত্য যেমন এগিয়ে চলে ঠিক তেমনি আবার কোন কোন সাহিত্যিক তাঁর সৃষ্টির মধ্যে পুরোনো সংস্কার, বিশ্বাস ও উপলব্ধিকে সত্তার সঙ্গে বাঁচিয়ে রাখেন। বাংলা কথাসাহিত্যের একটা দিক যখন অনেক উত্থান পতনের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে এসে সমাজের সঙ্কীর্ণতা ও ধর্মের মেকি আবরণ উন্মোচন করার দিকে ঝুঁকেছে ও বস্তুনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে তখনও সাহিত্যের অপর একদিক প্রচলিত সমাজব্যবস্থার প্রতি প্রচণ্ড আনুগত্য প্রকাশ করে চলেছে। অর্থাৎ তখন রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল দুই লেখককুলই মেরুব্যবধান নিয়ে সাহিত্য-চর্চা করে চলেছে।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে রক্ষণশীল অনুবর্তনই লক্ষ্য করা যায়। রক্ষণশীল ধারা অনুযায়ী তিনি ছিলেন প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় আস্থাশীল, প্রাচীন নীতিবোধ ও জীবনদর্শনে বিশ্বাসী ও আশাবাদী। গল্প উপন্যাসের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন রোমান্টিক যদিও সমসাময়িক সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনকে তিনি তার গল্প উপন্যাসে ব্যবহার করতে দ্বিধা করেন নি। বিধবা বা অসবর্ণ বিবাহ, স্বদেশী ডাকাতি, অসহযোগ আন্দোলন ইত্যাদি সবকিছুই তাঁর সাহিত্যে দেখা যায়। কিন্তু এই সব ঘটনার কার্যকারণের গভীরে তিনি প্রবেশ করেন নি। সব ঘটনাই তাঁর দৃষ্টিতে যেন নিছক ঘটনাই—গল্প-উপন্যাসের উপকরণ মাত্র। তাঁর গল্প-উপন্যাসে সাধারণ মানুষের পরিচিত ঘটনাগুলিকেই তিনি ব্যবহার করেছেন, কোন গভীর তত্ত্ব বা আদর্শের প্রচার করেন নি। তাই প্রভাতকুমারের গল্প পড়ে মনে হয় যেন তিনি অনেকাংশেই পাঠকদের মনোরঞ্জনের দিকে লক্ষ্য রেখে সাহিত্য রচনা করেছেন এবং আমাদের অতি পরিচিত

চরিত্রদের বিচিত্র করে নতুনভাবে রস সঞ্চার করেছেন। অর্থাৎ সমসাময়িক যুগের জটিলতার স্পর্শ সন্তর্পণে এড়িয়ে গেছেন এবং সেজন্য তৎকালীন রাষ্ট্রনৈতিক ঘটনা, যুদ্ধ, রবীন্দ্রনাথ ও সবুজপত্র বাংলা সাহিত্যে যতই প্রভাব বিস্তার করুক না কেন, প্রভাতকুমারের নিস্তরঙ্গ জলাশয়ের মত শিল্পী ব্যক্তিত্ব বিন্দুমাত্র স্পন্দিত হয়নি। তিনি রবীন্দ্র অনুগামী না হয়েও ছিলেন রবীন্দ্রভক্ত এবং তাঁর রচিত অনেক কাহিনীরই প্রেরণা ও উৎস স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস [১৩০৯-১৩১ সালে*] ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাঁর সেই প্রথম উপন্যাস 'রমাসুন্দরী'র মধ্যে যে সমস্যা সমাধানের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয় সেই একই প্রবণতা তাঁর পরবর্তী উপন্যাসগুলির মধ্যেও দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর উপন্যাসগুলি রচনা কালের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রূপান্তরিত হয় নি বা কখনোই পরিণত চরিত্র লাভ করতে পারেন নি। 'সিঁদুর কৌটা' [১৯১৯] উপন্যাসের প্রেমের জটিল সমস্যাও অতি সহজেই মিটে গেছে। এই কাহিনীতে স্বামীর কারণে সাধ্বী স্ত্রী বকুরাণী সপত্নীকে উদারভাবে গ্রহণ করতে পেরেছে। প্রভাত কুমারের কাহিনীর সমাধানগুলি প্রায় সর্বদাই ইচ্ছাপূরণমূলক। বাংলা সাহিত্যের নব্য লেখককুল যখন সামাজিক বাধার গণ্ডীগুলিকে একের পর এক অতিক্রম করার চেষ্টা করেছে, সাহিত্যের প্রচলিত আদর্শের বেড়ি ভেঙ্গে ফেলছে, উচ্চবিত্ত শিক্ষিত পাত্রপাত্রীকে সাহিত্য থেকে নির্বাসিত করে শ্রমিক, ভিখারী ও অন্ত্যজ শ্রেণীকে স্থান দিচ্ছে, সেই সময়েও প্রভাতকুমার রচনা করে চলেছেন সতীত্বের মহিমা ও পুণ্যের জয়গান। কল্লোল-পন্থীরা যখন লিখছে যাযাবর, বেদে, বা টুটাফুটা, সেই সময় প্রভাতবাবু প্রকাশ করেছেন 'সতীর পতি'। অর্থাৎ প্রচলিত রক্ষণশীল মূল্যবোধের উপর প্রভাতকুমারের একটা প্রচণ্ড রকমের বিশ্বস্ততা বরাবরই লক্ষ্য করা যায়। এর দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় তার উপন্যাসের শুধু নামকরণের উল্লেখ করে, যেমন 'সুখের মিলন', 'গরীব স্বামী', 'সতীর পতি', 'সিঁদুর কৌটা'।

প্রভাতকুমারের জনপ্রিয় উপন্যাস রত্নদীপের মধ্যেও তাঁর রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। 'রত্নদীপ' উপন্যাসে দীর্ঘ দিনের বিরহকাতর বউরানীর জীবনে তাঁর স্বামীর চেহারার সাদৃশ্য নিয়ে রাখালের আবির্ভাবে যে মনস্তাত্ত্বিক জটিল সমস্যা দেখা দিয়েছিল লেখক সেই সমস্যা অতি সহজেই সমাধান করেছেন। রাখাল তার সৎ সংকল্প নিয়ে যুবতী বউরানী ও জমিদারী বৈভব অনায়াসে ত্যাগ করে ফিরে গেছে আর বউরানী, রাখাল তার স্বামীর প্রতীক হলেও সে পরপুরুষ এবং তার প্রতি তার যে অনুরাগ সঞ্চারিত হয়েছিল সেই অপরাধবোধে জীবন বিসর্জন দিতে উদ্বুদ্ধ হয়েছে। এভাবেই প্রভাতকুমার সতীত্বের মহিমার জয়গান করেছেন।

ছোট গল্পকার হিসাবে প্রভাতকুমার বিচিত্র রসের স্বাদ পরিবেশন করেছেন। তাঁর গল্পগুলি পুরোপুরি বস্তুনিষ্ঠ না হলেও আঙ্গিক ও চরিত্র চিত্রণে নিঃসন্দেহে বৈচিত্র্যপূর্ণ। বিদেশী পটভূমিকায় লেখা করুণ বেদনাময় কাহিনীগুলিকে তিনি যেমন রসোত্তীর্ণ করে

তুলেছেন তেমনি এদেশী শহর ও গ্রামভিত্তিক গল্পগুলিও সুন্দরভাবে পরিপূর্ণতা লাভ করে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ছোট গল্পগুলি নিঃসন্দেহে তাঁর সার্থক সৃষ্টি।

প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার প্রতি প্রভাতকুমারের আনুগত্য থাকলেও কোন কোন গল্পে সমাজের প্রথাবদ্ধ অন্ধ বিশ্বাস ও সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে তাঁর পরোক্ষ প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। 'দেবী' ও 'কাশীবাসিনী' এ গল্প দুটির মধ্যে এই নিরুচ্চার প্রতিবাদ লক্ষ্য করা যায়। তবু এই গল্প দুটিও যেন শেষ পর্যন্ত প্রভাতকুমারের অন্যান্য গল্পের ব্যতিক্রম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি—অসতীর নির্যাতন নিয়ে রচিত 'হীরালাল' বা 'লেডি ডাক্তার' গল্পের সগোত্র না হয়েও।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে আমরা দেখতে পেলাম বাস্তবতার অভাব অথচ জীবন ও জগৎ সম্পর্কে একটা সহজ কৌতুকবহ স্নিগ্ধ রসসৃষ্টি। সমাজ, সংসার বা জীবনে জটিলতা থাকতে পারে, সে সব তিনি অস্বীকার করেন নি কিন্তু তাঁর হিসাবে সেই সব সমস্যা কখনোই আয়ত্তাতীত হতে পারে না এবং সব সমস্যারই সহজ সমাধান আছে। আশাবাদের এই মখমল-কোমল সুরটির মধ্যে দৈবকৃপায় অপ্রত্যাশিত ইচ্ছাপূরণের ব্যাপার সংঘটিত হলেও প্রভাতবাবুর একনিষ্ঠ বিশ্বস্ততা তাঁকে জনপ্রিয় ও প্রতিষ্ঠিত করে তুলেছিল।

রবীন্দ্রনাথ যখন প্রগতিবাদী হিসাবে চিহ্নিত এবং রক্ষণশীল লেখককুল তাঁকে তীব্রভাবে সমালোচনা করেছিলেন সেই সময়ই সবুজপত্র ও ভারতীগোষ্ঠী রবীন্দ্র-অনুগামী হিসাবে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রগতিবাদের ধারাটিকে প্রবহমান রাখার চেষ্টায় নিয়োজিত ছিল। রক্ষণশীলতা থেকে সাহিত্যকে মুক্ত করে তোলার জন্য সেই সময় বাংলার নব্য লেখককুল সাহিত্যের আসরে জাত মত শ্রেণী নির্বিশেষে মানুষকে সাহিত্যের উপকরণ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। রবীন্দ্র-স্নেহধন্য অধ্যাপক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই 'ভারতী' পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি একদিকে যেমন রবীন্দ্রনাথের প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন আবার অন্যদিকে বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে ব্যাপক পরিচয় থাকায় সেই প্রভাবকেও নিজের রচিত সাহিত্যে গ্রহণ না করে পারেন নি। ফলে রবীন্দ্র সাহিত্যের সৌন্দর্যচেতনা ও রোমান্টিক লক্ষণ যেমন চারুচন্দ্রের সাহিত্যে দেখতে পাওয়া যায় আবার ঠিক তেমনি বিশ্বসাহিত্যের অনুপ্রেরণায় নরনারীর যৌন সম্পর্কের বিশ্লেষণও তাঁর সাহিত্যে লক্ষণীয়। এই দুটি দৃষ্টিভঙ্গীর সম্মিলিত রূপ তাঁর কথাসাহিত্যে শিল্পসম্মত সামঞ্জস্য লাভ করে নি। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্যে প্রগতিশীল আদর্শ নিয়ে যে সব চরিত্র সৃষ্টি করেছেন তারা রক্তমাংসের মানুষ না হয়ে প্রথা ও সংস্কারের বিরুদ্ধাচরণ করার যন্ত্রবিশেষে পরিণত হয়েছে। তাদের মধ্যে যেটুকু মানবিকতা উঁকিঝুঁকি দিয়েছে তাও যেন আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যই রচিত হয়েছে। তাঁর রচিত এই জাতীয় আদর্শবাদী নায়কদের জননীরাও পুত্রের বিচিত্র আচরণে অতিরিক্ত সহনশীল, আর নায়িকাদের পিতারা সহিষ্ণুতার শেষ সীমায় পৌঁছেও প্রস্তরের মত মৌন থাকতে পারেন। ফলে দেখা যায় চারুবাবুর কাহিনীতে এক আশ্চর্য রকমের

অবিশ্বাস্য ইচ্ছাপূরণ বার বার সংঘটিত হয়েছে। কাহিনীর উপকরণ হিসাবে চারুচন্দ্র সচেতনভাবে যত বস্তুনিষ্ঠ ঘটনাই গ্রহণ করে থাকুন না কেন তা কখনোই তাঁর রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গীকে অতিক্রম করতে পারে নি। মনে হয়, তাঁর বাস্তব চেতনা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপর যথোচিতভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল না।

প্রচলিত সমাজের সীমাবদ্ধতার উৎপীড়নে সৃষ্ট নরনারীর সমাজ-নিষিদ্ধ প্রেম বা দেহাশ্রিত প্রেমকে আশ্রয় করেও চারু বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাস রচনা করেছেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে সাহসিকতার জন্য স্মরণীয় হয়ে আছে, যদিও এইসব চরিত্র তাঁর হাতে কখনো বাস্তবানুগ হয়ে ওঠেনি, বরঞ্চ অনেক বেশী মাত্রায় কাল্পনিক হয়ে উঠেছে।

চারুবাবুর 'পঙ্কতিলক' [১৯১৯] উপন্যাসে সমাজ-বিদ্রোহিনী নায়িকা আভার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এই কাহিনীতে পরকীয়া প্রেম ও দেহজ কামনা আলোচিত হলেও নায়ক-নায়িকা আভা ও গোবিন্দর আচরণ চরম রোমান্টিক আদর্শেই বিন্যস্ত হয়েছে। গোবিন্দকে আভার সঙ্গে কোনরকম দৈহিক সম্পর্কে তিনি জড়ান নি। গোবিন্দের পবিত্র আদর্শ এভাবেই রক্ষিত হয়েছে এবং গোবিন্দ যেন আদর্শের প্রতীক হিসাবেই রচিত। আবার অন্যদিকে আভা ও নরেন্দ্রর দৈহিক সম্পর্ক অত্যন্ত আকস্মিক। এই ঘটনা যেন প্রচলিত নীতির প্রতিবাদ করার জন্যই সংঘটিত, যেহেতু এর পিছনে কোনো জোরাল কারণ বা বিশ্লেষণ নেই। 'রূপের ফাঁদে' [১৯২৫] কাহিনীর মধ্যে জাত ও বর্ণের বিরুদ্ধাচরণ দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু ঘটনার বাহুল্যে উপন্যাসটি রোমান্সে পরিণত হয়েছে। এই কাহিনীটি সামাজিক উপন্যাসের ঢঙে রচিত হলেও, গুটিকয়েক চরিত্র ছাড়া, সমাজের কোনো বাস্তবানুগ বর্ণনা নেই। প্রগতিশীল জলধরবাবু, জলধরবাবুর শান্ত সংযত কন্যা ধীরা এবং সরল দোকান কর্মচারী অনাথ ছাড়া প্রতিটি চরিত্রই অবাস্তব। জলধরবাবুর ছোট মেয়ে নীরা, ধনীপুত্র প্রচুরের ভালোবাসা ও পিতার স্নেহ ও স্বাধীনতা পেয়েও অনায়াসে গৃহত্যাগ করেছে কেন—এর কোনো ব্যাখ্যা কাহিনীতে নেই। জাতবর্ণপদবীহীন ডাক্তার বনবিহারীর আচরণও অদ্ভুত। তার চরিত্রটি কোন স্পষ্ট রূপ নেয় নি। ধীরার ডাক্তার বনবিহারীর প্রতি ভালোবাসার কোনো বিশ্লেষণ নেই। বনবিহারীর অন্তর্ধান ও ধীরার এলাহাবাদে চাকুরী নিয়ে চলে যাওয়া যেন সকল সমস্যার এক সহজ সমাধান। নদীবক্ষে ষ্টীমার থেকে অনাথের নীরাকে উদ্ধার করা, মদনবাবুর ফুল দিয়ে কার্পেটসজ্জা, 'পরীর বাড়ী', 'জলতরঙ্গ ষ্টীমার' সবই আমাদের এক কল্পনার জগতে নিয়ে যায়। 'দোটানা' [১৯২০] উপন্যাসে হৈমবতীর জীবনের সমস্যা, তরলের সঙ্গে তার প্রণয়লীলা, গোবর্ধনকে বিয়ে করা এবং শেষ পর্যন্ত তার আত্মহত্যা সবই আকস্মিকভাবে ও চমক নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। এই কাহিনীর মধ্যে যতটা বিশ্লেষণের সুযোগ ছিল লেখক যেন তা তুলে ধরতে সচেষ্ট ছিলেন না।

বাংলা উপন্যাসের প্রায় পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস আলোচনা করে আমরা দেখতে

পেলাম যে, বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ এবং সমসাময়িক প্রায় সকল সাহিত্যিকবৃন্দ উপন্যাসে একটা প্রথাসিদ্ধ আদর্শকে রূপদান করার চেষ্টা করেছেন। এই আদর্শ প্রতিষ্ঠার পিছনে ছিল কমবেশী রোমান্স প্রবণতা ও আদর্শবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর অভিব্যক্তি। আদর্শকে প্রাধান্য না দিয়ে নির্মম বাস্তবকে উপন্যাসে উপস্থাপনা করার আগ্রহ এই পর্যায় পর্যন্ত অনুপস্থিত ছিল এবং বাংলা কথাসাহিত্যে যতটুকু বাস্তবতার নিদর্শন সে সময়ে দেখতে পাওয়া যায় তা কখনোই লেখকদের রোমান্টিক আত্মাভিমানকে অতিক্রম করতে পারে নি। ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের পর বাংলা উপন্যাস ধীরে ধীরে প্রবল আদর্শবাদী ঝোঁক পরিহার করে বাস্তবতার দিকে পা বাড়াল। সাহিত্যের এই বাস্তবতার অভিযানে সে সময় যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন এবং নেতৃত্ব দান করেছিলেন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ছিলেন তাঁদের প্রথম সারির অন্যতম সুস্পষ্ট ব্যক্তিত্ব।

তিন : রাজনীতি

সাহিত্য পাঠকমাত্রই জানেন যে, কোনো কালেই সমাজকে বাদ দিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব নয়। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যে ঈশ্বর প্রেম, ধর্ম ও আধ্যাত্মিক বিষয়বস্তু প্রাধান্য লাভ করলেও আমরা সেখানেও সামাজিক রীতিনীতির সুস্পষ্ট পরিচয় পাই। মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে যে সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবলীর আভাস ও উল্লেখ রয়েছে তাও দ্বিধাহীনভাবে স্বীকার করতে হয়। আর কথা সাহিত্যে সমাজ জীবনের প্রাধান্য তো অপরিহার্য। তাই কোনো একটি বিশেষ কালের কথাসাহিত্য আলোচনার পূর্বে আলোচ্য কালসীমার সামগ্রিক পশ্চাৎপট বিশ্লেষণ একান্ত প্রয়োজন।

মঙ্গলকাব্যের যুগে মানুষের মনে যে অস্বস্তি ও নিরাপত্তার অভাববোধ বাসা বেঁধে ছিল তার অন্যতম কারণ রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অরাজকতা। সেদিনের মানুষ যুক্তি দিয়ে এর সমাধান খুঁজে পায়নি। দেবদেবীর আরাধনার মধ্যেই তারা সান্ত্বনা খুঁজে-ছিল। মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত এই সব দেবদেবীর চরিত্র উদাসীন, নিষ্ঠুর এবং খেয়ালী। সে যুগের রাষ্ট্রপ্রধানদের চরিত্রও ছিল তাই। মঙ্গলকাব্যের এই ধারা চলে এসেছে প্রায় রামপ্রসাদ-ভারতচন্দ্রের আমল পর্যন্ত। এর কিছু পরবর্তীকালে ঈশ্বর গুপ্তের সাহিত্যে আমরা দেখতে পেলাম ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজ, নারীশিক্ষা ও নারী প্রগতি সম্পর্কে তাঁর রক্ষণশীল বক্তব্য। এর কারণ অবশ্য সমাজের দ্রুত ও স্পষ্ট রূপান্তর যার প্রধান দুটি ঘটনা হচ্ছে ইংরাজী শিক্ষার প্রসার এবং নারী প্রগতি, যা সেযুগে অনেককেই দ্বিধাগ্রস্ত করেছিল।

আবার প্রায় সেই কালেই প্রচারিত হয়েছিল রাজা রামমোহন রায়ের নব্য ধর্মাদর্শ এবং শুরু হয়েছিল বাংলার নবজাগরণের ইতিহাস। অথচ তখনও সংস্কৃতিবান শিক্ষিত নাগরিকবৃন্দ ইংরাজদের আদব কায়দা রপ্ত করার অনুশীলনে সর্বদাই ব্যস্ত থাকত। শিক্ষিত বাঙালীকুলের ইংরাজদের প্রতি এই অন্ধ অনুরাগ লক্ষ্য করে ইংরাজরা তাদের

নানাবিধ কৌশল ও প্রচেষ্টায় একটি উচ্চ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিল। এই উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংস্কৃতিই উনবিংশ শতাব্দীর বাবু-সংস্কৃতি, যার কিছু পরিচয় পাওয়া যায় উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যে। এই সংস্কৃতি ছিল সম্পূর্ণ নগরভিত্তিক। আবার সেই একই কালের পটভূমিতে দুটি ভিন্ন গোষ্ঠীর সহাবস্থানও লক্ষণীয়। ফলে দেখা গেল যে একটি শ্রেণী তাদের সামন্ততান্ত্রিক মেজাজ ও ঐশ্বর্য নিয়ে টি'কে আছে আবার অন্যদিকে শিক্ষা ও কর্মের অনুপ্রেরণা লাভ করে জন্ম নিয়েছে মধ্যবিত্ত মানুষ ও বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী, যারা জমিদারী প্রথা ভাঙনের ফলে অর্থনৈতিক কারণে সাধারণ মানুষের শ্রেণীতে এসে পৌঁছেছে। এই মধ্যবিত্ত মানুষের দান হলো সেযুগের সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ, যে সাহিত্যের বিষয়বস্তু তাদের নিকট অতীত জীবনেরই আত্মসমালোচনা।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে দেখা দিয়েছিল এক ধরনের পরস্পরবিরোধী চিন্তাভাবনা, যার মূলে ছিল একদিকে ইংরাজপ্রীতি ও অন্যদিকে বাঙালীয়ানা তথা হিন্দু-ঐতিহ্য। ইতিমধ্যে উনবিংশশতকী বাবু বিলাস ত্যাগ করে বাংলা সংস্কৃতি ও সাহিত্য আত্ম-সচেতন মধ্যবিত্তের হাতে এসে পড়েছে, কিন্তু সাহিত্যের বিষয়বস্তুতে সামন্ততান্ত্রিক কৌলীন্য মোটেই লোপ পায়নি। এর কারণ আভিজাত্যের অহংকার নিয়ে জমিদার-শ্রেণী তখনও তাদের প্রতাপ অক্ষুণ্ন রাখতে পারছিল আর শহরে অভিজাত সম্প্রদায় বিদেশীয়ানায় প্রভাবিত এক স্বতন্ত্র শ্রেণীতে পরিণত হয়েছিল। আর সবচাইতে আশ্চর্য যে তৎকালীন সংস্কৃতিবান ও শিক্ষিতদের হাতে তখন পর্যন্ত বাংলা সাহিত্য পরিবেশিত হওয়ার মর্যাদা লাভ করেনি। এইসব প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও কিন্তু বাংলা সাহিত্য-প্রবাহ বিন্দুমাত্র ক্ষীণ হয়নি। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবদ্দশাতেই 'দুর্গেশনন্দিনী'র তেরটি সংস্করণ এবং 'মৃণালিনী'র দশটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। সেযুগের বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয়তার এ দুটি জীবন্ত উদাহরণ।

বিশ শতকের প্রথমদিকে দেখা গেল যে বাইরের ঘটনাবলী যত বিচিত্রতা নিয়ে সম্প্রসারিত হয়েছে, সে তুলনায় সাহিত্যে তত বৈচিত্র্য দেখা দেয়নি। এই সংকোচনের কারণ বাঙালীর আত্মমুখীনতা যেটা সেযুগের নির্বিরোধ বাঙালীর জাতীয় বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। স্বাভাবিক কারণেই তারা অর্থনীতির সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক অনুধাবন করতে পারে নি এবং পুঁজিবাদ যে শোষণের যন্ত্র তাও তাদের চিন্তায় স্পষ্ট ছিল না যদিও অভাব অভিযোগ এবং দারিদ্র্য তখনও বাঙালী জাতিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এর আরো একটা স্পষ্ট কারণ হচ্ছে যে তৎকালীন জমিদার বা বিত্তশালীদের অনুদান ও কৃপা থেকে দুঃস্থ মানুষ তখনও সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয় নি এবং সেযুগের ধর্মীয়বোধ ও বিশ্বাস সমাজ সচেতন মানুষ হিসাবে বাঙালী জাতিকে দলবদ্ধভাবে কোন সংগ্রামের পথে নিয়ে যেতে পারে নি। এমন কি সাহিত্যের মধ্য দিয়েও নয়। কেননা ব্যক্তিগত অভাববোধ তাদের মধ্যে দানা বাঁধলেও একটা সামগ্রিক অভিযোগের পর্যায়ে তা তখনো পৌঁছাতে পারে নি, তাদের চেষ্টাটুকু তাই সীমিত থেকেছে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার দায়ে।

এই মানসিকতার ফল-স্বরূপ ক্রমে ক্রমে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও সাধারণ মানুষের সম্পর্কের মধ্যে একটা ব্যবধান স্পষ্ট হয়ে উঠলো। কৃষিজীবী মানুষের দাবি দাওয়ার ন্যায্যতা সেযুগের মধ্যবিত্তশ্রেণী নীতিগতভাবে মেনে নিতে পারে নি, এর পিছনের কারণ অবশ্যই জমিদারী আভিজাত্যের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা, মমতা ও আনুগত্যবোধ এবং কিছুটা 'বাবু' প্রবণতা। কিন্তু এই জমিদার ও বিত্তশালীদের শোষণের আগুনের তাপ ক্রমশঃ মধ্যবিত্তশ্রেণীর গায়ে এসেও জ্বালা ধরালো। ফলে জমিদার ও বিত্তশালীদের কাছ থেকে মধ্যবিত্ত মানুষও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো।

আমরা জানি, আমাদের সব দেশে সমাজের শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছিল বর্ণ ও জাতের ভিত্তিতে। এই নির্ধারণে স্থূলভাবে দুটি শ্রেণী স্পষ্ট রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে, যেহেতু বর্ণ ও জাতের সঙ্গে বিত্তের সম্পর্ক প্রায় অচ্ছেদ্য ছিল। সামাজিক সুযোগ সুবিধা ভোগ করত প্রথমদল উচ্চবর্ণ ও উচ্চবিত্তের ক্ষমতায় আর দ্বিতীয় দল ছিল সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। বাংলা সাহিত্য তখন অনেক দূর এগিয়ে গেলেও এই মৌলিক বৈষম্য সম্পর্কে সাহিত্য তখনও যথেষ্ট সচেতন হয়নি। এর প্রমাণ সেযুগের সাহিত্যে রাজারাজড়ার কাহিনীর বাহুল্য।

১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দের 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' বা ১৮৮৫ সালের 'বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন' অথবা ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দের 'বঙ্গীয় চাষীখাতক আইন-এ জমিদার ও চাষীদের সম্পর্ক ও সমস্যার কিছুটা বিন্যাস হলেও তা পুরোপুরি কার্যকর হয়নি এবং চাষী সম্প্রদায় তাদের দুঃখ দারিদ্র্য থেকে বিন্দুমাত্র রেহাই পায় নি। আর তাছাড়া বর্ণ ও ধর্ম বৈষম্যও তাদের অনেক দিক দিয়ে পঙ্গু করে রেখেছিল পরবর্তীকালে কিন্তু এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল বুদ্ধিজীবী বাঙ্গালী, যার নজির রয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'অচলায়তন' [১৯১২] এবং 'চণ্ডালিকা'য় [১৯৩৭]।

রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' [১৯০৩] প্রকাশকালের কিছু পরে, বাঙ্গালী ঐক্য চেতনার মূলে এক দারুণ আঘাত হেনেছিল বৃটিশদের বঙ্গভঙ্গ করার সংকল্প। চোখের বালিতে বর্ণিত সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক জীবনযাত্রায় নিস্তরঙ্গ ও আত্মমুখীনতায় অভ্যস্ত বাঙ্গালী ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে কিন্তু চুপ করে থাকতে পারে নি। দলে দলে বাঙ্গালী সেদিন এগিয়ে এসেছিল বঙ্গভঙ্গ রদ করার আন্দোলনকে সমর্থন করতে। সম্পূর্ণ রাজনৈতিক একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাঙ্গালী উপলব্ধি করতে পেরেছিল বৃটিশদের এই বিচ্ছিন্নতাবাদের নীতি। এর পিছনে কারণ ছিল হয়ত বাঙ্গালী জাতির স্বাজাত্যবোধ ও জাতীয়তাবাদী চেতনা যে চেতনা গড়ে উঠেছিল বাংলার পূর্ববর্তী ঘটনাবলীর ঐতিহ্যে এবং বাঙ্গালী মানসে চিন্তার খোরাক যুগিয়েছিল, সমসাময়িক কিছু সংগঠন ও সাময়িক পত্রিকা।[১]

১৯০৪ সালে রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। কলকাতার 'শিবাজী উৎসব'-এ রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটি পাঠ করেন, যদিও সেই উৎসবের উদ্দেশ্যের সঙ্গে তিনি সম্পূর্ণ একমত ছিলেন না। এর কারণ শক্তি সাধনা ও সাম্প্রদায়িকতাকে

তিনি কখনোই মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারেন নি এবং একথা অস্বীকার করা যায় না যে 'শিবাজী উৎসব' পালনের নেপথ্যে সাম্প্রদায়িকতা, শক্তি সাধনা ও জাতীয়তাবাদ প্রেরণা জুগিয়েছিল।

১৯০৫ সালের অক্টোবর মাসে বঙ্গ-ভঙ্গের বিরুদ্ধে যে 'রাখী বন্ধন'[২] উৎসব পালিত হয়, সেই জনসভায়ও রবীন্দ্রনাথ এক প্রতিজ্ঞাপত্র পাঠ করেন। সেই সময় স্বদেশে উৎপন্ন দ্রব্য সামগ্রীর শিল্প ও ব্যবসার উন্নতির জন্য রবীন্দ্রনাথ 'ভাণ্ডার' নামে এক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। অর্থাৎ স্বদেশী আন্দোলনের পারিপার্শ্বিকতা থেকে রবীন্দ্রনাথ সরে থাকতে পারেন নি বরং সেই আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন। আবার সেই সময়েই ছাত্রদের স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান নিষিদ্ধ করার জন্য সরকার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন তার বিরুদ্ধে তিনি জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনের আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণে অগ্রণী হয়েছিলেন।

ভারতীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেই সময় প্রকাশ লাভ করে 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকা, প্রতিষ্ঠিত হয় ডন সোসাইটি ও বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ। আবার সেই বছরই ঢাকায় সলিমুল্লার গৃহে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা লাভ করে ও নৌরজীর সভাপতিত্বে কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশন হয়। কিন্তু ১৯০৭ সালে সুরাট কংগ্রেস অধিবেশনে নানা জটিলতা ও মতবাদ সৃষ্টি হয় এবং ভারতীয় রাজনীতিতে দুটি ভিন্ন আদর্শ চিহ্নিত হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু চরমপন্থী ও নরমপন্থী এই দু'দলের কোন দলকেই সমর্থন করতে পারেন নি। নৌরজীর সভাপতিত্বে কলকাতার কংগ্রেস অধিবেশনের পর থেকেই এই বিভেদ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ দু'দলের মিলন ঘটানোর চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু সে চেষ্টাও নিষ্ফল হয় এবং পরবর্তী সুরাট কংগ্রেস পণ্ড হয়ে যায় এই দু'দলের বিরোধিতায়। রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক জগৎ থেকে বেশ কিছুটা সরে দাঁড়ালেন। রাজনীতির মধ্যে অন্ধ ধর্মবোধ ও সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী রবীন্দ্রনাথকে আহত করেছিল এবং রাজনীতির প্রত্যক্ষ জগতে তিনি আর ফিরে আসেন নি। এই সব তুচ্ছাতিতুচ্ছ কলহ ও বিভেদ থেকে মুক্তির উপায় অন্বেষণ করতে গিয়ে তিনি এক নতুন আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে উঠলেন এবং 'গোরা' (১৯১০) উপন্যাসের মধ্য দিয়ে এই নবলব্ধ আদর্শটি তুলে ধরতে চেষ্টা করলেন।

ভারতীয় রাজনীতির চরম ও নরমপন্থী কোন দলকেই রবীন্দ্রনাথ সমর্থন করতে পারেন নি তার অন্য একটি কারণ হলো চরমপন্থীদের গুপ্তহত্যা, ডাকাতি ও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ আর অন্যদিকে নরমপন্থীদের সাধারণ মানুষের সঙ্গে সম্পর্কের দূরত্ব। রবীন্দ্রনাথের এই মনোভঙ্গী লক্ষণীয় তার 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬) উপন্যাসে। ১৯০৭ সালের ধারেকাছেই রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ালেও, তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী শুধু 'গোরা' বা 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসেই নয়, কথাসাহিত্যে তাঁর এই সম্পর্কিত চিন্তার বিস্তৃতি প্রসার লাভ করেছে 'চার অধ্যায়' (১৯৩৪) উপন্যাস পর্যন্ত [রাজনৈতিক প্রবন্ধ বাদ দিয়ে]। তাই একথা বোধ হয় ভুল হবে না যে অধ্যাত্মবাদী দার্শনিক

রবীন্দ্রনাথও দেশকালের সমসাময়িক ঘটনাবলীকে উপেক্ষা করতে পারেন নি। কোন কালে কোন সাহিত্যিকই তা পারেন না।

'গোরা' (১৯১০) উপন্যাস প্রকাশের কিছু আগে থেকে বাংলার তিন স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতা স্বতন্ত্র চিন্তাধারায় নিজ নিজ অনুসৃত মত অনুযায়ী তাঁদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছিলেন।[৩]

সুরাট অধিবেশনে (১৯০৭) নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের বিরোধে কংগ্রেসে ফাটল ধরে। কংগ্রেসের নেতৃত্ব থেকে চরমপন্থীরা সরে দাঁড়ায়। এদিকে বৃটিশরাজের কৌশলের ফলে লজপৎ রায় ও বিপিনচন্দ্র পাল এদেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। ১৯০৮ সালে মুরারীপুকুর বোমার মামলায় অরবিন্দ ধৃত হন এবং তিলকও কারারুদ্ধ হন। মামলা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার পর অরবিন্দ রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ান ফলে চরমপন্থী অস্তিত্ব অনেকটা সংকুচিত হয়ে পড়ে এবং কগ্রেসও অনেকটা শক্তিহীন হয়ে পড়ে। বৃটিশরাজের দমনমূলক কর্মতৎপরতা ভারতীয় আন্দোলনের আবহাওয়াকে অনেকটা স্তিমিত করে তোলে। মোটকথা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বেশ একটা নিস্তরঙ্গতা দেখা দেয়। এই সময়ই চিত্তরঞ্জন দাস অরবিন্দের বোমার মামলার সূত্রে প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন [১৯০৮]।

প্রথম জীবনে চিত্তরঞ্জন দাশ ছিলেন সাহিত্যসেবী। ১৮৯৩ সালে আইন ব্যবসায়ে যোগ দিলেও নিয়মিত সাহিত্যচর্চার সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। চিত্তরঞ্জনের জন্ম হয়েছিল ব্রাহ্ম পরিবারে, তবু চৈতন্যদেবের 'জীবে দয়ার' নীতিটিকে তিনি চিন্তায় ও সাধনায় গ্রহণ করেছিলেন। সে যুগের দুজন মহাপুরুষ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও ব্রজেন্দ্রনাথ শীল নিঃসন্দেহে তাঁর উপর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, আর বৈষ্ণব সাহিত্য তাঁকে কাব্য রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। পরবর্তী সময়ে হিন্দু ধর্মের রক্ষণশীলতা নিয়েই প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর 'নারায়ণ' পত্রিকা।

১৯০২ খ্রীস্টাব্দে অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাকালে চিত্তরঞ্জন কিছুদিনের জন্য সেই সমিতির সহসভাপতি ছিলেন এবং বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের কিছু পরে একজন সাধারণ সভ্য হিসাবে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন (১৯০৬), যদিও তখন তিনি অধিকাংশ সময়ই ব্যস্ত থাকতেন সমাজসেবা ও সাহিত্যচর্চা নিয়ে। এ সময় থেকেই কংগ্রেসের মধ্যে দেখা দিয়েছিল নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে মতের অমিল। আর অন্যদিকে তখন রাজ্যব্যাপী সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই সব ঘটনাকে স্তব্ধ করার জন্য সরকারী দমননীতি প্রবল হয়ে ওঠে। ফলে বহু সংগ্রামী কর্মীদের কারাবরণ বা নির্বাসন গ্রহণ করতে হয়। দেশের রাজনীতিতে গান্ধীজী তখনও প্রতিষ্ঠালাভ করেন নি লাল-বাল-পাল অনুপস্থিত, অরবিন্দ রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন, স্বাধীনতা আন্দোলনের এক নিস্তরঙ্গ অবস্থা। এই অবস্থা চলে প্রায় ১৯১৭ সাল পর্যন্ত।

এই সময় অ্যানি বেসান্তের (১৮৪৭-১৯৩৩) উপর ব্রিটিশ সরকারের অন্তরীণ

আদেশ জারি হলো। চিত্তরঞ্জন দাশ তখন পুরোপুরি রাজনীতিতে যোগ দিয়েছেন, তাঁর নেতৃত্বের উপর দেশবাসীর তখন অনেক আশা। ইতোমধ্যে ভারতের জাতীয় চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গীর অনেকটা পরিবর্তন দেখা দিয়েছে, স্বাধীনতা আন্দোলনের মত ও পথও বদলেছে। প্রথম মহাযুদ্ধের [১৯১৪—১৯১৮] কাল অতিক্রান্ত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিয়েছে মণ্ট-ফোর্ড শাসনসংস্কার [১৯১৮] এই সময় দক্ষিণপন্থী মডারেট দলের শক্তি ক্ষীণতর হলেও সুরেন ব্যানার্জী এই শাসন সংস্কার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। সেই সময়ই [১৮ই মার্চ, ১৯১৯] ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনকে খর্ব করার জন্য এবং রাজদ্রোহ দমন উদ্দেশ্যে রাউলাট বিল বিধিবদ্ধ করলো। কিন্তু এজন্য স্বাধীনতা আন্দোলন স্তিমিত তো হলই না, বরঞ্চ এই বিলের বিরুদ্ধে এক তীব্র জনমত সংঘটিত হলো। ঐ বছরই এপ্রিল মাসে ইংরাজ সরকারের নির্দেশে জালিয়ানওয়ালা-বাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটলো প্রতিটি ভারতবাসী সেদিনের সেই হত্যাকাণ্ডকে ধিক্কার জানিয়েছিলেন।

মণ্ট-ফোর্ড সংস্কার, রাউলাট বিল, ও জালিয়ানাওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড ভারতবাসীকে স্বাধীনতা আন্দোলন তীব্রতর করার জন্য নতুন ভাবে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল। চিত্তরঞ্জন দাশ ও গান্ধীজী যুগ্মভাবে এই আন্দোলন পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছিলেন। ১৯২০ সালে শুরু হয় খিলাফৎ আন্দোলন এবং তার কিছু পরে অসহযোগ আন্দোলন। ১৯২১ সালে চিত্তরঞ্জন কারারুদ্ধ হলেন, অসহযোগ আন্দোলন তীব্র আকার নিয়ে দেশময় ছড়িয়ে পড়লো, যদিও সেযুগের কিছু বুদ্ধিজীবী মানুষ গান্ধীজীর এই আন্দোলনে পরিপূর্ণভাবে সাড়া দিতে পারেন নি। বিপিনচন্দ্র পালের সঙ্গে গান্ধীর, এই অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ব্যাপার নিয়ে মতভেদ দেখা যায়। ১৯২১ সালে বরিশাল সম্মেলনে বিপিনপালের এই গান্ধী বিরোধী মনোভাবের জন্য তাঁকে প্রচণ্ড বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয় অথচ ১৯২২ সালে গান্ধীজি যখন চৌরচৌরার ঘটনায় আন্দোলন প্রত্যাহার করলেন তখন আবার অনেকেই এই ব্যাপারটিকে মেনে নিতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথের কাছেও সে সব আন্দোলন সায় পায়নি যেহেতু এই সব আন্দোলনের পিছনে ছিল সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী ও আত্মঘাতী জাতীয়তাবাদ, যার জলন্ত প্রমাণ প্রথম মহাযুদ্ধ এবং তার ফলস্বরূপ বিশ্বব্যাপী অবক্ষয়ের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা।

১৯২১ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের অনুগামী হিসাবে সুভাষচন্দ্র বসু রাজনীতিতে প্রবেশ করেন এবং ক্রমে গান্ধীজীর সান্নিধ্যে আসেন। ১৯২২ সালে চিত্তরঞ্জন, যে স্বরাজ্য পার্টি গঠন করেন সে ব্যাপারে সুভাষচন্দ্র ছিলেন তাঁর যোগ্য প্রধান সহকারী। সুভাষচন্দ্র ক্রমশঃ জনপ্রিয় নেতা হয়ে উঠেছিলেন এবং প্রকাশ্যে সন্ত্রাসবাদীদের নিন্দা করলেও সন্ত্রাসবাদীদের বীরত্বপূর্ণ কার্যকলাপে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। ফলে তাঁকে ইংরাজ সরকার বিপজ্জনক ব্যক্তি হিসাবে সুদূর বর্মাদেশে নির্বাসিত করেন [১৯২৫]।

ঊনিশ শতকের শেষার্ধে এবং বিশ শতকের প্রথমার্ধে রাজনৈতিক ও সামাজিক উভয় দিক দিয়েই ইতিহাস খুব দ্রুত এগিয়ে চলেছে এবং বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত

হয়েছে। ফলে বুদ্ধিজীবী বাঙ্গালী কখনোই নিরাসক্ত ও নিরুদ্বেগ থাকতে পারে নি। আবার, অন্যদিকে এই আন্দোলন উত্তাল ঘটনাক্রান্ত কালেই গ্রামবাংলার মানুষের জীবন চলছিল অতি সাধারণভাবে, তারা নিজেদের ছোটখাট সুখদুঃখ নিয়ে দিন কাটাচ্ছিল। অত্যাচারিত হচ্ছিল স্বেচ্ছাচারী জমিদারদের হাতে, নিগৃহীত হচ্ছিল তথাকথিত ধর্মের বাহক ব্রাহ্মণ শ্রেণীর হাতে। তার ভাবনায় ছিল সংস্কার আচ্ছন্ন, বিশ্বাসী ছিল দেব-দেবীর কৃপায়, আস্থাশীল ছিল ভাগ্য ও বিধিলিপিতে। স্বাধীনতা, স্বরাজ বা মুক্তি তাদের কাছে ছিল এক আশ্চর্য বস্তু কেননা এর স্বরূপ উপলব্ধি করার মত যথেষ্ট শিক্ষা এবং বোধ তখনও তাদের আয়ত্তাতীত। ব্রিটিশরাজের করুণা থেকে বঞ্চিত হবার কথায় এরা শিহরণ অনুভব করত। যদিও এর যে ব্যতিক্রম ছিল না তা নয়, তবে সেদিনের কৃষক বা শ্রমিকশ্রেণী তাদের অধিকার সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিল ন। কিছু শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত চিন্তাশীল নাগরিকদের চেতনার মধ্যেই স্বাধীনতার আকাংক্ষা ছিল সীমাবদ্ধ। মোট কথা গ্রাম ও শহরের মানুষের মধ্যে চিন্তাভাবনার একটা বড় রকমের বৈসাদৃশ্য বর্তমান ছিল যদিও কিছু কিছু বুদ্ধিজীবী মানুষের চেষ্টায় স্বাধীনতা আন্দোলনের ঢেউ গ্রামান্তের মুষ্টিমেয় মানুষের কাছেও কিছুটা সাড়া জাগিয়েছিল।

সেযুগে গ্রাম কিংবা নগরের সাধারণ মানুষের পক্ষে স্বাধীনতা অভিলাষে সার্বিক গণ আন্দোলনে যোগ না দেওয়ার অন্যতম কারণ ছিল ধর্মের প্রতি একান্ত আনুগত্য ও অন্ধবিশ্বাস। এই বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যুক্তি তাদের চেতনায় কখনোই দানা বাঁধতে পারে নি। স্বরাজ ও স্বাধীনতা আন্দোলনের উত্তাল দিনে তাই কখনোই সামগ্রিকভাবে তাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ সম্ভব হয় নি। চিন্তাশীল যে সব ব্যক্তি নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁদের চিন্তাভাবনা ও উপলব্ধি জনসাধারণের মধ্যে পৌঁছে দিতে পেরেছিলেন তাদের অনেকের বক্তব্যেই আধ্যাত্মিকতার প্রাবল্য ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দুনিষ্ঠ ঐতিহ্য থেকে তারা খুব বেশী সরে আসতে পারেননি—গীতা ও শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ ও চরিত্র তাদের ধ্যানধারণায় অনেকখানি জুড়ে ছিল। আবার ব্রাহ্মধর্মের প্রভাবও নাগরিক জীবনে এক নতুন উদ্দীপনা নিয়ে এসেছিল। তাই সেযুগে খুব প্রত্যক্ষভাবে না হলেও ব্রাহ্ম ও হিন্দুদের মধ্যে একট পরোক্ষ প্রতিযোগিতা বর্তমান ছিল।

বাঙ্গালী জীবনে চৈতন্য ভাবধারাকে নবপর্যায়ে সঞ্চারিত করতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এগিয়ে এসেছিলেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী [১৮৪১-১৮৯৯]। সেযুগের হিন্দুধর্মের ভাঙ্গন ও বিচ্ছিন্নতাকেই তিনি শুধু রোধ করতে সমর্থ হন নি, উপরন্তু তৎকালীন জননেতাদের মধ্যে আধ্যাত্মিক চিন্তা সঞ্চারিত করতে পেরেছিলেন। মানবতা, সততা, ন্যায়নিষ্ঠা ও আধ্যাত্মিক চিন্তার মধ্যেই যে দেশের মুক্তি ও ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার বীজ লুকানো আছে তাঁর এই মতবাদ অনেকেই গ্রহণ করেছিলেন; যেমন অশ্বিনীকুমার দত্ত [১৮৫৬-১৯২৩], মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা [১৮৫৮ ১৯১৯], সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় [১৮৬৫-১৯৪৮], বিপিনচন্দ্র পাল [১৮৫৮-১৯৩২] ও চিত্তরঞ্জন দাশ [১৮৭০-১৯২৫]।

আবার দর্শনশাস্ত্রের পণ্ডিত ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের [১৮৬৪-১৯৩৮] প্রেরণাতেও সেযুগের অনেকেই ছিলেন উদ্বুদ্ধ।

অতএব একথা খুবই স্পষ্ট যে ইংরাজী শিক্ষিত বাঙ্গালীর চিন্তার মধ্যে বিজ্ঞানের ভিত্তি থাকলেও তা কখনোই ধর্ম, আধ্যাত্মিক চিন্তা বা ভারতীয় দর্শনকে অতিক্রম করে অগ্রসর হতে পারে নি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য অরবিন্দ পরিচালিত সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যে শক্তি পূজার প্রচলন—যদিও এই ধর্মীয় আদর্শকে তারা বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তি দিয়ে দৃঢ়তর করার প্রয়াসী ছিলেন। সে যুগের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে ধর্মপ্রাণ ভারতবাসী বা বাঙ্গালী কখনোই ধর্মের অনুপ্রেরণা সঞ্জাত নয় এমন কিছুর সঙ্গে মনেপ্রাণে সামিল হতে পারে না। ভারতবাসীদের মধ্যে এই ধর্মীয় মনোভাব লক্ষ্য করেই পরবর্তীকালে ব্রিটিশ শাসক সম্প্রদায় বাংলাদেশে ধর্মীয় বিভেদ সৃষ্টি করার চক্রান্তে তৎপর হয়েছিল এবং হিন্দু মুসলমানদের কলঙ্কময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় উৎসাহিত করতে সমর্থ হয়েছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন মধ্যপন্থী ভাবধারায় পরিচালিত হচ্ছিল। ব্রিটিশ সরকারের কাছে আবেদন নিবেদন করে ভারতবর্ষ তার আশাপ্রদ স্বাধীনতা লাভ করবে এমন একটা বিশ্বাসও সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল, বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে ব্রিটিশদের বদান্যতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ ছিল না। তখন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন গান্ধীজী এবং তিনি চিরজীবন অহিংস আন্দোলন করে গেলেও এই যুদ্ধে ব্রিটিশদের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন। অবশ্য ইতিপূর্বেই ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে কথা হয়েছিল যে ভারতবাসী ব্রিটিশদের পক্ষ সমর্থন করবে এবং তাঁদের জয়ের বিনিময়ে লাভ করবে তাদের আকাঙ্ক্ষিত স্বরাজ। ব্রিটিশদের সেই যুদ্ধ জয়ের পরেও সেই স্বরাজ কিন্তু ভারতবাসী পেল না, যা পেলো তা হচ্ছে যুদ্ধের বীভৎস অভিজ্ঞতা—যদিও এই যুদ্ধ ঘটেছিল ভারতের মাটি থেকে অনেক দূরে। বিপুল নৈরাশ্য দেখা দিল মানুষের মনে, বাঙ্গালীর জীবনের মূল্যবোধ অনেক খানি পরিবর্তিত হয়ে গেল, তাদের চোখের সামনে ঘটলো দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, দুর্ভিক্ষ ও মৃত্যু। সেদিনের ক্লান্ত সাধারণ মানুষ হতাশার বিবরের মধ্যে আশ্রয় নিল।

১৯১৭-১৯২৯ সালে বিশ্বের ইতিহাসে স্থাপিত হল এক অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত—রুশ-বিপ্লব। কার্ল মার্কসের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা মূর্ত হয়ে উঠলো প্রয়োগের মধ্যে। সারা দুনিয়ার মানুষের কাছে এই ঘটনা প্রচণ্ড রকমের অভিঘাত সৃষ্টি করলো। ভারতবর্ষের ভাব বিন্যাসের মধ্যেও এই ঘটনা কিছুটা পরিবর্তন নিয়ে এল। ১৯১৯ সালে কলকাতার 'টাউন হলে' বিপিনচন্দ্র পাল ব্যাখ্যা করলেন বলশেভিক বিপ্লব ও সোস্যালিজমের।[৪] রুশ-বিপ্লবের এই অভিঘাত ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের কৌশলের উপর কিন্তু কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি।

কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই ঘটনার প্রভাব অতি দ্রুত পরিলক্ষিত হলো এবং সাহিত্যধারার পরিবর্তন স্পষ্ট হয়ে উঠলো। রাজা বাদশা জমিদার বা জজ ম্যাজিস্ট্রেট

প্রভৃতি উচ্চবিত্ত কুলকে পরিত্যাগ করে সাহিত্য গ্রহণ করলো অতি সাধারণ মানুষকে—নীচের তলার অন্ত্যজ শ্রেণীকে, প্রতিষ্ঠিত করলো তাদের নায়ক-নায়িকার আসনে। ইতিমধ্যে অবশ্যই বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজ বেশ কিছুটা পরিচিত হয়ে উঠেছে এবং স্বাধীনতা সংগ্রাম, বিশ্বযুদ্ধ, নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার তাঁদের চিন্তাভাবনাকে অনেক বিস্তৃত করে তুলেছে। ফলে, স্বাভাবিকভাবেই এইসব নতুন নতুন দিক সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। মোট কথা, সাহিত্য কখনোই যুগোপযোগী রাজনৈতিক সামাজিক বা সমসাময়িক ঘটনার প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারে না এবং কালানুক্রমিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তনের এই ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার তাড়নাতেই কল্লোল গোষ্ঠীর তরুণ সাহিত্যিকের দল অতিক্রম করার চেষ্টা করেছে পূর্ববর্তী লেখক কুলকে।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে রবীন্দ্রযুগের পরিধি ও প্রভাব পরিমাপ করা সহজ নয়। তাই সসম্মানে রবীন্দ্রনাথকে সরিয়ে রেখে বলতে হয় যে বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে শরৎচন্দ্র একটি পর্ব [১৯১৫-১৯৩০], কল্লোল পত্রিকাও একটি যুগ [১৯২৪-১৯২৯], [১৩৩০-১৩৩৬], আবার স্বাধীনতা আন্দোলনে অসহযোগ একটি পর্ব। কল্লোল পত্রিকার লেখকেরা শরৎচন্দ্রকে অস্বীকার করেননি কিন্তু তাঁর ধারাটি অনুসরণও করেননি। তাঁদের সাহিত্যের বিষয়বস্তু, রচনাশৈলী ইত্যাদি পূর্ববর্তী সাহিত্য থেকে তাঁদের পৃথক করে তুলেছে। কল্লোল সাহিত্যিকদের অনেকেই বস্তুনিষ্ঠ কিন্তু তাঁদের প্রয়োগ কৌশল ও বিন্যাস অনেকাংশেই রোমান্টিক ও কাব্যধর্মী। জীবন ওঁদের কাছে মোটেই সহজ সরল নয়। মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার সঙ্গে তাঁদের সাহিত্যে মিশেছে অর্থনৈতিক বৈষম্যের কথা। এই প্রচেষ্টার পিছনে ছিল বহু ঘটনার অভিজ্ঞতা কিন্তু সাহিত্যে এই চিন্তাভাবনা নিয়ে আসার নতুন পথ দেখিয়েছিলেন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত—"কল্লোলের অলিখিত লেখক"[৫] যার সম্পাদনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়েছিল বাসন্তিকা পত্রিকা [১৩২৯]। অধ্যাপক সুকুমার সেনের মতে কল্লোলের বীজ রোপিত হয়েছিল সে পত্রিকায়[৬] আর কল্লোল ত্রয়ীর অন্যতম অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্তের ভাষায় নরেশচন্দ্রই তাদের "নিকটতম দীপস্তম্ভ"।[৭]

বুদ্ধদেব বসু মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে বলেছিলেন Belated Kolloleau, তেমনি নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত সম্পর্কে বলা যায় 'কল্লোল' এর পূর্বসূরী, যিনি ব্যক্তিগত জীবনে ১৯০৫ সালের আন্দোলন থেকে বহু ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। যাঁর লেখার মাধ্যমে কার্ল মার্কস বাংলা কথাসাহিত্যে প্রবেশ করেন, প্রবেশ করেন গ্যারিফেলো. ফ্রয়েড, ইয়ুং এবং যাঁর হাত ধরে সাহিত্যের দরবারে উঠে এসেছে অন্ত্যজশ্রেণী তাদের পাপ পুণ্য নিয়ে। তিনি নিয়ে এসেছেন সাহিত্যে সোস্যালিজম্ যাঁর পরবর্তীকাল, কল্লোলের কাল আর তিনি যে কাল অতিক্রম করে এসেছেন তা বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের কাল, চরম ও নরমপন্থীদের মতানৈক্যের কাল, সন্ত্রাসবাদীদের কাল, আবেদন নিবেদনের কাল, প্রথম মহাযুদ্ধের কাল এবং রুশ-বিপ্লবের কাল।

৩

কথাসাহিত্য

'মুগ্ধা' নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস। [গ্রন্থকার কর্তৃক ক্ষুদ্র উপন্যাস রূপে লিখিত]। রচনাটি শৈলেশ মজুমদার মহাশয়ের সম্পাদনাকালে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে[১] প্রকাশিত হয়, কিন্তু পরে আর গ্রন্থাকারে ছাপা হয় নি। এই প্রথম ক্ষুদ্র উপন্যাসটির[২] মধ্যেই নরেশচন্দ্রের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের ঝোঁকটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দুটি অনাত্মীয় নরনারীর একটি আপাত গোপন আলিঙ্গনেই এই কাহিনীর সূত্রপাত।

অনিল যোগেন্দ্রবাবুর বন্ধুপুত্র এবং সেই সূত্রে যোগেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে আসা যাওয়া করে। বি. এ পাশ করার পর অনিলের বিলাত যাওয়া স্থির হলে সে যোগেন্দ্রবাবুদের বিদায় জানাতে এসে হঠাৎ বাগানের নিভৃতে যোগেন্দ্রবাবুর কন্যা সুশীলাকে আলিঙ্গন করে বসে। কিন্তু তাদের দুজনার মধ্যে সামান্যতম হৃদয়ের সম্পর্ক ছিল না। এই ঘটনার আকস্মিকতায় সুশীলা মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে যায় এবং অনিলকে তীব্রভাবে তিরস্কার করে সেখান থেকে চলে যায়। এ ব্যাপারে সুশীলা যদিও অনিলের প্রতি তীব্র ঘৃণা পোষণ করে, তবু মনে মনে নিজেকে কিছুটা দায়ী না ভেবে পারে না।

অনিল সুশীলার এই আলিঙ্গনের দৃশ্য সুশীলার মার চোখে পড়ে যায়। সুশীলার পিতামাতার ধারণা হয় যে সুশীলা অনিলের প্রেমে আচ্ছন্ন, যদিও বাঙ্ক অনিলের সঙ্গে

সুশীলাকে বিয়ে দেওয়ার কথা তারা ভাবতে পারে নি। তারা সুশীলার মন থেকে অনিলের স্মৃতি মুছে দিয়ে তাকে সুখী করার জন্য নরেন্দ্রনাথ নামে এক যুবকের সাথে তার বিয়ে দিয়ে দেয়। সুশীলাও তার অতীতের সেই তুচ্ছ ঘটনাকে অস্বীকার করে আনন্দে নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘর করতে থাকে।

এদিকে বাগানের সেই ঘটনাকে আশ্রয় করে নানা চিন্তা ভাবনার মধ্য দিয়ে বিলাত প্রবাসী অনিলের মনে সুশীলার প্রতি পরিপূর্ণ প্রেমের উন্মেষ হয়। তার ধারণা ছিল যে আই. সি. এস. হয়ে দেশে ফিরে এলে সুশীলা ও তার পিতামাতার তাকে পাত্র হিসাবে গ্রহণ করতে কোন আপত্তি থাকবে না। কিন্তু হঠাৎ সে এক পত্রে জানতে পারে যে সুশীলার বিবাহ স্থির হয়েছে। এই নিদারুণ সংবাদে দুঃখিত ও উত্তেজিত হয়ে অনিল সুশীলাকে তার পিত্রালয়ের ঠিকানায় একটি চিঠি দেয় এবং কলকাতায় এক বন্ধুর কাছে দুঃখ করে জানায় যে, তার প্রেমিকার অন্যত্র বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। অনিলের এই বন্ধুই সুশীলার স্বামী নরেন্দ্রনাথ।

নরেন্দ্রনাথের কাছে, বন্ধুর চিঠির আলোচনায়, সুশীলা যখন জানতে পারে যে অনিলের সঙ্গে তার স্বামীর পরিচয় আছে তখন সে লজ্জায় ও ভয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়ে। নরেন্দ্রনাথ কিন্তু তখনও জানতো না যে সুশীলাই তার বন্ধুর পত্রে বর্ণিত প্রেমিকা। সুস্থ হওয়ার পর সুশীলা মনে মনে ঠিক করে যে সে অনিল সম্পর্কে সব কথা তার স্বামীকে বলবে কিন্তু বার বার চেষ্টা করা সত্ত্বেও তার পক্ষে সেকথা বলা সম্ভব হয়নি।

সুশীলা কিছুটা সুস্থ হলে নরেন্দ্রনাথ তাকে পিত্রালয়ে রেখে আসে। এ সময় অনিলের দ্বিতীয় পত্রে সে সুশীলার কথা জানতে পারে এবং পিত্রালয়ের ঠিকানায় সুশীলাকে লেখা অনিলের চিঠিও তার হাতে এসে পড়ে। এই চিঠি দুটি পেয়ে নরেন্দ্র নাথের নিজেকে চরম প্রবঞ্চিত মনে হয় এবং এই প্রবঞ্চনার জ্বালায় সে সুশীলাকে তিলে তিলে দগ্ধ করার পরিকল্পনা করে অনিলের প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষা করতে থাকে। সুশীলা ফিরে এলেও নরেন্দ্রনাথ কিন্তু তার সঙ্গে পূর্বের মতই ব্যবহার করতে থাকে।

অনিলের দেশে ফিরে আসার পর একদিন নরেন্দ্রনাথ কৌশল করে সুশীলাকে অনিলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দেয় এবং দুজনের মধ্যে এসে সুশীলাকে অনিলের সাথে তার পূর্ব সম্পর্কের কথা তুলে অপমানকর ব্যঙ্গ উক্তি করে। নরেন্দ্রনাথের এই আচরণে সুশীলা বুঝতে পারে যে তাকে অপদস্থ করার জন্যই তার স্বামী এতদিন এই ব্যাপারটিকে সংগোপনে লালন করেছে। এই ঘটনার পর অপমানিত হয়ে সুশীলা তার পিতামাতার সঙ্গে কাশী চলে যায়।

অনিল এই ঘটনার আকস্মিকতায় স্তম্ভিত হয়ে যায় এবং এই অপ্রিয় ঘটনাটির জন্য নিজেকে সম্পূর্ণ দায়ী মনে করে। অবশেষে প্রচণ্ড মানসিক যন্ত্রণায় কাতর হয়ে অনিল নরেন্দ্রনাথের কাছে স্বীকার করে যে সুশীলা সম্পর্কে প্রেমের যে বর্ণনা সে দিয়েছিল তার সমস্তটাই তার নিজস্ব কল্পনা এবং এ ব্যাপারে সুশীলার বিন্দুমাত্র সমর্থন সে কোনদিনই পায় নি। নরেন্দ্রনাথও নিজের ভুল বুঝতে পারে এবং উদাস হয়ে দেশ ভ্রমণে বেরিয়ে

পড়ে, শেষ পর্যন্ত কাশীর ঘাটে নরেন্দ্রনাথ ও সুশীলার পুনর্মিলন ঘটে এবং অনিল সুশীলার প্রতি তার অটুট ভালবাসার কথা একটি চিঠিতে লিখে নীরবে চলে যায়। 'মুগ্ধা' উপন্যাসের কাহিনীর এখানেই পরিসমাপ্তি।

'মুগ্ধা' উপন্যাসটি বাংলা উপন্যাসের গতানুগতিক ধারায়ই রচিত। কাহিনীতে একটি নারী ও দুটি পুরুষ থাকলেও ত্রিভুজ প্রেমের নিদর্শন এখানে নেই, আবার প্রচলিত প্রেমকাহিনীর খলনায়ক চরিত্রও এখানে অনুপস্থিত। এই উপন্যাসে লেখক একটি ষোল বছরের কুমারী মেয়ের অনিচ্ছাকৃত অপরাধ তার বিবাহিত জীবনকে বিপর্যস্ত করতে পারে কি না এই মনস্তাত্বিক সমস্যার আলোচনা করেছেন। এই উপন্যাসের সমস্যা সম্পূর্ণ মানসিক ও ব্যক্তিগত—সামাজিক কোন সমস্যা মূলত এখানে নেই। তাই মনোজগতের তাত্বিক বিশ্লেষণই এই উপন্যাসে প্রাধান্য পেয়েছে। অনিলের সুশীলার প্রতি প্রেমাকর্ষণ সঞ্জাত হয়েছে তাঁর দৈহিক সান্নিধ্যের স্মৃতিতে এবং প্রণয় ব্যর্থতায় সে প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে উঠেছে, সুশীলার হিস্টিরিয়া রোগের কারণ তার নিজের অপরাধবোধ এবং প্রায় বিনা কারণে নরেন্দ্রনাথের তীব্র সন্দেহ। যদিও লেখকের আদর্শে শেষ পর্যন্ত উপন্যাসের দুটি প্রতিহিংসাপরায়ণ পুরুষ চরিত্রই অনুশোচনাকাতর হয়ে উঠেছে। বাংলা সাহিত্যের প্রায় প্রতিটি নারী চরিত্রে সরলতার সঙ্গে দৃঢ়তার যে সংমিশ্রণ দেখা যায় এ আলোচ্য উপন্যাসের সুশীলা চরিত্রটিও এর ব্যতিক্রম নয়।

লেখক গল্প বলার ফাঁকে ফাঁকে চরিত্রগুলির কার্যকারণ ও চিন্তাভাবনা বিশেষ যত্ন সহকারে বিশ্লেষণ করেছেন। নরেশচন্দ্রের এই কৌশলের মধ্যে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের রচনারীতির সাদৃশ্য দেখতে পাই আর লেখকের এই বিশ্লেষণী মনোভাবের জন্য পাঠকদের তাঁর চিন্তা ও ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করেই উপন্যাস অনুধাবন করতে হয়, পাঠকদের তিনি নিজস্ব ব্যাখ্যার স্বাধীনতা দেন নি।

এই উপন্যাসে কিছু কিছু ভাষাগত ত্রুটি দেখা যায়। সম্ভবত এই ভুল-ত্রুটির কারণ লেখকের অসতর্কতা। কাহিনীর সংলাপে সাধু ও চলিত উভয় ভাষারই ব্যবহার লক্ষণীয়। এমনকি একই সংলাপের আরম্ভ চলিত ভাষায় এবং শেষ অংশ সাধুভাষায় রচিত যেমন—

"দেখ, আমার সঙ্গে আর লুকোচুরি করো না, তোমার মনের ভিতর যা হচ্ছে তা আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি…যে অসহায়া বালিকা তোমাকে আত্মসমর্পণ করিয়া আপনার জীবনের সার্থকতা লাভ করিয়াছে, তাহাকে তাহার অতীতের একটা তুচ্ছ কথা লইয়া দারুণ অপমান করায় বড় আনন্দ।…তুমি ভাবিয়াছ আমাকে দারুণ অপমানে জর্জরিত করিয়া আমার জীবনের প্রতিমুহূর্ত বিষময় করিবে কিন্তু আমি তোমাকে নিরাশ করিব, তোমার সে আনন্দ লাভ করিতে দিব না।" [ব. দ. / ১১শ বর্ষ। পৃঃ ৭৩২]

'দ্বিতীয়পক্ষ' নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের গ্রন্থাকারে প্রকাশিত প্রথম গল্প সংকলন।[৩] এই গ্রন্থটিতে তিনটি বড় গল্প সংকলিত হয়েছে—দ্বিতীয়পক্ষ, ঠানদিদি ও ঝি। 'দ্বিতীয়পক্ষ'

গল্পটি সম্ভবতঃ 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হয়েছিল।[৪] ঠানদিদি গল্পটি ১৩২৪ সালে নারায়ণ পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় আর 'ঝি' গল্পটির সম্পর্কে লেখক নিজেই স্বীকার করেছেন যে এটি তাঁর প্রথমদিকের রচনার অন্যতম।[৫] বাংলা কথাসাহিত্য পাঠকদের সঙ্গে লেখকের তখন যে পরিচয় ছিল না গ্রন্থটির ভূমিকায় লেখকের এই বক্তব্য অস্পষ্ট নয়।

'দ্বিতীয়পক্ষ' গল্পটি নরেশচন্দ্রের পরবর্তী কথা সাহিত্যের তুলনায় জটিলতা বর্জিত। একটি মৃতদার যুবক ডাক্তারের সঙ্গে প্রতিবেশী একটি কুমারী মেয়ের ঘটনাচক্রে বিবাহ স্থির হয়ে যাওয়া এই গল্পের মূল আখ্যানাংশ। মৃতদার ডাক্তার ভববিভূতির দ্বিতীয় বিবাহে আসক্তি ছিল না। আর আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা মেয়ে রমা বিয়ে না করে চেয়েছিল ডাক্তারি পাশ করে গ্রামে গঞ্জে দুঃস্থ নরনারীর সেবা করতে। শেষ পর্যন্ত কিন্তু তাদের ইচ্ছা অনিচ্ছা টিঁকে থাকতে পারেনি। ভববিভূতির ছোট্ট কন্যা রেণু রমাকে অযাচিত মাতৃত্বের আসনে বসিয়ে রমা ও ভববিভূতির বিবাহ সম্ভব করে তুলেছে।

'দ্বিতীয়পক্ষ' গল্পটি অপ্রাসঙ্গিকতায় দীর্ঘ। লেখক গল্পের মধ্যে অনাবশ্যক ঘটনা এনে অহেতুক গল্পের আয়তন বৃদ্ধি করেছেন, ফলে গল্পটি মাঝে মাঝে গতি হারিয়ে ফেলেছে। পাড়ার সান্ধ্য আড্ডায় বিভিন্ন আলোচনার বিষয়বস্তু উল্লেখ করার মধ্যে লেখকের বিশেষ একটি বক্তব্য প্রকাশের আগ্রহ দেখা দিয়েছে। দ্বিতীয়পক্ষ গ্রহণের পক্ষে 'Man is a poligamous animal'—বার্নাড শ'র এই উক্তি ব্যবহারের মধ্যে গল্পের পারম্পর্য রক্ষিত হয়নি যেহেতু ভববিভূতির দ্বিতীয় বিবাহে রাজী হওয়ার কারণ অনেকটাই নির্ভর করেছে তার প্রথমপক্ষের কন্যা রেণুর জন্য। এই প্রসঙ্গে জনৈক সমালোচক লিখেছেন 'দ্বিতীয়পক্ষের বিবাহের ভববিভূতির অনিচ্ছা উপলক্ষ্য করে বিবাহ এবং ভালবাসার দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক স্বরূপ নির্ণয়ে লেখক মরগ্যান থেকে এলিস পর্যন্ত,—সামাজিক নৃতত্ত্ব থেকে অপরাধ বিজ্ঞান ও যৌনবোধের জগৎ পর্যন্ত পদসঞ্চার করে ফিরেছেন।...তাতে ছোট গল্পের আকার অকারণে, ব্যাপ্ত হয়েছে রসগত পিনদ্ধতাও বিস্রস্ত হয়ে হয়েছে দুর্লক্ষ্য তরল।'[৬]

ঠানদিদি গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল 'নারায়ণে'। 'নারায়ণ' পত্রিকা সম্পর্কে একটা জনমত আছে যে এই পত্রিকাটি সবুজপত্র তথা রবীন্দ্র বিরোধী। 'ঠানদিদি' গল্পের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়' গল্পের সাদৃশ্য অস্বীকার করা যায় না। ফলে অনুমান করা হয় যে 'নষ্টনীড়' গল্পের পরিসমাপ্তি সমাজ বিবেক নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ শিল্পরসিকের মনে পলায়নপরতার যে নালিশ পুঞ্জিত হয়েছিল, ঠানদিদি যেন তার গাল্পিক জবাব।[৭]

'ঠানদিদি' গল্পে নরেশচন্দ্র ইচ্ছাকৃতভাবেই সমাজের প্রচলিত নৈতিক ভিতটাকে ঠানদিদির সংসারের সঙ্গে ভেঙে চুরমার করে দিতে চেয়েছেন এবং 'নষ্টনীড়' গল্পকে সাহসের সঙ্গে অতিক্রম করে ঠানদিদিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন তার বার্দ্ধক্য পর্যন্ত। বৃদ্ধ বয়সেও শচীকান্তের স্মৃতি ঠানদিদির মনে ম্লান হয়ে যায়নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়ের' শিল্প সৌন্দর্যকে নরেশচন্দ্র কোন ক্রমেই লঙ্ঘন করতে পারেননি।

'ঠানদিদি' গল্পটি এক বিগত যৌবনা মহিলার যৌবনের কাহিনী। ঠানদিদির সুপুরুষ স্বামী কাজের ব্যস্ততায় দূরে সরে গিয়েছিলেন আর সেসময় তার অখণ্ড অবসরকে হাসি গল্পে ভরে তুলেছিল পিসতুতো দেবর, শচীকান্ত। ক্রমশঃ তাদের সম্পর্ক হয়ে উঠলো নিবিড় এবং স্বামী সম্পর্কে ঠানদিদি হয়ে উঠলেন অনেকটা নিস্পৃহ। ঠানদিদির স্বামী কর্মব্যস্ততায় যতই দূরবর্তী হতে থাকেন ঠানদিদি ততই দেওরের সান্নিধ্যের আকর্ষণে মেতে ওঠেন। অবশেষে স্বামীর মৃত্যুতে ঠানদিদির মোহভঙ্গ হল। কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পরও সে তার বাস্তব অনুভূতিকে অস্বীকার করেনি, অনুশোচনায় জ্বলেপুড়েও সে তার প্রেমকে অস্বীকার না করে, নিজেকে প্রবঞ্চনা না করে শচীকান্তকে বলেছে, "আমি জানি তুমি আমায় ভালবাস। এমন কি, আমারও মনে হয়েছে যে, শত চেষ্টা সত্ত্বেও আমি যেন তোমাকে সমস্ত প্রাণমন দিয়ে ভাল না বেসে, আমার সমস্ত জীবন দিয়ে তোমাকে আকাঙ্ক্ষা না করে পারিনি।......তোমাকে দেখলে আমার লোভ হয়, তুমি আমার কাছে আর এসো না।" [পৃঃ ৮২-৮৩] ঠানদিদি তার নিজের মুখে এ কাহিনী বলেছে। কাহিনীর নায়ক বা নায়িকাকে দিয়ে আত্মকাহিনী প্রকাশ করানো নরেশচন্দ্রের একটি স্টাইল। এই রীতির ব্যবহার আমরা তাঁর অন্যান্য রচনায়ও দেখতে পেয়েছি।

নরেশচন্দ্রের 'ঠানদিদি' গল্পটির মধ্যে এমন একটা সহজ বাস্তব সৌন্দর্য আছে যা তাঁর অন্য কোন গল্পে দেখতে পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়' গল্পের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনায় না গিয়েও একথা অনস্বীকার্য যে 'ঠানদিদি' গল্পটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম দিকের বাস্তব সচেতন শ্রেষ্ঠ গল্পগুলির অন্যতম।

'ঝি' গল্পটি কমলা নামে একটি সুন্দরী ভাগ্যহীনা নারীর কাহিনী। পিতৃবিয়োগের পর সে ও তার মা আশ্রয় পেয়েছিল যে বাড়ীতে সে বাড়ীর দুই ভাই-ই ভালবেসেছিল তাকে, কিন্তু সে ভালবেসেছিল চঞ্চল নামে এক যুবককে। নিয়তির বিধানে তার বিয়ে হয় বড়ভাই অমরের সাথে। ছোটভাই অতুল এ বিবাহে চরম আঘাত পেয়ে গৃহত্যাগ করে বিলাত চলে যায়। কমলার কিন্তু অমরের সঙ্গে সংসার করা হল না, বিয়ের পরও চঞ্চল তাকে বিরক্ত করত এবং এই কারণেই অসতীর অভিযোগ দিয়ে অমর একদিন গভীর রাতে তাকে রাস্তায় বের করে দেয়। অনেক কষ্টের ভিতর দিয়ে শেষ পর্যন্ত তাকে দাসীবৃত্তি গ্রহণ করতে হয় কিন্তু সে মনিবগৃহেও তারই কারণে যে জটিলতার সৃষ্টি হয়, তার জন্য কমলাকে আত্মহত্যা করতে হয়। তার স্বামী অমর যখন নিজের ভুল বুঝতে পারে তাকে নিতে এসেছে, তখন সে অনন্তপথের যাত্রী।

'ঝি' গল্পটি নরেশচন্দ্রের প্রথম দিকের রচনা একথা লেখক নিজেই স্বীকার করেছেন,[৮] সে হিসাবে গল্পটিকে উচ্চাঙ্গের না বলা গেলেও নিকৃষ্ট বলে নিন্দা করাও সঙ্গত নয়।

'অগ্নি সংস্কার' নরেশচন্দ্রের দ্বিতীয় প্রকাশিত গ্রন্থ।[৯] এই গ্রন্থে দুটি গল্প রয়েছে, 'অগ্নি সংস্কার' ও 'পাগল'। 'অগ্নি সংস্কার' গল্পের বিষয়বস্তু হচ্ছে ইঙ্গবঙ্গ সংস্কারের সঙ্গে মধ্যবিত্ত বাঙালী আদর্শের সংঘাত। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে

'অগ্নি সংস্কার' লেখকের শ্রেষ্ঠ রচনার মধ্যে অন্যতম।[১০] সম্ভবত এই গ্রন্থটির জনপ্রিয়তাও লেখকের অন্যান্য গ্রন্থের চেয়ে বেশী। গ্রন্থটির চারটি সংস্করণ হয়।[১১]

'অগ্নি সংস্কারকে' ঠিক উপন্যাস বলা যায় না আবার বড় গল্পের দলভুক্তও করা চলে না, তাই এই কাহিনীকে ক্ষুদ্র উপন্যাস বা নভেলেট বলাই ভাল। যদিও অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'অগ্নি সংস্কার'কে উপন্যাস হিসাবেই চিহ্নিত করেছেন।

সত্যেশ ও ইলা এই কাহিনীর নায়ক নায়িকা। এম. এ. ক্লাসের কৃতীছাত্র সত্যেশ এসেছিল প্রখ্যাত ব্যারিষ্টার কালীভূষণ মুখোপাধ্যায়ের কাছে একটা সভাসমিতির ব্যাপারে। কথাবার্তায় এই যুবকটিকে কালীভূষণের পছন্দ হয়ে যায় বিশেষত ইঙ্গবঙ্গ সমাজের হই-হুল্লোড়ে তিনি তখন ক্লান্ত। কালীভূষণ নিজে এই ইঙ্গবঙ্গ সমাজের মধ্যমণি হলেও মনে মনে তিনি স্থির করেছিলেন যে তার ছোটমেয়ে ইলার তিনি বিয়ে দেবেন ভারতীয় আদর্শে মানুষ এমন একটি ছেলের সঙ্গে। তাই এই পরিকল্পনার কারণ তার বড় মেয়ে লীলা। লীলা ইঙ্গবঙ্গ সমাজের আবেষ্টনীতে পুরুষবন্ধুদের সঙ্গে অবাধ মেলামেশার সুযোগ পেয়ে নিজে পছন্দ করে বিয়ে করেছে ব্যারিষ্টার ঘোষকে। ব্যারিষ্টার ঘোষ কিছুই করে না, আদুরে মেয়ে লীলা তার মার কাছ থেকে যে টাকা চেয়ে নেয় সে টাকায়ই তারা তাদের আদবকায়দা বজায় রাখে বিলাসিতায় এবং ঘোড়দৌড়ের বাজিতে।

ব্যারিষ্টার কালীভূষণের বাড়ীতেই ইলা ও সত্যেশের পরিচয়। এই পরিচয় ক্রমে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলো, প্রেমের মত্ততায় তারা ভুলে গেল যে তারা দুজন সম্পূর্ণ ভিন্ন সমাজের এবং শেষ পর্যন্ত কালীভূষণের সমর্থনে ইলা ও সত্যেশের বিয়ে হল। বিয়ের প্রথম আবেগ কেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইলা ও সত্যেশের মধ্যে নানা বিরোধ দেখা দিল। ইলা যদিও তাদের ইঙ্গবঙ্গ সমাজকে ততটা পছন্দ করতো না কিন্তু সে যে ঐ সমাজের মেয়ে পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনী তাকে সেকথা কখনোই ভুলতে দেয়নি। আর এ সমাজে সবচাইতে তাকে জড়িয়ে ধরছে তার দিদি লীলা। কিছুটা লীলার প্ররোচনায় ইলাকে সমাজে মেলামেশা করতে হয় আর অভিমানাহত সত্যেশ বুঝতে পারে যে তাদের আদর্শে গৃহবধূ হয়ে থাকা ইলার পক্ষে সম্ভব নয়। ক্রমশ দুজনার মধ্যে একটা দুরত্ব রচিত হয়ে যায় আর এসময়ই সত্যেশ কর্ম উপলক্ষ্যে বিদেশে চলে যায়। সত্যেশের বিরহে ধীরে ধীরে ইলার মনে পরিবর্তন আসে এবং সত্যেশ ফিরে আসার পর তাদের মধ্যে আর কোন সংস্কারজনিত অন্তরাল টিঁকে থাকতে পারেনি কেননা তারা দুজনেই তখন দুজনার বাহ্যিক আবরণের অন্তরালে অন্তরের সন্ধান পেয়েছে—বিরহের আগুনে পুড়ে প্রেমের সোনা উজ্জ্বলতর হয়েছে।

ইলা ও সত্যেশের কাহিনীর মধ্যে লেখক যে দ্বন্দ্বটি আভাসিত করেছেন তা হচ্ছে সংস্কারের সঙ্গে সংস্কারের সংঘর্ষ। এই সংঘাতের পরিসমাপ্তি ঘটানোর জন্য কোন তত্ত্বের আশ্রয় করে লেখক কোন জটিল বিতর্কে পাঠকদের পৌঁছে দেননি। সত্যেশ ও ইলার পুনর্মিলন তাদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই বিন্যস্ত করেছেন। ইলা সত্যেশকে

ভালবেসেছে, তার কুমারী হৃদয়ের প্রেমের তীব্রতা ও পিতার স্বতঃপ্রবৃত্ত অনুমোদন তাদের বিবাহকে সম্ভবপর করে তুলেছে। পিতার মতো সেও তাদের সমাজের বিলাসপ্রিয় স্বেচ্ছাচারী দৃষ্টিভঙ্গীকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারেনি অথচ সেই আবেষ্টনীর মধ্যেই মানুষ হওয়াতে সেই সমাজকেও সম্পূর্ণ বর্জন করতে পারেনি এবং সে উপায়ও তার ছিল না। সে যতটুকু সত্যেশের আদর্শের প্রতি অবহেলা দেখিয়েছে সেটাও বাহ্যিক ঘটনা এবং কিছুটা তার লোকলজ্জার ভয়। কাহিনীর পরিণতিতে তার আন্তরিক অনুতাপ তাই বিস্ময়ের সৃষ্টি না করে স্বাভাবিকই মনে হয়। আর তার প্রথম দিকের আচরণও পাঠক সকৌতূহল সহানুভূতির সঙ্গেই গ্রহণ করে। সত্যেশের ব্যবহারের মধ্যেও এমন কোন অসঙ্গতি নেই যার ফলে সে পাঠকদের সহানুভূতি হারাতে পারে আর তার নিজের আদর্শে স্থির থাকার ঝোঁকটিকেও কখনো গোঁড়ামি মনে হয় না। এই কাহিনীর স্থানে স্থানে মনস্তাত্ত্বিক ছোঁয়া থাকলেও তা কখনোই বৈজ্ঞানিক বা সামাজিক কিংবা মনস্তাত্ত্বিক সমস্যায় কণ্টকিত হয়ে ওঠেনি। অগ্নি সংস্কার কাহিনীর সৌন্দর্য সেখানেই। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই কাহিনী আলোচনায় লিখেছেন—"এই উপন্যাসের চরিত্রগুলিও সুপরিকল্পিত ও সজীব। মোটের উপর এই উপন্যাসখানি গঠন কৌশল ও সংগতি জ্ঞানের দিক দিয়াও ইহার অন্তর্নিহিত সমস্যার সরস আলোচনার জন্য উচ্চস্থান দাবী করিতে পারে।"[১২]

'পাগল' অগ্নি সংস্কার গ্রন্থের দ্বিতীয় গল্প। এই গল্পটির নাট্যরূপ 'বড় বউ বা নারায়ণী' নামে অভিনীত হয়েছিল।[১৩] মাদ্রাজের নাটাসন্ পাব্লিকেশন গল্পটির ইংরাজী অনুবাদ (Idiot's wife) প্রকাশ করেন। এই ইংরাজী অনুবাদটি করেন লেখক স্বয়ং।

এই গল্পটিতে নরেশচন্দ্র এক আদর্শ নারীচরিত্র বর্ণনা করেছেন। বাস্তবতার দৃষ্টিভঙ্গীতে হয়ত এই কাহিনীটি সম্পূর্ণ সার্থক হয়ে ওঠেনি কিন্তু গল্পের বিন্যাস, বিষয়বস্তু ও চরিত্র কাহিনীটিকে জনপ্রিয় করে তুলেছিল। পরবর্তীকালে মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'স্বয়ং সিদ্ধা' [১৯৩৭] উপন্যাসে 'পাগল' গল্পের বিষয়বস্তুর ছাপ অতি স্পষ্ট।

'পাগল' কাহিনীর নায়িকা দরিদ্র ব্রাহ্মণ রামগতি ভট্টাচার্যের কন্যা নারায়ণী। রামগতির দারিদ্র্য তাকে অর্থের জন্য যে কোন হীনকাজ করতে বাধ্য করেছিল। এই অভ্যাসের বশবর্তী হয়ে ভট্টাচার্য শেষ পর্যন্ত এক জমিদারের পাগল পুত্রের সঙ্গে কন্যা নারায়ণীর বিয়ে দেয়। নারায়ণী কিন্তু এই পাগল স্বামী সত্যেন্দ্রর ঘর করতে কোন আপত্তি করেনি। সে একনিষ্ঠ সেবা-যত্নে তার এই জড়বুদ্ধি স্বামীকে নিজের আয়ত্তে রাখতে সমর্থ হয়েছে।

সত্যেন্দ্রর ছোট ভাই সুরেন্দ্র যখন দেখতে পেল যে বড় ভাই সত্যেন্দ্র নারায়ণীর সেবা-যত্নে অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছে, তখন সে নারায়ণী ও সত্যেন্দ্রর সঙ্গে নানারকম দুর্ব্যবহার করতে শুরু করে। বাধ্য হয়ে নারায়ণী সম্পত্তির ভাগবাটোয়ারার ব্যাপার নিয়ে আদালতে নালিশ করে এবং মামলায় নারায়ণীর জয় হয়। যে অসীম ধৈর্য ও

বুদ্ধি নিয়ে নারায়ণী এতকাল জড়বুদ্ধি স্বামীকে নিয়ে স্বাবলম্বী ছিল, স্বামীর মৃত্যুতে সে কিন্তু সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত সুরেন্দ্রর সাহায্য প্রার্থনা করে। সুরেন্দ্র তার এই দুর্দিনে অনুতপ্ত হয়ে তাদের পুরোনো বিরোধ মিটিয়ে নেয়।

নরেশচন্দ্রের এই গল্পের মধ্যেও গল্পের প্রয়োজন অতিরিক্ত বিস্তার লক্ষ্য করা যায়। এখানে চমৎকার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তিনি ছোট গল্পের সংহত রূপটি দিতে পারেন নি। নারায়ণীর পিতা ও সত্যেন্দ্রর ছোট ভাই-এর চরিত্র দুটি বেশ কিছুটা খাপছাড়া মনে হয়, তাদের আচরণের মধ্যেও নানা অসঙ্গতি দেখা যায়। সত্যেন্দ্রর মার চরিত্রটিও অস্পষ্ট শুধুমাত্র আইনের অংশে নানা জটিলতার বিন্যাসে উকিল লেখক নরেশচন্দ্র অভিনবত্ব দেখিয়েছেন।

নরেশচন্দ্রের গল্প আলোচনায় জনৈক সমালোচক লিখেছেন, 'গল্পগুলি সফল ছোট গল্পের আকার ধরেনি। তার আর একটা কারণ হয়ত, সহজ বর্ণনার মাধ্যমে উপন্যাসের চিন্তাকে আয়ত্ত করার দিকেই লেখকের ঝোঁক ছিল বেশি। ফলে, তাঁর গল্পগুলোও আসলে ছোট উপন্যাসের (Novelette-এর) সম্ভাবনা নিয়ে দেখা দিয়েছে।'[১৪]

'শুভা' নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের গ্রন্থাকারে প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস।[১৫] উপন্যাসটির রচনাকালে তিনি ঢাকায় ছিলেন। লেখক এই কাহিনীতে দেখাতে চেয়েছেন যে নারীও তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্য সামাজিক জীবনে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া কুসংস্কার ও নীতিবাদের বন্ধন ত্যাগ করে নিজের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠার পথে পা বাড়াতে পারে। প্রচলিত 'সমাজে এ রকম নারীর আবির্ভাব নিশ্চয়ই অশুভ। তাই যেন নীতিবাগিশের দিকে তাকিয়ে লেখক জানিয়েছেন এ হলো শুভা অর্থাৎ মঙ্গলের অগ্রদূত'।[১৬] নরেশচন্দ্র তাঁর এই উপন্যাসে একথাও ব্যক্ত করেছেন যে 'নারীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের মর্যাদা তথাকথিত বিশুদ্ধ সতীত্বের চেয়ে কম মূল্যবান নয়'[১৭], কিন্তু এই অপরিবর্তিত সমাজ ব্যবস্থায় নারীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকতে পারে না। তাই কাহিনীর শেষে লেখকের একটা গভীর বেদনাবোধ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

'শুভা' প্রচলিত নীতিবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার শুভা নামে একটি মেয়ের জীবনআলেখ্য। সে যদিও ইংরাজী স্কুলের অল্পশিক্ষিত মেয়ে কিন্তু চিন্তাভাবনায় যথেষ্ট পরিণত। অত্যাচারী স্বামী ও দারিদ্রের সংসারে তার মর্যাদাহীন জীবনকে বোঝা মনে হয়েছে, তাই সে কামনা করেছে মুক্তি। সে খুঁজেছিল জীবনের একটা আদর্শ, কিন্তু স্বামীর পরাধীন দাসীবৃত্তিতে আশ্রিত নারী জীবনে তার এমন কোন অবকাশই ছিল না। সে বুঝতে পেরেছে সর্বপ্রথম তার চাই স্বামীর পরাধীনতা থেকে মুক্তি। তারপর একদিন স্বামীর অত্যাচারে সত্যিই গৃহত্যাগ করে শুভা রাস্তায় বেরিয়ে আসে নগেন নামে প্রতিবেশী এক যুবককে নির্ভর করে। নগেনের সাক্ষাৎ কিন্তু সে পায় না, তাই একান্ত নিঃসহায় অবস্থায় সে আশ্রয় নেয় এক থিয়েটারে। শুভার রূপ ও আচরণে আকৃষ্ট হয়ে থিয়েটার ম্যানেজার তাকে নির্দ্ধারিত শিল্পীর পরিবর্তে একটা ছোট দৃশ্যে অভিনয় করার সুযোগ দেয়। সেখানে শুভার পরিচয় হয় চাঁপা নামে এক অভিনেত্রীর

সাথে। এই চাঁপার দয়ায় শুভা তার বাড়ীতে আশ্রয় পায়। এসময় শুভা মনে মনে স্থির করে যে চাঁপার মতই সে থিয়েটার করে জীবিকা নির্বাহ করবে। চাঁপার বাড়ীতে শুভার পরিচয় হয় জনৈক থিয়েটার পরিচালক সুরেশবাবুর সঙ্গে। সুরেশবাবু তার থিয়েটারে শুভাকে অভিনয় করাবে— এই চুক্তিতে চাঁপা সুরেশবাবুর কাছ থেকে কিছু টাকা অগ্রিম নেয়। এই ব্যাপারটিকে শুভা সুনজরে দেখতে পারেনি এবং চাঁপাকে সন্দেহজনক মনে করে তার আশ্রয় ছেড়ে দেওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এসময় শুভার আবার নগেনের সঙ্গে দেখা হয় এবং সে চাঁপার আশ্রয় ছেড়ে নগেনের আশ্রয় লাভ করে। কিন্তু নগেনের আশ্রয়ে তার বেশিদিন থাকা সম্ভব হয়নি। একদিন নগেনের দাদা সত্যেন এসে প্রচণ্ড নিগ্রহ করে শুভাকে রাস্তায় বের করে দেয়, বাধ্য হয়ে শুভা জলপাইগুড়িতে তার এক আত্মীয়ের কাছে যায় কিন্তু সেখানেও তার স্থান হয় না। শুভা ফিরে আসে চাঁপার কাছে, শুরু করে থিয়েটারে অভিনয়। সুরেশবাবুর আন্তরিক চেষ্টায় ও সহযোগিতায় কিছুদিনের মধ্যেই শুভা অভিনয়ে দক্ষ হয়ে ওঠে এবং সুরেশবাবুর সাথে তার অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠে। শুভা তার এই বিখ্যাত অভিনেত্রীর জীবনের মধ্যে কিন্তু তৃপ্তি খুঁজে পায়নি ইতিমধ্যে জীবন সম্পর্কে ধারণাও তার রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে। নগেনের প্রেম ভালবাসার স্মৃতিও তার কাছে এখন মূল্যহীন। এসময় সুরেশবাবুর প্রেমভিক্ষাকেও শুভা অনায়াসে প্রত্যাখ্যান করেছে সত্য কিন্তু দুজনার পূর্ব সম্পর্ক নষ্ট হয় নি। চাঁপা ও সুরেশবাবুর উৎসাহে এ সময় শুভা একটি নাটক লেখে, কিন্তু সুরেশবাবুর শতচেষ্টা সত্ত্বেও নাটকটি মঞ্চে চলেনি। শুভা অসুস্থ হয়ে শরীর সারানোর জন্য দার্জিলিং যায় এবং সেখানে কয়েকদিনের মধ্যেই জানতে পারে যে তার পাহাড়ী পরিচারিকার বোন মৈলীর সঙ্গে বসবাস করছে তারই পরিত্যক্ত স্বামী নিবারণ। শুভা মৈলীকে একটি চিঠি লিখে কলকাতায় ফিরে আসে এবং শুনতে পায় যে চাঁপাও তার স্বামী ভুবনের সঙ্গে সংসার করছে। ইতিমধ্যে নগেন আবার শুভার সঙ্গে নিয়মিত দেখা সাক্ষাৎ করতে থাকে। শুভার উপর নগেনের এই আসক্তির কথা অনুমান করে একদিন নগেনের স্ত্রী চপলা তার পুত্রকে নিয়ে শুভার কাছে এসে নগেনকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করে। শুভা খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করে সেবিকার ব্রত নিয়ে সুদূর আসামের এক হাসপাতালে চলে যায়। সুরেশবাবু অসুস্থ অবস্থায় শুভার হাসপাতালে গিয়ে মারা যান, আর শুভা তখনও সিস্টার গ্রেস নাম নিয়ে সেবাধর্মের মধ্যেই জীবন কাটাতে থাকে।

শুভা আলোচ্য উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। কাহিনীতে তার জীবনের চারটি পর্যায় বর্ণিত হয়েছে। এই পর্যায়গুলি হচ্ছে, গৃহবধূ, উপপত্নী বা প্রেমিকা, অভিনেত্রী ও সেবিকা। গৃহবধূ শুভা গৃহত্যাগ করেছিল একটা আদর্শের অন্বেষণে, তার বিভিন্ন বৃত্তি গ্রহণের মধ্যেও এই একই মানসিকতা কাজ করেছে।

চৌদ্দ বছর বয়সে শুভার বিয়ে হয় নিবারণ চ্যাটার্জীর সাথে। তারপর সাতটি বছর সে নিবারণের সাথে ঘর করেছে, দু দুবার সন্তান সম্ভাবনা হয়েও নিবারণের অত্যাচারে

সে মা হতে পারেনি, তাই বিয়ের সুখ ও গৃহের মায়া কাটতে শুভার সাত বছরের চেয়ে বেশি সময়ের দরকার হয়নি। নিবারণের অত্যাচারেই সে ঘর ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। শুভা ইংরাজী স্কুলে পড়েছে, তার বাবা তাকে বিয়েতে যতটুকু দিয়েছে তার বিরাট অংশ হচ্ছে বই। শুভা সেসব বই পড়েছে এবং এই বই পড়েই সে জানতে পেরেছে যে মানুষের জীবনের একটা আদর্শ চাই। আর আদর্শ গড়ে তোলার জন্য প্রথমেই চাই মুক্তি—মুক্তি না পেলে জীবনের কোন সার্থকতাই আসতে পারে না। এই ভাবনায় তার প্রথমেই মনে হয়েছে যে সে বিবাহিতা কিন্তু তার "শ্রীমতী বেসান্টর কথা মনে হইল। তাঁহারও তো বিবাহ হইয়াছিল, বিবাহিত জীবনের ক্ষুদ্র পরিসর ত্যাগ করিয়া তবেই না সে তাঁর জীবনের সার্থকতা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন।" [পৃঃ ১১ দ্বিঃ সঃ] শুভা আদর্শের তাগিদ এবং অত্যাচারের প্রতিবাদে মিলিত কারণে স্বামিগৃহ ত্যাগ করেছে। স্নেহ ভালবাসাভরা নিরাপদ আশ্রয়ে থাকলে তার এই আদর্শ অন্বেষণের তাগিদ নিশ্চয়ই অনেকাংশে সীমিত হয়ে যেত। তাই মনে হয় যেন নিবারণের অত্যাচার তার আদর্শ অনুসন্ধান প্রবৃত্তিকে ত্বরান্বিত করে তুলেছে।

গৃহত্যাগের পূর্বমুহূর্তে শুভার মনে হয়েছে যে তার সামনে এগিয়ে যাওয়ার মত নির্দিষ্ট কোন পথ নেই। তাই সে নিজেই নিজেকে প্রশ্নোত্তর করেছে, 'সে কি—হাজার হাজার লোকের মত পথে দাঁড়াইতে পারে না? —কিসের ভয়?……যে অপমানের ভয়, সে অপমান তো ঘরে থেকে রোজই হবে।' [পৃঃ ১২ দ্বিঃ সঃ] প্রেমহীন সহবাস যে নারীর পক্ষে সবচেয়ে বড় অপমান। শুভা জানে যে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর মত শক্তিসামর্থ তার নেই তবু স্বামীর উপর নিদারুণ ঘৃণায় সে এক দুঃসাহসিক কথা ভাবতে পেরেছে—'ঘরে থাকিলেও শরীর বেচিয়া বাঁচিতে হইবে বাহিরেও না হয় তাহাই হইবে। কিন্তু স্বাধীনতা চাই, মুক্তি চাই, জীবনটাকে সার্থক করিবার একটা অবসর চাই।' [পৃঃ ১৩ দ্বিঃ সঃ] কিন্তু শুভা তার দীর্ঘকালের সংস্কার কাটিয়ে উঠতে পারেনি তাই তার সজাগ অপরাধবোধকে চাপা দেওয়ার জন্য যুক্তি খুঁজেছে—'অন্য উপায়ে যদি জীবিকা অর্জন না হয় তবে শরীর বেচিয়া খাইলে এমন কি অপরাধ' [পৃঃ ১৮ দ্বিঃ সঃ] এই সংস্কার ও অপরাধবোধ পরবর্তী পর্যায়ে শুভার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। শুভা যুক্তি দিয়ে যা ভেবেছে হৃদয় দিয়ে তা গ্রহণ করতে পারেনি। বলাই বাহুল্য এর মধ্যে কিছুটা আত্মপ্রতারণা থেকে গেছে। সুরেশবাবুর কাছ থেকে চাঁপার টাকা নেওয়ার ঘটনাটিকে সে কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি, একটা ঘৃণ্য সন্দেহ নিয়ে সংকোচের সঙ্গে সে ভেবেছে 'এতদিন সে মনে মনে বার বার বলিয়াছে—বেশ্যাবৃত্তি করিতে হয় করিবে—কিন্তু আজ বুঝিল সেটা কেবল কথার কথা। তার পক্ষে মান বিলাইয়া দিয়া শরীর পণ্যে জীবনধারণ করা মৃত্যুর বাড়া অপমান।' [পৃঃ ৩১ দ্বিঃ সঃ] চাঁপার বাড়ী তার অসহ্য মনে হয়েছে তাই প্রথম অবসরে সে নগেনের সঙ্গে চাঁপার গৃহ ত্যাগ করেছে। শুভা বিদ্রোহিনী হলেও সে মূলত নারী, তাই নগেনের প্রেম, সম্পদ

ও প্রাচুর্য দেখে সে নগেনকে ভালবেসেছে। কিন্তু এই ভালবাসার মধ্যেও সে পরিপূর্ণ তৃপ্তি পায়নি। তার এই সুখের জীবনের মধ্যেও একটা তীব্র পাপবোধ প্রকাশ পেয়েছে, "হঠাৎ তার মনে হইল কি আশ্চর্য তাহার মন! চাঁপার প্রস্তাবে তার বড় অপমান বোধ হইয়াছিল, অথচ নগেনের প্রণয়িনী হইয়া আজ সে আনন্দে পাগল হইয়া উঠিয়াছে।—কোথায় রহিল তার জীবনের সব আদর্শ আর কোথায় তাহার ঘৃণ্য জীবন! সে এখন একটা তুচ্ছ স্বৈরিণী বই অন্য কিছুই নয়।···এই ঘৃণিত জীবনে সে যে আনন্দ উপভোগ করিতেছে সে কথা মনে হইতে তার মন তাহাকে চাবুক মারিতে লাগিল।" [পৃঃ ৫১ দ্বিঃ সঃ] কিন্তু এই অন্তর্দ্বন্দ্বেও তার ভাবনা ভিন্ন পথ ধরেছে, নিজেকে অপরাধী ভাবার প্রসঙ্গে তার মনে হয়েছে, "পতিতা মেরী মডলিনের কথা, যীশুখ্রীস্টের সেই মহাবাণী—'যে আপনি সম্পূর্ণ নিষ্পাপ সেই ইহার প্রতি প্রথম লোষ্ট্র নিক্ষেপ কর।'—পাপ যদি সে করিয়াই থাকে তবে নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। যীশুখ্রীস্ট পাপীকে আশার বাণী শুনাইয়াছেন। কিন্তু সে পাপী কিসে? জগতে সে কেবল একজনকেই ভালবাসিয়াছে—একজনের রূপে গুণে মুগ্ধ হইয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছে। আর দশ জন ধরিয়া বাঁধিয়া আর একটা লোককে তার উপর যথেচ্ছা প্রভুত্ব করিবার অধিকার দিয়াছিল, সে অধিকার ও সে অত্যাচার সে অস্বীকার করিয়াছে বলিয়া সে লোকের চক্ষে পাপী হইতে পারে, কিন্তু যদি ন্যায়বান ঈশ্বর থাকেন তবে তাঁর চক্ষে সে পাপী হইবে? অসম্ভব!" [পৃঃ ৬১ দ্বিঃ সঃ] নগেনের দাদা সত্যেন শুভাকে নগেনের গৃহ ছাড়তে বাধ্য করেছে, আত্মীয়দের কাছেও তার স্থান হয় নি, বাধ্য হয়ে সে চাঁপার আশ্রয়েই ফিরে এসেছে এবং অভিনয় বৃত্তিই গ্রহণ করেছে। শুভার এই নতুন আবেষ্টনের অভিজ্ঞতায় চিন্তার মধ্যে ক্রমশ বাস্তববোধ দেখা দিয়েছে। পুরুষজাতি, প্রেম ও বিয়ে সম্পর্কে তার ধ্যান ধারণা পরিবর্তিত হয়েছে, ফলে—'যে তার জীবনকে এত সরস করিয়া তুলিয়াছিল সেই নগেনের ভালাবাসাও তার কাছে একটা নিন্দনীয় বস্তু হইয়া উঠিল। শুভা দেখিতে পাইল তাহার মধ্যে শুধু পুরুষের পর্বতপ্রমাণ অহংকার।' [পৃঃ ৯৯ দ্বিঃ সঃ] এই জন্যই সুরেশবাবুর প্রেম নিবেদনকে সে প্রত্যাখ্যান করেছে। শুভা সুরেশবাবুকে বলেছে—"আমি যদি আপনাকে বলি, আমি আপনাকে ভালবাসি তবে কি আপনি খুসী হয়ে বাড়ী ফিরে যাবেন? নিশ্চয়ই নয়! আপনি আসলে চান আমার এই সুন্দর শরীরখানা দখল করতে, ভালবাসার অজুহাত দিয়ে এমন একটা সম্পত্তি আয়ত্ত করতে চান যা দশজনকে দেখিয়ে একটু গর্ববোধ করতে পারবেন। ···আপনি চাইবেন যদি সম্ভব হয় আমাকে বিয়ে করতে। বিয়ে করা মানে হচ্ছে আমার শরীরটার উপর আপনার নির্ব্যূঢ় স্বত্ব প্রতিষ্ঠা করা।" [পৃঃ ১২৫ দ্বিঃ সং] বস্তুতঃ শুভা প্রথম থেকেই সামাজিক পরাধীনতা থেকে মুক্তি চেয়েছে। নারীদের স্বতন্ত্র সত্তা ও মূল্য বিচার করেই সে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক নতুনভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে—তার রচিত নাটকে সংলাপে সে নায়িকাকে বলিয়েছে—'স্বামীপ্রভু একথা সেকেলে কথা। স্ত্রী স্বামীর সহধর্মিণী সহচারিণী। যতদিন স্বামী তাহাকে সহচারিণী সহধর্মিণীর যোগ্য সম্মান ও অধিকার দিতে পারেন

ততদিনই স্ত্রীর তার প্রতি কর্তব্য। যদি স্বামী সে কর্তব্যে অবহেলা করিতে পারেন তবে তখন স্ত্রীরও কর্তব্যের শেষ।' [পৃঃ ২০৭, দ্বিঃ সঃ]

শুভা পুরুষের প্রভুত্ব মেনে নিতে পারেনি কিন্তু তার হৃদয়ের তলদেশে পুরুষের প্রতি এক গোপন প্রেমাকাঙ্ক্ষা লালিত করেছে এবং কখনোই এই বাসনা বিসর্জন দিতে পারেনি। তাই অনুমতি প্রার্থী নগেনের চিঠি পেয়ে বিখ্যাত মঞ্চাভিনেত্রী শুভা ভেবেছে—'নগেন তাহাকে ভাবিয়াছে কি? এখনো সেই পুরাতন শুভার ক্ষুদ্র প্রেমাকাঙ্ক্ষী নারীহৃদয় লুকান আছে তা কি সে জানে না?' [পৃঃ ২৪৫ দ্বিঃ সঃ] কিন্তু শেষ পর্যন্ত শুভার শুভবোধ ও আদর্শেরই জয় হয়েছে—শুভা নগেনের সঙ্গে পুনরায় প্রেম সম্পর্ক গড়ে তুলে চপলার সুখ শান্তি বিনষ্ট করেনি, নিজের অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে দেশান্তরে পাড়ি দিয়েছে।

নারীর ব্যথা বেদনাকে শুভা হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছে এমন কি সেজন্য সে তার প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইচ্ছাকৃত পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছে। নিজে খ্রীস্টান হয়ে সে নিবারণের সঙ্গে আইনসম্মত বিবাহবিচ্ছেদ চেয়ে নিয়ে মৈনীকে বিধিসম্মত উপায়ে চিরদিনের জন্য তার স্বামীকে নিয়েই ঘর করার অধিকারের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। এই ত্যাগ দুটিই শুভার জীবনের উত্তরণ এবং শেষ পর্যন্ত মৃত্যুপথযাত্রী সুরেশবাবুকে দেখে অকুণ্ঠিত চিত্তে স্বীকার করেছে "প্রেম সত্য ও নিঃস্বার্থ" হতে পারে।

শুভার চরিত্রে প্রচলিত নীতিবাদের আদর্শ অনুসৃত হয়নি কিন্তু নারী স্বভাবসৌন্দর্যে সে কোথাও ম্লান হয়ে যায়নি। তার মুক্তি আকাঙ্ক্ষার জন্য যেমন পৌরুষদীপ্ত তেজস্বিতা প্রকাশ পেয়েছে তেমনি তার সেবা প্রেম ও ত্যাগের মধ্যে নারীসত্তার প্রকাশ ঘটেছে। তাই শুভাকে অনায়াসে যুগসন্ধিকালের চরিত্র বলা চলে, সে একদিকে আধুনিক এবং অন্যদিকে সর্বকালের মঙ্গলময়ী নারী।

চাঁপা এক রূপোপজীবিনীর কন্যা। সমাজে আভিজাত্য না থাকলেও তার আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল। ফলে লম্পট স্বামীর দাসীবৃত্তি করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি—ছলাকলা ও অভিনয়ে পারদর্শিতার জন্য সহজেই থিয়েটারে অভিনেত্রীর মর্যাদা লাভ করেছে। স্বামী তার কাছে প্রভুমাত্র নয় যেহেতু জীবিকা অর্জনের বিবিধ উপায় তার জানা আছে এবং এ সম্পর্কে তার কোন শুচিবাই নেই। স্বামী ভুবনের লাম্পট্যকে সে একদিনের জন্যও সহ্য করেনি—তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। আবার এই ভুবন যখন সৎভাবে জীবন কাটানোর অঙ্গীকার করে চাঁপাকে নিতে এসেছে তখনই সে তার সঙ্গে ঘর করতে চলে গেছে। কোন আদর্শের দোহাই তাকে বাধা দেয়নি। আর এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্তে আসতেও তার সময়ও লাগেনি। থিয়েটার জীবনের একঘেয়েমিতে চাঁপাও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে তাই বৈষ্ণবধর্মে উৎসাহী হয়ে নামকীর্তনের মধ্যে একই সঙ্গে জীবিকা ও আনন্দের সন্ধানের চেষ্টা করেছে।

থিয়েটারে প্রথম দিন ক্লান্ত শ্রান্ত শুভাকে দেখেই চাঁপার মায়া হয়েছে। সে শুভাকে নিজের বাড়ীতে আশ্রয় দিয়ে কথাবার্তায় হাসিতে আনন্দে রসিকতায় শুভার দুঃখ-

যন্ত্রণার উপশম করতে চেষ্টা করেছে এমন কি শুভার কিছু কিছু বিরক্তিকর আচরণকেও সহ্য করেছে যার মধ্য দিয়ে চাঁপার হৃদয়ের কোমলতার পরিচয় পাওয়া যায়।
কাছে পাপপুণ্য কিছুটা অন্য ধাঁচের। শুভাকে পাপ সম্পর্কে সে বলেছে, 'পাপপুণ্য মনের কাছে। যেখানে ভালবাসা নেই, যেখানে পুরুষ-স্ত্রীর সম্বন্ধ মাত্রেই পাপ।" [পৃঃ ২১৭ দ্বিঃ সঃ]

নগেন শুভার প্রথম প্রেমিক হলেও তার চরিত্র অস্ফুট এবং গতিবিধিও নিষ্প্রাণ। শুভাকে সে প্রাচুর্যে ভরিয়ে দিতে চেয়েছে কিন্তু শুভা নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার পর তাকে ফিরে পাওয়ার জন্য তার ব্যাকুলতা খুবই চাপা ধরনের। কাহিনীতে সে যেন শুধুমাত্র শুভার উত্তরণের সোপান হিসাবেই রচিত হয়েছে। শুভাও নগেনকে প্রথম দেখে ভেবেছে এই যুবকই তার 'মুক্তির প্রথম সোপান'।

চপলা নগেনের স্ত্রী। সাধারণ নারীর মতই তার আচরণ। শুভাকে সে সবসময়ই হীন মনে করেছে এবং ঘৃণা করেছে কিন্তু স্বামীকে পরিপূর্ণভাবে পাওয়ার জন্য শুভার কাছেই নগেনকে ভিক্ষা চেয়েছে। নগেনের দোষ ত্রুটি মেনে নিয়ে তার এই চেষ্টা একনিষ্ঠ পাতিব্রত্যের নির্দেশ দেয়। কিন্তু চরিত্রটি গতানুগতিক। এ ধরনের চরিত্র বাংলা সাহিত্যে বিরল নয়।

আলোচ্য কাহিনীতে শুভার স্বামী নিবারণের চরিত্রের দুটি দিক দেখানো হয়েছে নিবারণ শুভাকে নিদারুণ কষ্ট দিয়েছে এবং অকথ্য অত্যাচার করেছে কিন্তু ভালবাসেনি একথা বলা যায় না। যদিও মত্তপ অলস নিবারণের ভালবাসার কোন বহিঃপ্রকাশ ছিল না। শুভা গৃহত্যাগ করার পর সেও বিবাগী হয়ে গৃহ ছেড়েছে এবং এই আঘাতেই তার জীবনে একটা আমূল পরিবর্তন এনেছে। সাধারণ বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন নিবারণ নতুন জীবনে এসে নূতন আনন্দ খুঁজে নিয়েছে এবং পাহাড়ী মেয়ে মৈলীকে নিয়ে ঘর বেঁধেছে। শুভার সঙ্গে পুনরায় দেখা হওয়ার পর নিবারণের সম্ভব ছিল না এই স্থায়ী সুখশান্তি ভাসিয়ে দিয়ে, বর্তমানের বিখ্যাত অভিনেত্রী সুদূর শুভার পেছনে অনিশ্চিতভাবে ফিরে যাওয়া। কিন্তু নিবারণের মনের তলায় যে শুভার প্রতি একটা ক্ষীণ প্রেমের স্মৃতি প্রবহমান মৈলীর কাছে তা নিবারণ গোপন রাখতে পারেনি।

মৈলী পাহাড়ী মেয়ে। একদা সে এক চা বাগানের সাহেবের রক্ষিতা ছিল। বিবাহের অনুশাসন তাদের সমাজে তীব্র নয়—ভালবাসা এবং একত্র বাস করাই তাদের সমাজে বিবাহের প্রচলিত বিকল্প ব্যবস্থা। এই নিয়মেই সে নিবারণের সঙ্গে সংসার গড়ে তুলেছে। সে সামান্য শিক্ষিতা কিন্তু তবু জীবনের অভিজ্ঞতায় বুঝেছে যে প্রচলিত ব্যবস্থা যাই থাকুক না কেন সমাজে বিবাহের একটা আলাদা স্বীকৃতি আছে, আভিজাত্য আছে এবং বন্ধন আছে। তাই নিবারণ সম্পর্কে তার যে আত্মবিশ্বাস ছিল শুভার আগমনে এবং পরিচয়ে তার সেই বিশ্বাসের মধ্যে ফাটল ধরেছে—সেই ফাটল সন্দেহের ফাটল। এই সন্দেহের সূত্র ধরেই সে শুভাকে ঈর্ষা করেছে, মনে মনে রূপের বিচারে শুভার সঙ্গে তুলনা করেছে আর সব চাইতে বেশী শঙ্কিত হয়েছে এই ভেবে যে শুভা নিবারণের

বিবাহিতা স্ত্রী। কিন্তু মৈলী যেমন সহজে ভালবাসতে পারে তেমনি ত্যাগ স্বীকারেও সে কুন্ঠিত নয়—তাই সে 'শুভার সমস্ত কথাবার্তা ওলটাইয়া পালটাইয়া দেখিয়া সাব্যস্ত করিল যে শুভা স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া সুখী নয়, এই পলায়িতা অপরাধিনী পত্নীর উপর নিবারণের মনও বিমুখ নয়। ভাবিয়া সে স্থির করিল সে ইহার প্রতিকার করিবে। সে স্বামী-স্ত্রীর পুনর্মিলন ঘটাইয়া দিবে।' [পৃঃ ২৬৪ দ্বিঃ সঃ] এইখানেই মৈলীর রক্তমাংসের শরীরের সঙ্গে আদর্শের সংমিশ্রণ ঘটেছে।

সুরেশবাবু থিয়েটারের ম্যানেজার ও পরিচালক হিসাবে পরিচিত হলেও আসলে তিনি শিল্পী। শুভার প্রথম দিনের ভয়বিহ্বল অভিনয় দেখেই তিনি শুভার শিল্পীসত্তাকে আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন—বস্তুতঃ তিনিই শুভাকে অভিনয়জগতে নিয়ে এসেছেন। শুভার লেখাপড়ার উপর প্রীতি লক্ষ্য করে তিনি যত্ন করে শুভাকে সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। শুভাকে তিনি যতই দেখেছেন ততই আশ্চর্য হয়েছেন এবং কালক্রমে আবিষ্কার করেছেন যে শুভার ভালবাসাই তার কাম্য অথচ দীর্ঘদিন থিয়েটারের বিভিন্ন নারীদের সংস্পর্শে এসেও এ বাসনা তাঁর কোনদিন মনে জাগে নি। শুভা সুরেশবাবুর ভালবাসাকে প্রত্যাখ্যান করেছে, কিন্তু উদার প্রৌঢ় সুরেশবাবু শুভাকে কখনো ভুল বোঝেননি শুভাকে তাঁর থিয়েটারে নিয়ে আসার পর দিন দিন তাঁর লাভের অংশ স্ফীত হয়েছে এবং সুরেশবাবুর প্রগতিশীল মন বলেছে, 'এই টাকার উপর তার একার কোন অধিকার নেই।' এ সম্পর্কে শুভা ও চাঁপাকে তিনি বলেছেন 'আমি এটাকে সমবায়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করতে চাই,...ন্যায়ত ধর্মত আমার এতে কোন অধিকার নেই। আমি প্রকৃত প্রস্তাবে এই তোমাদের সবাইকে খাটিয়ে অন্যায়ভাবে লাভ করছি—এটা Exploitation, আমি কেন এ করতে যাব।' [পৃঃ ২৩১। ২৩২ দ্বিঃ সঃ] শুভার প্রত্যাখ্যানের পর শুভাকে তিনি বলেছিলেন—'আমি কেবলই দিয়ে খুসী, তোমার কোন কিছুই আমি চাই না।' [পৃঃ ১২৬ দ্বিঃ সঃ] কিন্তু তিনি কথা রাখতে পারেন নি, যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত হয়ে শুভার কাছে আশ্রয় নিয়েছেন—হৃদয়কে অস্বীকার করতে পারেন নি। যদিও শুভার কাছে সুরেশবাবুর ফিরে যাওয়ার মধ্যে একটা সুস্পষ্ট অভিমান ছিল। শুভার কাছে পৌঁছে তাই তিনি বলেছেন—'যেদিন জগত [ডাক্তার] আমাকে গোপনে বলে গেল যে এখানকার সর্বময়ী তুমি, সেদিনই আমি স্থির করলাম যে এখন এখানে আমার আসতেই হবে, বাঁচতে নয় শুভা মরতে এসেছি আমি। [পৃঃ ২৭৩ দ্বিঃ সঃ]

শুভা গৃহত্যাগের পর আশ্রয় ও উৎসাহ পেয়েছে চাঁপার, কিন্তু তার মানসিক উন্নতি সম্ভব হয়েছে সুরেশবাবুর চেষ্টায়। সুরেশবাবুর শিক্ষা না পেলে শুভা হয়ত হারিয়ে যেত দশজনের ভীড়ে এবং সুরেশবাবুই শুভা উপন্যাসের প্রধান পুরুষ চরিত্র।

'শুভা' উপন্যাসের গঠন কৌশল সম্পর্কে জনৈক সাহিত্যসমালোচক লিখেছেন—'এই উপন্যাসে মননধর্মী রচনার একটি অভিনব প্যাটার্ন লক্ষ্য করা যায়, যা পরবর্তীকালে বাংলা দেশে ব্যাপকভাবে অনুসৃত হয়েছে। জীবন সম্পর্কে বা কোন একটি সমস্যা সম্পর্কে

নায়ক বা নায়িকার মনে একটি প্রশ্ন জাগ্রত হল, তার জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা সেই প্রশ্নটির উপর নানাভাবে আলোক নিক্ষেপ করল, এবং তারই ফলে প্রশ্নটি সম্পর্কে শেষ পর্যন্ত সে একটি সুচিন্তিত সিদ্ধান্তে পৌছতে পারলো।

……যতদূর মনে হয় 'শুভাই' এই প্যাটার্নের সর্বপ্রথম সার্থক প্রয়োগ, এবং নরেশচন্দ্র পথিকৃতের দাবী করতে পারেন।'[১৮]

শুভা উপন্যাসে ঘটনার বাহুল্য অস্বীকার করা যায় না। শুভা তার আদর্শের সন্ধানে অতিমাত্রায় তৎপর, 'তাহার স্বামিগৃহ ত্যাগ, স্বাধীন জীবনস্পৃহা, নাট্য ব্যবসা অবলম্বন, প্রণয়াকাঙ্ক্ষা, সমাজসেবার ব্রত গ্রহণ এ সমস্তই যেন অতর্কিত বন্যা প্রবাহের মত তাহার জীবনে হুড়মুড় করিয়া আসিয়া পড়িয়াছে"[১৯]; কিন্তু এরকম ঘটনাবহুল জীবন বাস্তবে বড় একটা দুর্লভ নয়, আর কোন একটি বিশেষ আদর্শকে রূপ দেওয়ার জন্য লেখক শুভা চরিত্র সৃষ্টি করেন নি।[২০] স্বাভাবিক কারণে তাই উপন্যাসে বিভিন্ন বৃত্তি ও পরিবেশ বর্ণিত হয়েছে। নরেশচন্দ্র এই উপন্যাসে দেখাতে চেয়েছেন নারী সম্পর্কে কয়েকটি বাস্তব সমস্যা। শুভার জীবনে ছিল তিনটি আকাঙ্ক্ষা—মুক্তি, আত্মনির্ভরশীল হওয়া ও জীবনকে সার্থক করা। বাস্তবধর্মী লেখক শুভার সব আকাঙ্ক্ষাই মিটিয়েছেন কেননা তিনি জানতেন যে এই সহজ ফরমুলায় মূল সমস্যার সমাধান হয় না। এই সমাজ ব্যবস্থায় তা সম্ভবও নয়। তাই অন্তরে তিনটি বিষম ক্ষত নিয়েই শুভাকে বাঁচতে হয়েছে—সে বঞ্চিত হয়েছে মাতৃত্বের গৌরব থেকে, গৃহবধূর গৌরব থেকে এবং প্রেমিকার গৌরব থেকে। তার জীবনে আসলে কোন পরিপূর্ণতা আসেনি, সেবাধর্মের মধ্যে সে শুধু সান্ত্বনা খুঁজেছে মাত্র।

নরেশচন্দ্র সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে অচ্যুত গোস্বামী লিখেছেন—'নরেশচন্দ্র নিঃসন্দেহে আদর্শবাদী সংস্কারপন্থী ছিলেন। অর্থাৎ এদেশে একটি সুস্থ সুন্দর উন্নতিশীল সমাজ গড়ে উঠুক এ কামনা তাঁর মধ্যে অত্যন্ত প্রবল ছিল। তাই বলে কতকগুলি সহজ ফরমুলার দ্বারা সমাজের গভীরে প্রবিষ্ট সমস্যার সমাধান করা যায় এ বিশ্বাস তাঁর ছিল না। সমস্যা যে গভীরে প্রোথিত, এবং তার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য সমাজের ভিত্তি স্থানীয় মূল নীতির পরিবর্তন দরকার এ বোধ তাঁর ছিল। এ প্রয়াস যে কত দুরূহ তা তিনি জানতেন। তিনি এও জানতেন যে মানবচরিত্রের মধ্যে এমন কতগুলি জটিল গ্রন্থি আছে যেগুলি সংস্কার প্রয়াসের পথে বিষম বাধা।'[২১]

'রক্তের ঋণ' নরেশচন্দ্রের একটি দুঃসাহসিক উপন্যাস। উপনাাসটির রচনা ও প্রকাশকালে[২২] তিনি ঢাকায় ছিলেন। সমকালের বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে এ ধরনের উপন্যাস দ্বিতীয় রহিত। একালেও এই ধরনের সাহসী রচনার জুড়ি মেলা ভার।

আলোচ্য কাহিনীর নায়ক মাতার অবৈধ সন্তান। অনুরূপ চরিত্র বোধহয় আধুনিক বাংলা সাহিত্যে এখন পর্যন্ত দেখা দেয়নি। এছাড়াও এই কাহিনীতে লেখকের দুঃসাহস নানা দিক থেকে লক্ষণীয়।

নাগানন্দ সিদ্ধেশ্বরীর অবৈধ সন্তান। এই সিদ্ধেশ্বরী নামে ছিল জমিদার চৌধুরী বাড়ীর রাঁধুনী, কিন্তু তার আধিপত্য ছিল তার চাইতে অনেক বেশী। তার কারণ চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গে সিদ্ধেশ্বরীর অবৈধ সম্পর্ক। তাদের এই সম্পর্কের কথা যখন নাগানন্দের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ল, তখন নাগানন্দ তার মাকে নিয়ে চৌধুরী বাড়ী ছেড়ে ঢাকায় চলে আসে। সেখানে যদিও সে ব্রজনাথ বাবুর পাটের কারবারে একটি চাকরী জুটিয়ে নিয়েছিল, কিন্তু সে চাকরী নাগানন্দের বেশিদিন করা সম্ভব হয় না—তার মালিক ব্রজনাথবাবুর সঙ্গে সিদ্ধেশ্বরীর সম্পর্ক তাকে চাকরী ত্যাগ করতে বাধ্য করে। পরিণামে ব্রজনাথবাবুর আক্রোশ ও ষড়যন্ত্রে নাগানন্দের জেল হয়।

সিদ্ধেশ্বরী কিন্তু সংশোধনের অতীত। নাগানন্দ যতদিন জেলে ছিল ততদিন সিদ্ধেশ্বরী ব্রজনাথ এবং কালিদাস চৌধুরী উভয়ের সঙ্গেই অবাধে মেলামেশা করেছে। জেল থেকে ফিরে এসে নাগানন্দ তার মার সঙ্গে বাদানুবাদে জানতে পারে যে কালিদাস চৌধুরীই তার জন্মদাতা পিতা। এই সাংঘাতিক রূঢ় অপ্রিয় সত্য জানতে পেরে, বিপর্যস্ত ক্লান্ত নাগানন্দ সেই মুহূর্তেই গৃহত্যাগ করে। এরপর কিছুদিন অনির্দিষ্টভাবে ঘোরাঘুরি করার পর নাগানন্দ দুখীরাম ভট্টাচার্য নাম নিয়ে শ্যামসুন্দর রায়ের ব্যবসায় যোগ দেয় এবং সেখানে সততা ও কর্মদক্ষতা দেখিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে তোলে। এখানে অবসর সময়ে নাগানন্দ গভীর মনোযোগ দিয়ে ব্যবসা-ব্যণিজ্য, অর্থনীতি ও ইতিহাস পড়তে শুরু করে। কিছুদিন এভাবে চলার পর শ্যামসুন্দরবাবুর সাহায্যে ও পরামর্শে নাগানন্দ ব্যবসা করতে শুরু করে এবং প্রচুর অর্থ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই প্রতিষ্ঠা লাভের পরও কিন্তু নাগানন্দের মানসিক যন্ত্রণার উপশম হয়নি আর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজের চেহারা ও আচরণের সঙ্গে কালিদাস চৌধুরীর মিল খুঁজে পেয়ে সে আরও অসহায় ও ক্লান্ত হয়ে পড়ে। নাগানন্দ এই শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তি কিছুটা দূর করার জন্য দার্জিলিংএ বেড়াতে যায়, সেখানে তার পরিচয় হয় রেবা নামে এক ধনী পরিবারের মেয়ের সঙ্গে। এই পরিচয়ের পথ বেয়ে দুজনই দুজনার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। কিন্তু নাগানন্দ তার বিচারবুদ্ধিতে একথা সবসময়ই অনুভব করত যে, তার কলঙ্কিত জন্মবৃত্তান্তের জন্য সে কিছুতেই রেবাকে বিয়ে করতে পারে না। এই অবস্থায় নাগানন্দ ঠিক করে যে খনি দুর্ঘটনায় মৃত সাঁওতাল শ্রমিকের যে মেয়েটিকে সে লালন পালন করেছে তাকেই সে বিয়ে করবে এবং তার এই সংকল্পের কথা সে সাঁওতাল মেয়ে রূপসীকে জানায়। রূপসী যদিও এ ব্যাপারে কোন উৎসাহই প্রকাশ করে না। এদিকে রেবার আকর্ষণ তীব্রতর হতে থাকে বাধ্য হয়ে নাগানন্দ রেবাকে তার এই বিবাহের পরিকল্পনার কথা জানায়। রেবা কিন্তু নাগানন্দের এই ইচ্ছাকে কিছুতেই সমর্থন করতে পারে না, সে রূপসীর সঙ্গে দেখা করে কথাবার্তায় জেনে নেয় যে রূপসী নাগানন্দকে শ্রদ্ধা করলেও বস্তুতঃ তার নাগানন্দের প্রতি কোন প্রেমাকর্ষণ নেই। রেবা রূপসীর এই মনোভাব নাগানন্দকে জানিয়ে নিজের ভালবাসার দাবীতে নাগানন্দকে বিয়ে করতে চায়। নাগানন্দ কিন্তু তবু বিয়ের ব্যাপারে আপত্তি করে এবং এই আপত্তির কারণ

হিসাবে তার কলঙ্কিত জন্মবৃত্তান্তটি রেবার কাছে উল্লেখ করে। রেবা এ কাহিনী জানার পরও নাগানন্দকে বিয়ে করতে কোন আপত্তি করে নি।

নাগানন্দ ও রেবার বিয়ের পরও রূপসী নাগানন্দের বাড়ীতেই বসবাস করতে থাকে। রূপসীর প্রতি নাগানন্দের সহানুভূতি কিন্তু ক্রমশঃ মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। তাদের বিয়ের প্রায় বছরখানেক পর হঠাৎ একদিন নাগানন্দ রেবার অনুপস্থিতিতে রূপসীকে সহানুভূতি ও সান্ত্বনা জানাতে গিয়ে জন্মসূত্রে পাওয়া রক্তের উদ্দাম কামনাকে কিছুতেই দমন করতে পারে না। আর রূপসী নাগানন্দের দৈহিক সান্নিধ্যের স্মৃতিটুকু নিয়ে নাগানন্দের গৃহত্যাগ করে। সম্বিত ফিরে আসার পর নাগানন্দ রেবার কাছে তার কৃতকর্মের কথা প্রকাশ করে তার রক্তের ঋণের কথা স্বীকার করে।

এরপর নাগানন্দ মা সিদ্ধেশ্বরীকে পাগলের মত খুঁজে বেড়াতে থাকে। অবশেষে একদিন নাগানন্দ তার বোট থেকে নদীর ঘাটে একটি মেয়েকে ঘাটকাজ করতে দেখে। মেয়েটির সঙ্গে সিদ্ধেশ্বরীর অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখে নাগানন্দ বুঝতে পারে যে আজ তার মা সিদ্ধেশ্বরীর সে-রাত্রির শ্রাদ্ধ হচ্ছে। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য অবস্থায় ছুটে গিয়ে নাগানন্দ মেয়েটিকে তার নিজের পরিচয় দেয়। মেয়েটি কিন্তু তাকে তার বড় ভাই হিসাবে মেনে নিতে পারে না, বরঞ্চ বলে যে, তার সম্পত্তির লোভেই নাগানন্দ আত্মীয়তা পাতাতে চেষ্টা করছে। তার মায়ের কোন সম্পত্তিই সে পায়নি, সবই তার নিজের উপার্জিত। বস্তুত নাগানন্দের এই বোন পণ্য৷ নারী।

নাগানন্দ ফিরে আসে, চোখের জল ফেলেই সে তার মায়ের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানায়. কেননা তখন শুধু চোখের জলই তার রক্তের ঋণ শোধের শেষ উপায়।

আলোচ্য উপন্যাসে নরেশচন্দ্র প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা ও বংশমর্যাদাকে অর্থের মানদণ্ডে নতুন করে বিচার করেছেন। জমিদারী প্রথা তখনও সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়েনি কিন্তু আর্থিক মানদণ্ডে ব্যবসায়ী মহল হয়ে উঠেছে জমিদারের সমকক্ষ। তাই এই কাহিনীতে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে জমিদার কালিদাস চৌধুরীর সঙ্গে প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমে পড়েছে ব্যবসায়ী ব্রজনাথবাবু। যে জাতকুলের মর্যাদা নিয়ে আমরা গর্ব করে থাকি লেখক তার অন্তঃসারশূন্যতা প্রমাণ করতে সমর্থ হয়েছেন এবং সেজন্যই জমিদার কালিদাস চৌধুরী বা বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ব্রজনাথবাবুকে পাঠক কখনোই সম্মানিত মনে করবে না। অথচ অকৌলীন্য নিয়ে জন্মে রাঁধুনী পুত্র নাগানন্দ পাঠকদের সহানুভূতি শেষ পর্যন্ত পেয়েছে। নাগানন্দের বংশমর্যাদা ছিল না কিন্তু অর্থ, বিদ্যা ও ব্যবহারের কৌলীন্যে সে সামাজিক কৌলীন্যকে অনায়াসে অতিক্রম করেছে। আমাদের সমাজের বিত্তশালী শ্রেণীর যে সমস্ত চারিত্রিক দুর্বলতা ও লাম্পট্য সমাজের অরক্ষিত নারীদের জীবনে নানারকম অবাঞ্ছিত জটিলতা এনে দিত এবং দিয়ে থাকে সেই ইঙ্গিতও এই কাহিনীতে বিবৃত হয়েছে। আর সমাজে সম্পদ উৎপাদনের সঙ্গে যারা প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত তাদের যে আমাদের এই ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা নিয়মিত শোষণ করে চলেছে সেই

সত্যটিও লেখক এই উপন্যাসে পরিস্ফুট করেছেন। অর্থাৎ এই উপন্যাসে লেখকের সমাজনীতি ও অর্থনীতি বিষয়ক চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়।

'রক্তের ঋণ' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র নাগানন্দ। আমরা প্রথম নাগানন্দকে চৌদ্দ বছরের বালক হিসাবে দেখতে পাই যে অভিধান অন্তর্গত একটি শব্দের অর্থ জানতে চেয়ে পেয়েছে নির্যাতন, তখন সে সহজ সরল এক গ্রাম্য বালক। তারপর স্কুল ও চৌধুরী বাড়ীর আবেষ্টনী তাকে খুব দ্রুত রূপান্তরিত করেছে। যে তার জিজ্ঞাসার উত্তর নিজেই স্থির করতে পেরেছে। তাই বয়সে বালক হলেও সে বার বার চেয়েছে তার মাকে চৌধুরী বাড়ীর পাপপঙ্ক থেকে উদ্ধার করতে। কেননা ঐ নবীন বয়সেই ভালমন্দ সম্পর্কে তার একটা বোধ গড়ে উঠেছিল। তার জন্মের ইতিবৃত্ত ও জন্মদাতার পরিচয় জানার পর তাই—'নাগানন্দ আকাশ হইতে মাটিতে পড়িয়া গেল। তার যেন দাঁড়াইবার আর আশ্রয় রহিল না। হায়, হায়, যে পাপের বিরুদ্ধে সে লড়িতে চাহিয়াছে, সেই পাপ যে তার রক্তের ভিতর, তার অস্থি মজ্জায়, তার শিরায় শিরায় জীবনপ্রবাহে বহিতেছে।' [পৃঃ ২৬] লেখকের এই অভিব্যক্তি যেন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্ম ইতিহাস, সামন্ততান্ত্রিক অসুস্থ পাপ প্রবাহে এর সৃষ্টি। হয়ত এই ইতিহাসের হেরফের আছে—কোথাও পাপ, কোথাও কৌলীন্যের—কিন্তু তারা প্রায় সবাই জমিদার শ্রেণীর ভগ্নাংশ। লেখকের এই দৃষ্টিভঙ্গীর পেছনে সমাজবিজ্ঞানের জিজ্ঞাসা কাজ করেছে এবং লেখকের এই বক্তব্য পুরোপুরি অস্বীকার করা যায় না। অর্থের মানদণ্ডে যে সমাজের কৌলীন্য ভেসে যায় তা প্রমাণ করার জন্যই তিনি নাগানন্দকে দিয়ে সামান্য কাজ দিয়ে জীবন শুরু করলেও শেষ পর্যন্ত ধনপতি ব্যবসামালিক করে তুলেছেন এবং অভিজাত বংশের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়েছেন। বাস্তবধর্মী লেখক সে যুগের বাংলা উপন্যাসের প্রচলিত নিয়মে জমিদার বা একদা জমিদার অথবা আত্মীয়তাসূত্রে জমিদারের ভগ্নাংশ নায়ক চরিত্র গ্রহণ না করে বেছে নিয়েছেন এমন একটি চরিত্র যে নাকি অসামাজিক সম্বন্ধে জমিদার বংশজাত। আর লেখকের আদর্শ ও সতর্কতায় নায়কের মধ্যবিত্ত মানসিকতার মধ্যে শ্রেণী সচেতন সমাজতান্ত্রিক জিজ্ঞাসা প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। তাই দেখা যায়—'পাটের ব্যবসার উপর নাগানন্দ বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সে দেখিল যে পাটের কারবার একটি উচ্চ অঙ্গের জুয়াখেলা। ইহার লাভালাভ কেবল অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে। অর্থনীতি পড়িয়া সে আরও স্থির করিয়াছিল দেশের সমৃদ্ধি বাড়ে ধনসৃষ্টিতে। কিন্তু পাটের কারবারীরা ধন সৃষ্টি করেন [না][২৩] তাহার হস্তান্তরের সহায়তা করেন মাত্র। এই কাজের জন্য তাহারা যে লাভ পান তাহা জুয়াখেলার লাভের মত অত্যধিক। ফলে যারা পাট উৎপাদন করে সেই চাষীরা তাহাদের শ্রমের যোগ্যমূল্য পায় না—ইহা একরকম চাষার রক্ত চুষিয়া খাওয়া—exploitation' [পৃঃ ৩৭] জোতদারদের এই শোষণের কথা ইতিপূর্বে হয়ত কোন উপন্যাসেই এভাবে বলা হয়নি। স্মর্তব্য এই উপন্যাসের রচনাকাল ১৯২১-২২, বলশেভিক বিপ্লব তখনও শেষ হয়নি এবং এদেশে সোস্যালিজমও জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি। লেখকের আদর্শেই নাগানন্দের এই মানসিক

চিন্তাভাবনার পরিবর্তন হয়েছে। বিরাট খনি ও ব্যবসার মালিক হয়েও নাগানন্দের—'অনেকদিন আগের কথা মনে হইল যখন সে পাটের ব্যবসায়—exploitation বা রক্তশোষণের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া তাহা পরিত্যাগ করিয়াছিল। এখন সে আবিষ্কার করিল যে তার বর্তমান ব্যবসায়ও সেইরূপ রক্তশোষণের উপর প্রতিষ্ঠিত।' [পৃঃ ৬৫] নাগানন্দ—Robert Owen (1775-1855)-এর আদর্শ নিয়ে তার নিজের শ্রমিকদের অনেক সুবিধা সুযোগ করে দিয়েছিল সত্যি কিন্তু এ কথাও সে ভেবেছে যে—'খনির এই লাভের ষোল আনাই শ্রমজীবী ও মহাজনের ন্যায্য পাওনা নয়। খনিজবিত্ত সমস্তই জাতির সম্পত্তি।' [পৃঃ ৬৬] সমাজ কল্যাণের বিভিন্ন চিন্তাভাবনা তার ব্যক্তিগত জীবনকে নানা জিজ্ঞাসায় উন্মুখ করে তুললেও এবং সে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেও প্রতি মুহূর্তেই নাগানন্দ তার জন্মরহস্যের জন্য গ্লানিবোধ করেছে। নাগানন্দ আয়নায় নিজের মুখের সঙ্গে জমিদার কালিদাস চৌধুরীর মুখের আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখে বার বার উত্তেজিত হয়েছে, নিজের কণ্ঠস্বরে চমকে উঠেছে কিন্তু সবকিছুকে স্বীকার করে নিয়ে একটা আদর্শ নিয়ে বাঁচার সুতীব্র ইচ্ছা তাকে কর্মশক্তি ও উদ্দীপনা জুগিয়েছে। সে সমাজকে কখনো নিস্পৃহ নিরাসক্ত দৃষ্টিতে দেখেছে কখনো বা বর্জন করেছে সচেতন অনীহায় কিন্তু প্রশ্নহীন ভাবে নয়। এদিক দিয়ে নাগানন্দের চরিত্র অতি আধুনিক।

নরেশচন্দ্রের সমগ্র কথাসাহিত্য পাঠ করে আমরা দেখেছি যে বংশক্রম সম্পর্কে একটা কৌতূহল তাঁর বরাবরই রয়েছে। আবেষ্টনী ও পরিবেশ মানুষকে কতটা তার বংশক্রমকে অতিক্রম করতে সহায়তা করে এই প্রশ্ন তিনি তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। এখানেও নায়ক নাগানন্দ চৌধুরীবাড়ীর পাপ পরিবেশকে ত্যাগ করেছে কিন্তু কালিদাস চৌধুরী ও সিদ্ধেশ্বরীর রক্তের তাড়নাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে পারেনি। অর্থাৎ সে যে রক্তের ঋণে ঋণী তা প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। সাঁওতাল যুবতী রূপসীর প্রতি নাগানন্দের সহানুভূতির পথ যেকোন মুহূর্তে আশ্চর্য বাঁক নিতে পারে লেখক সে সাবধান বাণীর উল্লেখে বলেছেন—'যুবকের পক্ষে কোন যুবতীর প্রতি সহানুভূতি একটা পিছল সিঁড়ির মত বড় ভয়ানক। কখন যে এই সমবেদনা আরও কোমল গ্রামে সুর বাজাইতে লাগিল তাহা নাগানন্দ টেরই পাইল না। কালিদাস চৌধুরী ও সিদ্ধেশ্বরী তাদের রক্তের ঋণের তমসুক লইয়া যখন তাহার অন্তরের কাছে হাজির হইল তখন নাগানন্দের রক্ত মাংস যে সে দেনা সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়া লইয়াছে তাহা নাগানন্দ শীঘ্র বুঝিতে পারিল না।' [পৃঃ ১০৫] রূপসীকে সান্ত্বনা জানাতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত তাই—'নাগানন্দের রক্তেরই জয় হইল, সে সম্বিৎ হারাইল।' [পৃঃ ১০৭] এমন সময় রেবার মোটরের শব্দে তার সম্বিৎ ফিরে এসেছে এবং সেই শব্দে 'নাগানন্দের দুই কানে কালিদাস ও সিদ্ধেশ্বরীর বিদ্রূপের অট্টহাস্য ধ্বনিত হইল, সে আপনার রক্তে মাংসে অস্থি মজ্জায় তাহাদের সাম্রাজ্য অনুভব করিয়া একেবারে বসিয়া পড়িল।' [পৃঃ ১০৮] ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের সচেতন অবচেতন-এর দোলাচলতা যেন নাগানন্দের

কর্মে ও ভাবনার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। নাগানন্দ তার এই ঘটনার জন্য অপরাধ বোধ করেছে এবং স্ত্রী রেবার কাছে 'বসিয়া বিষাদভরা কণ্ঠে তার পাপের কাহিনী বলিয়া গেল।' [পৃঃ ১০৮]

নাগানন্দ নানা আধুনিক চিন্তায় ও জিজ্ঞাসায় উন্মুখ হলেও প্রাচীন আদর্শ ও প্রচলিত মূল্যবোধকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে পারেনি তাই যে রক্তের ঋণ তার ধমনীতে প্রবাহিত সেই ঋণ কিছুটা পরিশোধ করার জন্য পাগলের মত তার জননীর অন্বেষণ করেছে এবং জননী তার কাছে জননী হয়েই থেকেছে। তে-রাত্রির শ্রাদ্ধরতা ভগ্নীর দিকে চেয়ে 'তার মনে পড়িল সিদ্ধেশ্বরী তাহাকে কত ভালবাসিত। কোনও দিন সে তাহাকে একটি কটু কথা বলে নাই। বাপ বাছা ছাড়া তার মুখে অন্য কথা ছিল না, আর তার পাপের যা কিছু অর্জন তাহা সে পুত্রের অন্যায় আবদার রক্ষার জন্যও অকাতরে ব্যয় করিয়াছে। মনে পড়িল সে যখন চতুর্দশ বর্ষীয় বালক তখন তাহার মাতা ভরা যৌবনে পাপের পথ পরিত্যাগ করিয়া কেবল তাহারই জন্য বিনা বিচারে তার সর্বস্ব ফেলিয়া ফকীর ছেলের হাত ধরিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছিল। তারপর আবার তাহার পদস্খলন হইয়াছিল সত্য, সে কথায় সে তার নিজের উপলব্ধ দুর্বলতা লইয়া আজ আর ঠিক পূর্বের মত কড়া বিচার করিতে পারিল না। বরং তার কানে কেবলই বাজিতে লাগিল তার মায়ের শেষ কথা তার পিছু পিছু তার করুণ আবেদন ও আর্তনাদ। তার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল।' [পৃঃ ১১৩]

রেবা ধনী পরিবারের শিক্ষিতা মেয়ে। সে দুবার ত্যাগ স্বীকার করেছে কিন্তু তার ত্যাগ স্বীকার নিঃস্বার্থ ছিল না, বরঞ্চ সাঁওতাল শ্রমিককন্যা রূপসীর ত্যাগ স্বীকার সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ এবং সেই জন্য সে উপন্যাসে স্বল্প পরিসর পেলেও পাঠকদের সহানুভূতি লাভ করেছে। নাগানন্দের জন্মরহস্য তার রূপ, বৈভব ও অর্থের জন্য রেবার কাছে অর্থশূন্য মনে হয়েছে আর তার চরিত্রের স্খলন স্ত্রী হিসেবে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় কোথায়? কিন্তু রূপসী বরাবরই শুনে এসেছে যে সে নাগানন্দের বাগদত্তা তবু সে তার অধিকার ছেড়ে এমন কি নাগানন্দকে বিন্দুমাত্র অভিযুক্ত না করেই গৃহত্যাগ করেছে, এইখানেই তার ত্যাগের মহত্ত্ব।

সিদ্ধেশ্বরীর আচরণ কাহিনীর প্রথমদিকে স্বাভাবিক। তার মধ্যে তখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে জননীসুলভ পুত্রস্নেহ ও নারীসুলভ অপরাধবোধ। প্রথম দিকের যে সিদ্ধেশ্বরীর 'দাপটে চৌধুরী বাড়ীর গিন্নি হইতে চাকরটা পর্যন্ত সবাই ভয়ে কম্পমান হইয়া থাকিত সে আজ একফোঁটা ছেলের কাছে কেঁচোর মত নত হইয়া গেল।' [পৃঃ ৪]...'সে তার চৌদ্দ বছরের গৃহের দিকে তৃষিত দৃষ্টি দিয়া এই নাবালক শিশুর আদেশে তার আশ্রয় গৃহ ছাড়িয়া চলিয়া গেল।' [পৃঃ ৬] সেই সিদ্ধেশ্বরী কাহিনীর পরের দিকে যেন একটা অপরাধীর চরিত্রে পরিণত হয়েছে। 'পাপের ছাপের' মনোরমা চরিত্রের মত সেও যেন জন্মঅপরাধিনী। তার অপরাধবোধও যেন ক্রমশ বিলীন হয়ে গিয়েছে, হতে পারে বাসনা কামনা সহ সুন্দরী অরক্ষিতা এই বিধবা নারী সিদ্ধেশ্বরীকে লেখক ইচ্ছাকৃত-

ভাবে প্রচলিত মাতার আদর্শে অঙ্কিত করেন নি এবং করতে চেষ্টাও করেন নি বরং সিদ্ধেশ্বরীর রূপের বর্ণনায় লেখক লিখেছেন 'সিদ্ধেশ্বরী সুন্দরী। ত্রিশ বছরে তার যৌবনের ঢল ঢল লাবণ্য এতটুকু টোল খায় নাই। এখনও তার গৌরবর্ণের ভিতর দিয়া যেন রক্ত ফাটিয়া বাহির হইতেছিল। তার টকটকে লাল পুষ্ট ওষ্ঠাধরের ভিতর দিয়া লালসার বহ্নি ধক ধক করিয়া জ্বলিতেছিল, আর তার আনত দীর্ঘ পক্ষ্মযুক্ত সুবৃহৎ চক্ষুর তারকার ভিতর এখনও সর্বনাশকর বিদ্যুৎ চমক দিতেছিল।' [পৃঃ ৬] লেখকের এই বর্ণনা যেন নাগানন্দের মায়ের বর্ণনা নয়। ব্রজনাথ বা কালিদাসবাবুর নায়িকার বর্ণনা। যে নায়িকা লেখক ও পাঠকদের কাছে বিন্দুমাত্র অনুকম্পা ও সহানুভূতি পায়নি।

'শাস্তি' নরেশচন্দ্রের পুস্তকাকারে প্রকাশিত পঞ্চম গ্রন্থ।[২৪] উপন্যাসটির কাহিনীকাল গান্ধীজীর অসহযোগ—অহিংস আন্দোলনের কাল। মনে হয় এই আন্দোলনের ঠিক পরবর্তী সময়ই এই কাহিনীর রচনাকাল।

গান্ধীজীর আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গ যে গৃহবধূদেরও বাইরে নিয়ে এসেছিল নায়িকার চরিত্রে তার পরিচয় পাওয়া যায়। এই আন্দোলনের সমাপ্তির পর, দেশে যে এক নিস্তরঙ্গ অবস্থা দেখা দিয়েছিল সে বর্ণনাও উপন্যাসটিতে প্রতিফলিত হয়েছে।

উকিল শুভেন্দু রায়ের স্ত্রী গোপা গান্ধীজীর আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সেই সূত্রে কমল নামে এক রূপবান যুবকের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠে। এই অন্তরঙ্গতা চরম পর্যায়ে পৌঁছোয় যখন কমল ও গোপা জেল থেকে পালিয়ে প্রায় ছমাস এক নিভৃত গ্রামে গিয়ে বসবাস করতে শুরু করে এবং নানা মানসিক বিপর্যয়ের ফলে কমল ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে গোপাকে বিয়ে করতে চায়। গোপা মনে মনে কমলকে কামনা করলেও কমলের এই অভিপ্রায়কে প্রত্যাখ্যান করে এবং প্রথম সুযোগেই স্বামীগৃহে ফিরে যায়।

গোপা ফিরে এলে শুভেন্দু কিন্তু তাকে সরাসরি গ্রহণ করতে পারে না, নানা আনুষ্ঠানিক প্রায়শ্চিত্তের ভিতর দিয়ে গোপাকে পাপমুক্ত হতে নির্দেশ দেয়। অবশ্য সে নিজেও মানসিক যন্ত্রণায় কাতর হয়ে কৃচ্ছ্রসাধনায় দিন কাটাতে থাকে। গোপা শুভেন্দুর এই নির্দেশ পালন করলেও, এই নির্দেশকে প্রেমহীন শাস্তি ছাড়া অন্য কিছু ভাবেনি। দীর্ঘদিন ব্রহ্মচর্য পালন ও স্বামী সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে থাকতে ক্রমশ গোপার মন সম্পূর্ণ নিঃসাড় হয়ে পড়ে এবং স্বামী সংসারের উপর তার আর কোনো আসক্তিই অবশিষ্ট থাকে না। তারপর শুভেন্দু পুনরায় যখন তাকে স্ত্রীর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করতে চায় তখন গোপার পক্ষে শুভেন্দুর সে ডাকে সাড়া দেওয়া সম্ভবপর হয়নি। সমস্ত লৌকিকতার ঊর্ধ্বে এক পারমার্থিক চিন্তায় গোপা তখন মগ্ন।

'শাস্তি' উপন্যাসের কেন্দ্রচরিত্র গোপা অতি সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ননারী। জীবনের সব কটি স্তরেই সে পরিবেশের প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউএ, শুভেন্দুর সমর্থন না থাকা সত্ত্বেও সে সহজেই ভেসে পড়েছে। কাহিনীর প্রথম দিকে কমলের প্রতি গোপার আচরণ মাতৃসুলভ কিন্তু তার স্বাভাবিক চপলতা তাকে

মাতৃত্বের আসনে স্থির থাকতে দেয়নি। যদিও কমলকে সে বলেছে 'পাগল ছেলে' কিন্তু পরমুহূর্তেই কমলের স্পর্শে সে লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে। উপন্যাসে বিবৃত গোপার জীবনে দেখা যায় তিনটি কাম্যবস্তু—'স্বামী অসহযোগ ও কমল', কিন্তু বিভিন্ন ঘটনা সংস্থানে গোপার চরিত্রে দেখা গেল যে স্বামী ও অসহযোগ আন্দোলনকে অতিক্রম করে তার আচরণ হয়ে উঠেছে সম্পূর্ণ দেহভিত্তিক এবং তার আশ্রয় কমল। গোপার কমলের কাছে মানুষের স্বষ্ট লজ্জা, দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পবিত্রতা ও স্বল্প আচ্ছাদন সম্বন্ধে বক্তৃতার মধ্যে তার চিন্তার পরিচয় প্রকট হয়ে উঠেছে এবং তার এই দেহভিত্তিক মনোভাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যখন গোপা কমলের সামনে স্বল্প আবরণ পরে এগিয়ে এসেছে এবং সেই পোশাক প্রদর্শন করে তৃপ্তি পেয়েছে। জেলে থাকাকালীন গোপা জেলের অন্যান্য অপরাধিনী মেয়েদের অশ্লীল কথাবার্তা শুনেছে এবং বিস্মিত হলেও তা বিশ্বাস করেছে, ফলে জেলের নিভৃত কক্ষে তার চিন্তা ভাবনা সবই কমলকে নিয়ে এবং দেহাশ্রিত।

শুভেন্দুর প্রতি গোপার আচরণ বেশ কিছুটা অসঙ্গতিপূর্ণ। গোপা স্বামীকে সেবা করত, দুজনার মধ্যে ভালবাসার অভাব ছিল না, স্বামী স্ত্রীর মনে শান্তিও ছিল তবু গোপার বাইরের প্রতি একটা অসম্ভব রকমের আকর্ষণ কেন যে শুভেন্দুর মতামতকে অগ্রাহ্য করেছে তার কারণ স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। নিঃসন্তান গোপার মনে কোন দুঃখ দৈন্য ছিল ছিল না, সে ছিল অসংযত উদ্দাম কিন্তু কমলের সঙ্গে অজ্ঞাতবাসের সময় সে যথেষ্ট সংযমের পরিচিয় দিয়েছে। কমলকে সে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে কমল একদিন তাকে মা বলে ডাকতো এবং কমলের বিবাহের প্রস্তাবকে সে দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। শুভেন্দুর গৃহে ফিরে আসার পর ব্রহ্মচর্য পালনের মধ্য দিয়ে তার মানসিক সংযম ও শুচিতা পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

কমল গোপার মত চঞ্চল বা অস্থির নয়, তার কোন আচরণ আকস্মিক নয়। প্রথম থেকেই সে সুন্দরী গোপার প্রতি একটা তীব্র আকর্ষণ অনুভব করেছে এবং বার বার গোপার সান্নিধ্য লাভের চেষ্টা করেছে। এর পিছনে প্রথমদিকে কমলের অজুহাত ছিল দেশের কাজ এবং পরে তা হয়ে উঠেছে জীবনের প্রয়োজন। তার রূপ ও স্বাস্থ্যের বর্ণনা উপন্যাসে বার বার বিবৃত হলেও প্রকৃতপক্ষে দেখা যায় যে মানসিক দিক দিয়ে সে মোটেই সজীব ও শক্তিমান নয়। কাহিনীর শেষ অংশে ব্রহ্মচারীর কাছে তার স্বীকারোক্তি স্পষ্ট হলেও দুর্বল এবং অস্বাভাবিক। এই স্বীকারোক্তি যেন গোপার সতীত্বকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যই বলা। কমলের চরিত্রটির যেন আলাদা কোন সত্তা নেই। তার পুলিশের হাত থেকে গোপাকে উদ্ধার, জেল থেকে গোপাকে নিয়ে পালান বা কলিমদ্দি নাম নিয়ে কৃষক জীবন যাপন সব কিছুর কারণই গোপা।

শুভেন্দু আদর্শবাদী পুরুষ, তার একমাত্র দুর্বলতা যে সে অতিমাত্রায় ভালো মানুষ, গোপাহীন সংসারের বিরক্তিকর পরিবেশ থেকে সে সাময়িক মুক্তি খুঁজেছে আরাবেলার সান্নিধ্যে কিন্তু স্ত্রীর প্রতি তার একনিষ্ঠতা তাকে মোহগ্রস্ত করে তোলেনি। গোপা গৃহে

ফিরে আসার পর যে ধর্মীয় অনুশাসনের মধ্য থেকে বেছে নিয়েছে গৃহত্যাগিনী স্ত্রীর পরিশোধন পদ্ধতি এবং নিজের হৃদয়বৃত্তির তাড়নাকে দমন করেছে, কষ্ট স্বীকার করে নিজেকে গোপার সংসর্গ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। অন্তর্মুখী শুভেন্দু বহির্মুখী গোপাকে কখনোই কোন কাজে তেমন করে বাধা দিতে পারেনি এবং এই কারণেই শেষ পর্যন্ত তার বিবাহিত জীবন সুখের হতে পারেনি। শুভেন্দুর চরিত্রের ভারসাম্য স্থিতিশীল ও নিরুত্তাপ—সে যেন রক্ত মাংসে গড়া মানুষ নয় এক আদর্শ স্বামীর প্রতীক।

এই কাহিনীতে সবচাইতে অদ্ভুত ও অবাস্তব চরিত্র মিসেস চ্যাটার্জী বা আরাবেলার। ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের এই যুবতী বিধবার প্রেমের পাঠ পড়ানোর জন্য যুবক অন্বেষণ খুবই অবাস্তব এবং কাহিনীতে এই চরিত্রের কোন প্রয়োজন ছিল না। এই প্রেমাভিজ্ঞা নারীর অল্প পরিচিত শুভেন্দুর প্রতি প্রেম নিবেদন নিতান্তই অস্বাভাবিক।

এই উপন্যাসে যে পরিবেশ বর্ণিত হয়েছে সেই পরিবেশকে অস্বীকার করে কোন চরিত্রই তাদের স্বাতন্ত্র্য নিয়ে চলাফেরা করতে পারেনি। গোপা ও কমলের আচরণও পরিবেশের তারতম্যে রূপান্তরিত হয়েছে মাত্র। গান্ধীজীর পরিচালিত অসহযোগ অহিংস আন্দোলন এই কাহিনীর পটভূমি হিসাবে লেখক ব্যবহার করলেও তিনি নিজে এই আন্দোলনে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাই শুভেন্দুর ভাবনায় লেখক বলেছেন—'অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে যে দেশের অভ্যুত্থান সম্ভব নয় এ বিশ্বাস তার ছিল।' লেখকের বিশ্বাস ছিল যে অহিংস আন্দোলনের গতি পরিবর্তিত হতে বাধ্য এবং একথা প্রতিষ্ঠা করার জন্যই তিনি গোপার উপর অত্যাচাররত পুলিশের উপর কমলের সহিংস আচরণকে তুলে ধরে এক বাস্তব দৃষ্টান্ত দিয়েছেন।

জেলের মধ্যে গোপা ও কমলের নিয়মিত পত্র বিনিময়ের মধ্য দিয়েই তাদের সম্পর্ক ধীরে অথচ নিবিড়ভাবে গড়ে উঠেছে এবং গোপার দেখা স্বপ্ন তাদের চরম সম্পর্কের ইঙ্গিত বহন করেছে। এই স্বপ্নদর্শন ফ্রয়েডীয় অবচেতন চিন্তাভাবনারই বহিঃপ্রকাশ। লেখকের নিজস্ব ব্যাখ্যায় এ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে জেলের মেয়ে ওয়ার্ডের আলোচনায় যে ধরনের কাহিনী স্থান পেত তা প্রায় সবই দেহাশ্রিত। সেই সব কাহিনী ও বর্ণনা শুনে শুনে গোপার দেহ ও মন সর্বদাই উত্তেজিত হয়ে থাকত এবং সেই সময় তার সবরকম পাপচিন্তার বিষয় ছিল কমল। জেলের অপরাধিনী মেয়েদের কথাবার্তা কখনোই স্বামীর ভালবাসার নয়—পরপুরুষের প্রতি আসক্তির কাহিনীই তাদের আলোচনার বিষয়। স্বাভাবিক কারণেই তাই গোপার চিন্তাসূত্র কুটিল পথ ধরেছে, মনোবিজ্ঞানের 'সাইকো-সাজেশনের' মতো।

কমলের প্রতি গোপার আকর্ষণও রূপজ মোহ থেকেই উৎপন্ন। তাই তাদের অজ্ঞাতবাসের সময় ক্লান্তিকর জীবনের প্রতি ধিক্কারে গোপা নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করেছে 'এ সে কী করছে এক রূপসর্বস্ব যুবকের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করে?' শুভেন্দুর উপর গোপার কোন গাঢ় ভালবাসার নিদর্শন আমরা পাইনি যেটুকু দেখেছি তা সামাজিক স্বীকৃতি মাত্র। অজ্ঞাতবাসকালে গোপা সবসময়ই অনুভব করেছে যে তার

স্বামী ও সংসার আছে। শুধু স্বামীর জন্য তার কোন অস্থিরতা ছিল না। কিন্তু স্বামী গৃহে ফিরে আসার পর গোপা শুধুমাত্র আশ্রয়টুকুর মধ্যে তৃপ্তি পায়নি। সে নতুন করে অনুভব করেছে যে সে তার স্বামীর ভালবাসা হারিয়েছে,—নিজে স্বামীকে কতটুকু ভালবেসেছে সে হিসাব করেনি, যদিও কমলের বাসনাকামনার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সে ভেবেছে—'আমার স্বামী আছে, কমলের স্ত্রী নাই, হয় তো সে আমাকেই ভালবাসিয়াছে।' এই ভাবনার মধ্যে তার স্বামীকে ভালবাসার কথাই স্বীকার করা হয়েছে।

এই উপন্যাসে বর্ণিত প্রেম প্রথাসিদ্ধ তো নয়ই উপরন্তু দুঃসাহসিক রকমের স্বতন্ত্র। এখানে স্ত্রীর কাছে স্বামী যেন নিরাপদ আশ্রয়ের প্রতীক, আর প্রেম রূপ আশ্রিত, দেহ আশ্রিত সম্পর্ক, মানসিক কোন উচ্চতর অনুভূতি নয়। গোপা তার চিত্তশুদ্ধির জন্য শুভেন্দুর আদেশে যে ব্রহ্মচর্যের নিয়মকানুন পালন করেছে, তার মানসিক পবিত্রতা ফিরিয়ে আনার জন্য সে প্রয়োজন ছিল। গোপার কাছে কিন্তু শুভেন্দুর এই আদেশটি শাস্তি নয় তার কাছে শাস্তি হয়েছে স্বামীর অ-প্রেম ও স্বামীর সঙ্গসুখহীনতা। অবশ্য লেখকের আদর্শে শেষ পর্যন্ত কৃচ্ছ্রসাধনার মধ্য দিয়ে গোপার উত্তরণ ঘটেছে এবং এক তপক্লিষ্ট নারীতে রূপান্তরিত হয়েছে, সে আশ্রয় নিয়েছে এক আধ্যাত্মিক জীবনযাত্রায়। আর গোপাকে কঠিন অনুশাসন ও নিয়মকানুন পালনের আদেশ দিয়ে শুভেন্দু নিজেও শাস্তি পেয়েছে কেননা গোপাকে পূর্বের মত সে আর ফিরে পায়নি। চিরদিনের জন্য গোপার সাহচর্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

'শাস্তি' উপন্যাসের উৎস বৈজ্ঞানিক কৌতূহল—যার মূল অনুসন্ধান—একটি বিবাহিতা রূপসী নারী ও সমবয়সী একটি রূপবান তরুণকে সমাজের গণ্ডী থেকে বিচ্ছিন্ন করে, এক গৃহে বসবাস করালে তাদের কাছে সামাজিক অনুশাসন ও ধর্মবোধ কতদূর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে? প্রেম শুধুমাত্র মানসিক অনুভূতিকে আশ্রয় করে টিকে থাকতে পারে কি না? প্রিয়জনের দীর্ঘদিনের স্পর্শহীন অদর্শন স্মৃতির অতলে হারিয়ে যায় কিনা?

সমাজগণ্ডী থেকে বিচ্ছিন্ন গোপা পাপপুণ্য ধর্মাধর্ম ভাসিয়ে দেওয়ার সংকল্প করেছে বার বার কিন্তু দীর্ঘকালের সংস্কারের ফলে নিজেকে সংযত রাখতে পেরেছে কিন্তু তার এই কামনাতাড়িত সংকল্প ক্ষণস্থায়ী হলেও সত্য। কাহিনী যেন লেখকের দুঃসাহস ও আদর্শের সমন্বয়।

'কাঁটার ফুল' উপন্যাসটি নরেশচন্দ্রের প্রথম দিকের রচনা, রচনাকালের বহুবছর পরে উপন্যাসটি প্রকাশ লাভ করে।[২৫] আলোচ্য উপন্যাসে লেখক দুটি ভিন্ন সমাজের নরনারীকে বিবাহ দিয়ে, বিভিন্ন আবর্তে তাদের বাহ্যিক ও মানসিক যন্ত্রণা ও জটিলতা বর্ণনা করেছেন। আমাদের সমাজে শিক্ষা ও ধর্ম কিভাবে প্রেমের গতি-প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে শুধুমাত্র লৌকিকতার বন্ধনে তা সীমিত করে তোলে কাহিনীর বক্তব্যে সেই সুর স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই উপন্যাসেও লেখক প্রচলিত সাহিত্যের বিষয়কে

অতিক্রম করেছেন একটি বিবাহিতা সধবা নারীর দ্বিতীয় বিবাহ দিয়ে এবং এই কারণটিকে প্রেমের মধ্যে ভাঙন ধরানোর কাজে ব্যবহার করেছেন। উপন্যাসটি পাঠে আমরা উপলব্ধি করেছি যে হৃদয়কে বঞ্চিত করে সমাজকে স্বীকৃতি দিলে প্রেমের কাহিনীর সমাপ্তি বিয়োগান্ত হতে বাধ্য।

'কাঁটার ফুল' উপন্যাসের কাহিনী শুরু হয়েছে সুদূর বিহারের পভৌরা গ্রামে। সেই গ্রামের অস্পৃশ্য দোসাদের ঘরে জন্মেছিল কুতুয়া। ফুলের মত সুন্দরী। মাত্র সাত বছর বয়সে কুতুয়ার বাপ তার বিয়ে দিয়েছিল 'তেঘরা' গ্রামের নথনীর সঙ্গে। নথনীর অবস্থা ভাল ছিল না। তাই কুতুয়ার বয়স যখন চৌদ্দ বছর তখনও নথনী তাকে 'গাওনা' করে নিয়ে যেতে পারেনি। রামসেবক চেষ্টা করে তার আবার বিয়ে দিতে কিন্তু এসময় নথনী রামসেবককে গাওনার টাকা দিয়ে কুতুয়াকে বাড়ী নিয়ে যায়। নথনীর দারিদ্র্যের সংসারে কিন্তু কুতুয়ার মন টেকে না। ভাল ভাল শাড়ি গহনার জন্য সে সবসময়ই নথনীকে গঞ্জনা দেয়। কুতুয়ার মুখে হাসি ফোটানোর জন্য নথনী চুরি করে এবং ধরা পড়ে দুবছরের জন্য দ্বারভাঙ্গা জেলে চলে যায়। কুতুয়ার বাপ রামসেবক কুতুয়ার আবার বিয়ের জন্য অন্য পাত্রের সন্ধান করতে থাকে।

ঝাউতলার জমিদার ও ব্রাহ্ম সমাজের এম. এ. পাশ যুবক অবনীভূষণ এসময় মজঃফরপুরে এক পাত্রী দেখতে এসেছিল। পাত্রী তার পছন্দ হয়নি। সে চেয়েছিল এমন একটি পাত্রী যে তাকে কাব্যের প্রেরণা দেবে। চণ্ডীদাসের রামীর মত, দান্তের বিয়াত্রিচের মত। মজঃফরপুর থেকে অবনীভূষণ পালিয়ে এসেছিল বিহারের এক নগণ্য গ্রামে আর সেখানেই একদিন সন্ধ্যার আলোছায়ায় সে দেখা পায় কুতুয়ার। কুতুয়াকে দেখেই অবনীভূষণের মনে হয়েছে যে এই সেই নারী যাকে সে এতদিন অনুসন্ধান করেছে। রামসেবককে টাকা দিয়ে সে কুতুয়াকে কাশী নিয়ে যায় বিয়ে করার জন্য কিন্তু কাশী বা এলাহাবাদে তাদের রেজিষ্ট্রী বিয়ে সম্ভব হয়নি। কিছুদিন এখানে ওখানে কাটানোর পর শেষ পর্যন্ত তারা সুরাটে গিয়ে বিয়ে করে এবং দিল্লীতে এসে বসবাস করতে থাকে। ইতিমধ্যে অবনীভূষণ কুতুয়ার নাম বদলে কুন্তলা রেখেছে। দিল্লীতে তাদের একটি কন্যাসন্তান জন্মায়। এই কন্যাকে নিয়ে এক সমস্যা দেখা দেয়—দিল্লীতে প্রতিবেশীদের কুন্তলা বলেছিল যে তারা নববিবাহিত কিন্তু এখন তাদের কন্যাকে দেখে নানারকম সন্দেহ করে এবং অপমান করে তাদের দিল্লীর বাস তুলে দেয়। এরপর একের পর এক জায়গায় তাদের একই কারণে অপমানিত হতে হয়।

এদিকে অবনীভূষণের শিক্ষা ও সাহচর্যে কুন্তলার আশ্চর্য রকমের মানসিক পরিবর্তন ঘটেছে। সে বুঝতে পারে যে পূর্বেই বিবাহিত হয়ে অবনীভূষণের সঙ্গে তার এভাবে থাকাটা অপরাধ। যন্ত্রণায় সে অসুস্থ হয়ে পড়ে কিন্তু অবনীভূষণের ভালবাসার কথা ভেবে তাকে কিছুতেই এই বঞ্চনার কথাটা বলতে পারে না। কুন্তলার একাকীত্বই এই অসুস্থতার কারণ ভেবে অবনীভূষণ করুণা নামে লেখাপড়া জানা একটি খৃষ্টান মেয়েকে

কুন্তলার সঙ্গিনী হিসাবে নিযুক্ত করে। করুণার পরিচর্যা ও কাজের কোন ত্রুটি না থাকলেও কুন্তলা করুণাকে সন্দেহের চোখে দেখে এবং মনে মনে গৃহত্যাগ করার পরিকল্পনা করে, কেননা তার মনে হয় যে অবনীর ভালবাসা ছেড়ে একদিন তাকে চলে যেতেই হবে। এই ভাবনায় অস্থির হয়ে সে অবনীভূষণকে দিয়ে তার করিয়ে রামসেবককে নিয়ে আসে। রামসেবকের মুখেই সে জানতে পারে যে নথনী এখানেই রাজবাড়ীতে সহিসের কাজ করছে। চিন্তায় ভাবনায় কাতর হয়ে শেষ পর্যন্ত কুন্তলা ঠিক করে যে অবনীর এই রাজপাট ছেড়ে সে নথনীর সঙ্গেই চলে যাবে কিন্তু সত্যি তার যেদিন নথনীর সঙ্গে দেখা হয় সেদিন সে অজ্ঞান হয়ে অবনীর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে আর কুতুয়াকে ফিরে পাওয়ার জন্য নথনী আদালতে অবনীর নামে নালিশ করে। আদালতে অবনী জানতে পারে যে কুন্তলা নথনীর বিবাহিত স্ত্রী এবং এই ঘটনা জেনে তার নিজেকে এতই প্রবঞ্চিত মনে হয় যে কুন্তলাকে কোন প্রশ্ন করতেও তার প্রবৃত্তি হয় না। কুন্তলা কিন্তু নিজেই অবনীভূষণের কাছে তার সব অপরাধ স্বীকার করে। অবনী বুঝতে পেরেছিল যে দ্বিচারিনীর অভিযোগে কুন্তলার শাস্তি অনিবার্য কিন্তু কুন্তলাকে রক্ষা করার জন্য উকিলের পরামর্শে সে সামান্য মিথ্যা বলতেও রাজী হয়নি। করুণা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে একটা বোঝাপড়া করিয়ে দিতে চেষ্টা করে বিফল হয়। এই ব্যাপারে কথাপ্রসঙ্গে করুণা বুঝতে পারে যে অবনীভূষণের কাছে প্রেমের চাইতে ধর্মের প্রশ্ন অনেক বড়। এই কারণেই করুণা মনে মনে অবনীভূষণকে ঘৃণা করে এবং অসুস্থ কুন্তলার হয়ে মামলার তদ্বির করতে থাকে।

নথনী কুতুয়াকে ফিরে পেতে চেয়েছিল কিন্তু যখন সে শুনতে পেল যে এই মামলার ফলে কুতুয়ার দশ বছর জেল হয়ে যাবে তখন সে মামলা উঠিয়ে নিতে চাইল এবং কুতুয়াকে বাঁচানোর জন্য আদালতে বলল যে অবনীভূষণ বড়লোক, তার কাছ থেকে কিছু টাকা পাওয়ার লোভেই সে মিথ্যা মামলা করেছে, কুতুয়া তার বিবাহিত স্ত্রী নয়। করুণা আদালতে নথনীর এই বক্তব্য শুনে আশ্চর্য হয়ে যায় এবং যে কারণে সে মনে মনে অবনীভূষণকে ঘৃণা করছে তার বিপরীত কারণেই নথনীর উপর তীব্র আকর্ষণ অনুভব করে এবং নিজের টাকা দিয়ে নথনীকে মোটর চালানো শেখার জন্য কলকাতা পাঠিয়ে দেয়। নথনীর এই বক্তব্যের পরও আদালতে কিন্তু এই মামলা চলতে থাকে।

অবশেষে মামলার রায়ও প্রকাশ পায় যে কুন্তলা অবনীভূষণেরই বৈধ পত্নী, নথনীর সঙ্গে কুন্তলার বিবাহ বৈধ নয় কেননা সে রামসেবকের কন্যা নয়, হচ্‌কিনস্‌ সাহেবের মেয়ে, যার নীলকুঠিতে কুন্তলার মা কাজ করতো, কুন্তলা ম্লেচ্ছ—দোসাদের ঘরে তার বিয়ে বৈধ নয়। আদালতের অভিমতের পরেও কিন্তু অবনীভূষণ কুন্তলাকে পূর্বের মত স্ত্রীর মর্যাদায় গ্রহণ করতে পারে না—একটা নিবিড় ব্যবধান তখন দুজনার মধ্যে রচিত হয়ে গেছে। কুন্তলা অবনীর ব্যবহারের মধ্যে দেখতে পেয়েছে একটা প্রেমশূন্য লৌকিকতা। ইতিমধ্যে এক বছর কেটে গেছে। করুণা অবনীভূষণের বাড়ীতেই আছে, কুন্তলা

তাকে যেতে দেয়নি। কুন্তলা এখন সারাদিন কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকে, অবনীর সঙ্গে তার সম্পর্ক অনেক দূরে সরে গেছে। করুণা কুন্তলার কাছে বিদায় নিতে এসে জানায় যে তার বিয়ে, ন্যাথানিয়ানের সঙ্গে সে এখনি চলে যাবে। কুন্তলা করুণাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসে দেখতে পায় যে করুণার হবু স্বামী ন্যাথানিয়ানই নথনী। কুন্তলা চাবুক খাওয়ার এক অব্যক্ত যন্ত্রণা অনুভব করে। 'কাঁটার ফুল' কাহিনীর এখানেই সমাপ্তি।

'কাঁটার ফুল' উপন্যাসটি রোমান্টিক ঢঙে শুরু হলেও তার সমাপ্তি ঘটে রূঢ় বাস্তবতায়। নায়ক অবনীভূষণের চরিত্রও এই একই ভাবে রোমান্টিক কল্পনাবিলাসের জগৎ থেকে ক্রমশঃ বাস্তবের রূঢ় সত্যে উপনীত হয়েছে। নায়িকা কুন্তলার চরিত্রেও দেখা দিয়েছে এক আশ্চর্য পরিবর্তন। কুন্তলা অশিক্ষিত বিহারী গ্রাম্য মেয়ে, ঘটনাচক্রে তার বিয়ে হয় আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত জমিদার অবনীভূষণের সাথে। দুজন সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশের কিন্তু লেখকের কল্পনায় তাদের মধ্যে গভীর ভালবাসার সঞ্চার হয়েছিল। কিন্তু ঘটনাটি স্বাভাবিক মনে হয় না। অবনী কুতুয়ার রূপ দেখেই তাকে বিয়ে করেছে অথচ সে কল্পনায় এমন একটি নারীকে খুঁজেছিল যে হতে পারবে তার কাব্যের প্রেরণা— বস্তুতঃ অশিক্ষিত গ্রাম্য বালিকা কুতুয়ার মানসিক দিক দিয়ে অবনীকে কাব্যের প্রেরণা দেওয়া মোটেই সম্ভব নয় তাই বোঝা যায় যে অবনীভূষণের ভালবাসার উৎস কুতুয়ার অসামান্য রূপ। অবনীভূষণ কুন্তলাকে পাপের সঙ্গিনী করতে চায়নি, চেয়েছিল ধর্মপত্নী করতে অথচ কুন্তলার জন্যই তাকে বহুবার অপমানিত হতে হয়েছে বিদেশে এমনকি কলকাতার ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরেও। তবু অবনীকে সব সহ্য করতে হয়েছে কুন্তলার মুখ চেয়ে কেননা তার মনে সবসময়ই এই জোর ছিল যে কুন্তলা তার বিবাহিতা স্ত্রী, ও আইনসিদ্ধ পত্নী। কুন্তলার মানসিক রোগের কারণ খুঁজতে সে ফ্রয়েড পড়েছে, ইয়ুং পড়েছে, কিন্তু কুন্তলাকে কখনো জিজ্ঞাসা করেনি তার অসুস্থতার কারণ। কুন্তলার অতীত সম্পর্কে কিছু না ভেবে পুঁথিপত্রে অনুসন্ধান করেছে তার আরোগ্যের উপায়। এদিক দিয়ে দেখা যায় যে অবনীর পুঁথিগত শিক্ষা থাকলেও বাস্তব বুদ্ধির অভাব ছিল। আদালতে অবনীভূষণ যখন জানতে পারে যে কুন্তলা পূর্বেই বিবাহিতা তখন সে নিজেকে প্রবঞ্চিত ভেবেছে, যন্ত্রণায় ভেঙ্গে পড়েছে কিন্তু প্রেমকে স্বীকার করে লৌকিক ও ধর্মীয় বিবাহ অনুষ্ঠান ইত্যাদির বৈধতাকে অগ্রাহ্য করতে পারেনি। কুন্তলাকে হঠাৎ বিয়ে করার জন্য তার অনুশোচনা হয়েছে এবং এই অনুভূতি আরও অসহ্য হয়ে উঠেছে কুন্তলার অসামাজিক জন্মবৃত্তান্ত জেনে। লেখক অবনীভূষণের সামনে চমৎকার একটি সামাজিক প্রশ্ন তুলে ধরেছেন— এই সমাজ ব্যবস্থায় প্রেম বড়, না প্রেমহীন আইনসিদ্ধ বিবাহই বড়?—বলা বাহুল্য অবনীর কাছে ধর্মীয় বিধি ও আইনসিদ্ধ বিবাহই বড়। তাই হচ্‌কিনস্‌ সাহেবের অবৈধ সন্তান কুন্তলাকে সে ধর্ম ও বৈধ পত্নী হিসাবে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে যদিও তার পূর্বের সম্পর্ক ফিরে আসেনি। আর রূঢ় বাস্তব জগতে ফিরে এসে অবনী করুণাকে বিবাহ প্রসঙ্গে উপদেশ দিয়েছে—

'বিয়েতে রোমান্স খুঁজো না। যদি ভালবাসতে না পার তবে বিয়ে করো না, কিন্তু ভালবাসার আশ্রয় করে একটা Imprudent marriage করে বসো না' [পৃঃ ১৮১-১৮২][২৬]। অবনীর এই পরিবর্তন অনেকটাই ধারাবাহিকতাশূন্য, আকস্মিক।

কুন্তলার চরিত্র প্রথম দিকে অবাস্তব হলেও লেখক ধীরগতিতে তার চরিত্রের পরিবর্তন ঘটিয়ে তাকে অনেকটা বাস্তব চরিত্র করে তুলেছেন। অবনীভূষণের শিক্ষায় খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তার যথেষ্ট পরিবর্তন এসেছে। অল্পদিনের মধেই সে বুঝতে পেরেছে যে অবনীভূষণ তাকে বিয়ে করে যে জটিলতার মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে তার কারণ সে নিজে। আবার একথা তার মনে হয়েছে যে সে অন্যপূর্বা এই কথাটা অবনীকে না জানিয়ে সে তাকে রীতিমত বঞ্চনা করছে কিন্তু একথা স্বীকার করে অবনী ও তার ভালবাসাকে হারানোর সাহস তার ছিল না। কুন্তলার এই আচরণ স্বাভাবিক। ক্রমশ এই অনুভূতি তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে যে সে অবনীর ভালবাসা পাওয়ার যোগ্য নয়। একটা তীব্র অপরাধবোধের যন্ত্রণা তার মানসিক ভারসাম্য নষ্ট করে দিয়েছে। এই শাস্তির পরেও তার জীবনে পর পর শাস্তি নেমে এসেছে অথচ আমরা জানি যে অশিক্ষিত এই দোসাদের মেয়ের নিজের কোন অপরাধ ছিল না। সে গরীবের মেয়ে, অবনী তাকে বিয়ে করেছে সেজন্য সে সব সময়ই অবনীকে শ্রদ্ধা করেছে তার স্বার্থশূন্য ভালবাসার জন্য, আর যে মুহূর্তে অবনী তার জীবনের অতীত জানতে পেরে দূরে সরে গেছে তখন সে নিজেকে যদিও অপরাধী ভেবেছে কিন্তু সেই সঙ্গে অবনীর প্রেমহীন লৌকিকতা দেখে বিস্মিত হয়েছে। তারপর নিজের কলঙ্কিত জন্মরহস্য আবিষ্কারের কথা জেনে তার জীবনে নেমে এসেছে চরম ট্র্যাজেডি—সে তার জন্মদাতা পিতাকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারেনি এবং সে জন্যই সে হচ্‌কিনস্ সাহেবের সাথে দেখা করতে ঘৃণা বোধ করেছে। এই সমস্ত আঘাত কুন্তলাকে নিস্পৃহ নিরাসক্ত করে তুলেছে। অবনীর ধনসম্পদ বা ভালবাসার প্রতি তার আর কোন মোহই অবশিষ্ট ছিল না অথচ তার চোখের সামনে করুণা যখন নধনীকে নিয়ে বিয়ে করতে চলে গেল তখন চাবুকের যন্ত্রণা ছাড়া তার আর কিছুই রইল না। কুন্তলা জানে নধনীর প্রেমে নেই কোন বৈধতার প্রশ্ন, ভালবাসার মধ্যে নেই স্বার্থপর ধর্মান্ধতা।

আলোচ্য উপন্যাসে দ্বিতীয় নারীচরিত্র করুণা সর্বগুণসমন্বিতা হলেও বাস্তব হয়ে ওঠেনি। সে যতই শিক্ষিতা নারী হোক না কেন প্রভুর সঙ্গে প্রভুপত্নী কুন্তলাকে নিয়ে 'ফ্রয়েড ও ইয়ুং'-এর আলোচনা অস্বাভাবিক মনে হয়।[২৭] আর স্বাধীন যুবতী করুণা অবাধে ধনী যুবক অবনীভূষণের সাহায্য, সান্নিধ্য ও কৃপা পাওয়ার পরও, 'স্ত্রীর প্রতি যথেষ্ট সংবেদনশীল নয় ও অবিচার করছে' মনে করে অবনীভূষণকে ঘৃণা করাটা বাস্তবানুগ মনে হয় না। অথচ সেই করুণার পক্ষে গৃহহীন অশিক্ষিত দোসাদ যুবককে শুধুমাত্র তার না পাওয়া পত্নীপ্রেমের ঔদার্য দেখে, সর্বস্ব দান করে প্রেমে পড়ে যাওয়ার ঘটনাকে বাস্তব বলে সমর্থন করা যায় না।

'কাঁটার ফুল' উপন্যাসের শেষে লেখক কুন্তলাকে সহানুভূতিহীন শেষ আঘাত

দিতে চাননি, নিজ আদর্শে স্থির থেকে দোসাদ নথনীকে জিতিয়ে দিয়েছেন জমিদার অবনীভূষণের সঙ্গে পরোক্ষ প্রতিযোগিতায়, আর শেষ করেছেন এক আশ্চর্য চমক দিয়ে।

'বিপর্যয়' উপন্যাসে নরেশচন্দ্র সংস্কারের সঙ্গে আকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্ব তুলে ধরেছেন। উপন্যাসটির রচনাকালে তিনি সম্ভবত ঢাকায় ছিলেন। উপন্যাসটির দুটি সংস্করণ হয়।[২৮] সমাজ ও সংস্কার নারী-পুরুষের ভালবাসার ক্ষেত্রেও কতটা ক্রিয়াশীল এই উপন্যাসে লেখক তা সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন। এই উপন্যাসের প্রেমকাহিনী তাঁর পূর্ববর্তী অনেক উপন্যাসের তুলনায় সংযত কিন্তু কোথাও তা রক্তমাংসহীন হয়ে পড়েনি অর্থাৎ এই উপন্যাসেও তিনি প্রেমের দৈহিক দিকটিকে অস্বীকার করেন নি। কাহিনীটি আপাত রোমান্টিক মনে হলেও বাস্তবতাবর্জিত বলা চলে না। লেখকের গভীর বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী স্থানে স্থানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

আলোচ্য কাহিনী শুরু হয়েছে ইন্দ্রনাথকে নিয়ে। এন্ট্রান্স পাশ করার পরই মাত্র ষোল বছর বয়সে তার বিয়ে হয় সরযূর সাথে। কলকাতায় যখন সে কলেজে পড়তে আসে তখন সরযূর প্রেমে তার মন সর্বদাই আচ্ছন্ন থাকত। কলেজে ইন্দ্রনাথের পরিচয় হয় ধনী ব্রাহ্ম পরিবারের ছেলে অমলের সাথে। ক্রমশ তাদের দুজনার মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। অমলদের বাড়ীতে ইন্দ্রনাথের আলাপ হয় অমলের বোন অনীতার সাথে। অনীতার কথাবার্তার মধ্যে এমন একটা বুদ্ধিদীপ্ত সহজ সৌন্দর্য ছিল যে ইন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়ে যায় এবং মনে মনে বার বারই সরযূর সঙ্গে অনীতার তুলনা করতে থাকে। সরযূকে অনীতার মত করে গড়ে তোলার একটা চেষ্টা তাকে পেয়ে বসে।

এদিকে ইন্দ্রনাথের বোন মনোরমা বিধবা হয়ে একটি পুত্রসন্তান নিয়ে ইন্দ্রনাথের কাছে ফিরে আসে। মনোরমার দিন কাটতো কঠিন ব্রহ্মচর্য পালন ও পূজা অর্চনার মধ্যে। কিন্তু ক্রমশ তার এই আচারবিধি পালনের মধ্যে ক্লান্তি আসে। এই পূজা অর্চনার মধ্যে অন্তঃসারশূন্যতা আবিষ্কার করে সে কিছুটা এক ঈশ্বরবাদে বিশ্বাসী হয়ে ওঠে। মনোরমার এই পরিবর্তন সরযূর ভাল লাগে না, আর ইন্দ্রনাথ মনোরমার এই পরিবর্তন লক্ষ্য করে তাকে দ্বিতীয়বার বিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে যদিও মনোরমা এ ব্যাপারে কোন আগ্রহ দেখায় না।

ইন্দ্রনাথ যে কলেজে অধ্যাপনা করে সেই কলেজের তার এক সহকর্মী মিঃ লিণ্ডলের সঙ্গে অনীতা ও অমলের যথেষ্ট পরিচয় ছিল। অনেকের ধারণা ছিল যে এই ইংরাজ অধ্যাপকের সঙ্গেই অনীতার বিয়ে হবে, এমন কি লিণ্ডলেও মনে মনে এই আশাই করেছে। অথচ দীর্ঘদিন ধরে মেলামেশা করার ফলে ইন্দ্রনাথ ও অনীতার মধ্যে একটা অদ্ভুত সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। ইন্দ্রনাথ অনীতার সান্নিধ্যের জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করে আর অনীতাও ইন্দ্রনাথের সঙ্গে যে কোন বিষয় নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা আলোচনা করে তৃপ্তি পায়। মিঃ লিণ্ডলের জানা ছিল যে অনীতা ইন্দ্রনাথকে অসম্ভব শ্রদ্ধা করে তাই সে ইন্দ্রনাথকে দিয়ে অনীতার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করে পাঠায়। ইন্দ্রনাথের মুখে

লিণ্ডলের প্রস্তাব শুনে অনীতা তা প্রত্যাখ্যান করে এবং জানায় যে মনে মনে এতদিন সে ইন্দ্রনাথকে ভালবেসে এসেছে, তাকেই পূজো করে এসেছে। অনীতা ইন্দ্রনাথকে অনুরোধ করে যে তার এই ভালবাসার বিনিময়ে ইন্দ্রনাথ অন্তত একবার তাকে স্পর্শ করে বলুক যে সেও তাকে ভালবাসে এবং এই কথাটাই হবে তার সারা জীবনের পাথেয়। ইন্দ্রনাথ কিছুতেই অনীতাকে সেকথা বলতে পারে না। অমল তাদের দুজনকে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ইন্দ্রনাথকে ভুল বোঝে এবং তাকে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ দিয়ে বাড়ী থেকে অপমান করে বের করে দেয়।

এই ঘটনার পর অনীতার জীবনে এক দারুণ পরিবর্তন দেখা দেয়। সবকিছু পরিত্যাগ করে সে বৈষ্ণব ধর্মগ্রহণ করে সন্ন্যাসিনীর জীবন বেছে নেয়। এ সময় ইন্দ্রনাথের বোন মনোরমাও ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের জন্য গৃহত্যাগ করে। ইন্দ্রনাথের ধারণা হয় যে অমলই প্রতিহিংসা গ্রহণের জন্য মনোরমাকে গৃহত্যাগ করিয়েছে। অমল তখন দার্জিলিং-এ। ইন্দ্রনাথ দার্জিলিং-এ গিয়ে জানতে পারে যে মনোরমা সেখানে যায়নি। অমল ও ইন্দ্রনাথ দুজনেই তখন পাগলের মত মনোরমাকে খুঁজতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত অমল মনোরমাকে খুঁজে পায়। গৃহত্যাগিনী বিধবা কন্যাকে কিন্তু ইন্দ্রনাথের পিতা গৃহে স্থান দিতে অস্বীকার করেন। ইন্দ্রনাথের অনুরোধে তখন অমল মনোরমাকে তার নিজের বাড়ীতে স্থান দেয় এবং শেষ পর্যন্ত মনোরমাকে বিয়ে করে। আর সরযূ ও ইন্দ্রনাথকে প্রণাম করে অনীতা বৃন্দাবনে চলে যায়।

আলোচ্য কাহিনীর নায়ক ইন্দ্রনাথের চিন্তা, ভাবনা ও আচরণের মধ্যে একটা অসংগতি লক্ষ্য করা যায়। সে সর্বদাই অনীতার সান্নিধ্য আকাঙ্ক্ষা করেছে, মনে মনে সে অনীতাকে ভালবেসেছে কিন্তু যখনই সেই ভালবাসা প্রকাশের সময় ও সুযোগ এসেছে তখনই সংস্কারের বশবর্তী হয়ে সে পিছিয়ে পড়েছে। ইন্দ্রনাথের জীবনের দ্বন্দ্ব এটাই। নিজের মনে সে অনীতার ভালবাসা অস্বীকার করতে পারেনি এবং সেজন্য একটা অপরাধবোধ সচেতনভাবে সে সব সময়ই অনুভব করেছে কিন্তু অনীতাও তাকে ভালবাসে এই অনুভূতিতে আনন্দ পেয়েছে। অনীতার এই বিবাহিত পুরুষকে অন্তর দিয়ে ভালবাসার যে কোন সুস্থ সুন্দর পরিণতি এই সমাজে অসম্ভব, সেজন্য ইন্দ্রনাথ বেদনা অনুভব করেনি। সে যতটুকু বেদনা অনুভব করেছে তা তার সম্পূর্ণ নিজস্ব, যার অন্তরায় তার সমাজ, সংস্কার ও স্ত্রী। ইন্দ্রনাথের মনে হতো যে অনীতাও তাকে ভালবাসে 'এবং এ কল্পনায় তার বড় আনন্দ হইত। যদিও পরক্ষণেই সে তীব্র বেদনার সহিত অনুভব করিত যে, একথা সর্বনাশের কথা! একথা মনে করাও তার পক্ষে কি ভীষণ পাপের, স্বার্থপরতার, বিশ্বাসঘাতকতার কথা' [পৃঃ ৮৩]। কিন্তু অনীতার নিষ্ফল ভালবাসার জন্য অনীতার প্রতি এতটুকু বেদনাবোধ করেনি। ইন্দ্রনাথের দায়িত্বের জন্য এই ভালবাসা বেদনাহীন ও অসংগত মনে হয়। অনীতা সরযূর জন্য বেদনা অনুভব করেছে, সে বুঝতে পেরেছিল যে ইন্দ্রনাথ তার স্ত্রীর কাছে মনের ও চিন্তার যোগ্য উপাদান থেকে বঞ্চিত এবং সেজন্য সে সরযূকে যথার্থ ভালবাসছে না। তাই সে

ইন্দ্রনাথকে অনুরোধ করে যাতে ইন্দ্রনাথ সরযুকে কোন রকম অবজ্ঞা না করে তাকে সমগ্র ভালবাসা দেওয়ার চেষ্টা করে, কেননা ইন্দ্রনাথের মত 'যেখানে স্ত্রী স্বভাবত স্বামীর তুল্য নয়, সেখানে বিবাহ হলে একটা আধিপত্যের ভাব এসে পড়বেই।...বিয়ে ঠিক সমানে সমানে হলেই, তবে সম্বন্ধটা আদর্শ ভালবাসার সম্বন্ধ, হতে পারে' [পৃঃ ৫৫]। কিন্তু অনীতার অনুরোধ পালনের ত্রুটি ইন্দ্রনাথ করেনি যদিও ব্যর্থ হয়েছে। প্রসঙ্গত 'অনেকবার সে ভাবিয়াছে যে তার এই তথাকথিত সাধনা'—যে সাধনা অনীতা তাকে করতে বলেছে, তা একটা আত্মবঞ্চনা। 'বাস্তবিক সে সরযুকে ভালবাসিবার পথে এক পাও অগ্রসর হইতেছে না, বরং একটা ভয়ানক সর্বনাশের পথ পরিষ্কার করিতেছে। সরযূর প্রতি প্রেমের সাধনার তার প্রথম ও প্রধান কর্তব্য, অনীতার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক পরিত্যাগ। কিন্তু যখন বিকালবেলায় সে অবসর পাইত, তখন তার মন যে তীব্র তৃষ্ণার সহিত অনীতার বাড়ীর দিকে ছুটিয়া চলিত, তাহাকে ফিরাইবার সাধ্য বা সাধনা তাহার ছিল না। সে কেবলমাত্র একটা ছুতা খুঁজিয়া তার এই লোভের পথ পরিষ্কার করিয়া দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করিতে পারিত না' [পৃঃ ৮৩]। এসব ব্যাপারে ইন্দ্রনাথের দুর্বল চরিত্রই প্রকাশিত হয়েছে। সে যে অনীতার প্রেমের আহ্বানে সাড়া দিতে পারেনি তার কারণও ইন্দ্রনাথের মানসিক দুর্বলতা।

অনীতার ইন্দ্রনাথের মত সংস্কারের প্রতি দুর্বলতা নেই। যখনই তার সুযোগ পেয়েছে তখনই সে তার ভালবাসার কথা স্বীকার করেছে। তার মধ্যে স্বার্থপরতা ছিল না তাই সে মনোরমা ও সরযূর প্রতি সমান সহানুভূতি অনুভব করেছে। ব্রাহ্ম পরিবারের মেয়ে হয়ে এবং ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের আদবকায়দায় মানুষ হলেও সে যে বাঙ্গালী মেয়ে একথা সে কখনোই ভুলতে পারেনি এবং বাঙ্গালী আদর্শে মানুষ ইন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা করেছে, ভালবেসেছে। ইন্দ্রনাথ তাকে যখন টম লিগুলের বিয়ের প্রস্তাব জানিয়েছে তখন অনীতা খুব সহজেই বলেছে 'আমি, যে মেয়েমানুষ, অন্ততঃ বাঙ্গালী মেয়েমানুষ স্বামী বলে যাকে বরণ করতে চায়, তাকে তার নিজের চেয়ে অনেকটা বড় দেখতে চায়। এমন একজন চাই যার উপর নির্ভর করা যাবে, যাকে ভক্তি করতে পারবে। টম খুব ভালো বন্ধু হতে পারে, কিন্তু আমি তাকে স্বামী বলে শ্রদ্ধা করতে পারি না [পৃঃ ৮৯]। আর ভালবাসার সম্পর্কেও অনীতা বলেছে—'ভালবাসলেই কি ভালবাসার জিনিস পাওয়া যায়। আমি তো দেখি, যতই ভালবাসি, ততই সেই স্নেহাস্পদ দুর্লভ হয়ে ওঠে, কে জানে এই বুঝি ভালবাসার নিকষমণি ভালবাসার পরীক্ষা' [পৃঃ ৯০]।

যদিও অনীতার ভালবাসা বা প্রেম দেহাতীত নয়, ইন্দ্রনাথের কাছে তার আত্ম-নিবেদনের বর্ণনায় লেখক তাকে 'মূর্তিমতী ক্ষুধিতা বাসনা' বলে উল্লেখ করেছেন। এই ভালবাসার তীব্রতাই অনীতাকে শান্ত সমাহিত জীবনযাত্রায় নিয়ে যেতে পেরেছে—মর্ত্যমাটির পুরুষের রক্ত মাংসের উষ্ণ প্রেম বঞ্চিতা অনীতা তাই বৃন্দাবনের নিত্য-কিশোরের দেহাতীত প্রেমে নিজেকে নিবেদিত করেছে।

মনোরমার চরিত্রের আবিলতা অনেক কম। তার পরিবর্তন আকস্মিক নয়। তার জীবনের পরিবর্তন ঘটেছে দীর্ঘদিনের চিন্তাভাবনার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে। দেহ ও মনের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত করার জন্য সে পূজা অর্চনার মধ্যে জীবন কাটানোর ব্যর্থ চেষ্টা করেছে মাত্র। মনোরমা প্রথম থেকেই ব্রাহ্ম অনীতার অনুরাগী হলেও বিধবা হওয়ার পর সে হিন্দুবিধবার কৃচ্ছ্রসাধনার পথই বেছে নিয়েছে, কিন্তু এই পথই যে একমাত্র পথ, তা মনেপ্রাণে মেনে নিতে পারেনি। কেননা—'পড়িয়া শুনিয়া এবং ব্রাহ্ম ও খ্রীষ্টান মেয়েদের সঙ্গে কথাবার্তা কহিয়া, মেয়েদের কর্তব্য ও অধিকার প্রভৃতি বিষয়ে অনেকগুলি অত্যন্ত আধুনিক সংস্কার তাহার মনের ভিতর শিকড় গাড়িয়া বসিয়া গিয়াছিল' [পৃঃ ৪৬]। বিধবার জীবনের কৃচ্ছ্রসাধনার মধ্যে সে শুধুই অন্তঃসারশূন্যতা দেখতে পেয়েছে। নিজের কাছে সে স্বীকার করেছে যে 'তার সমস্ত জীবনটাই একটা প্রকাণ্ড ভণ্ডামী। সে যে শোকের পরিচ্ছদ সর্বদা ধারণ করিয়া থাকে, সে শোকের শান্ত ছায়া কি তার মনের ভিতর সে এখন খুব বেশী দেখিতে পায়? দারুণ দুঃখের সহিত সে স্বীকার করিল যে, তা ঠিক নয়' [পৃঃ ৪৯]। মৃত স্বামীকে এখন তার অতীতের এক বিস্মৃত স্বপ্নের মত মনে হয়। এক ঈশ্বরবাদী ব্রাহ্মদের আচার আচরণের মধ্যে মনোরমা যুক্তি খুঁজে পেয়েছে আর সমস্ত ভণ্ডামী ছেড়ে সত্যের অন্বেষণ করতে গিয়ে সে এক ভীষণ সত্য আবিষ্কার করেছে—'সে আবিষ্কার করিল যে বাহ্যিক আচারে সে যতই নিষ্ঠাবতী হউক না কেন, অন্তরে সে বিধবা নয়…তার হৃদয় মোটেই বিধবার উষর অন্তর নয়। অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত তার ভিতর রসের ধারা প্রবাহিত রহিয়াছে, তার সমস্ত যৌবন তৃপ্তির একটা আকাঙ্ক্ষায় তার হৃদয় জুড়িয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে। এতদিন সে একথা নিজের মনের কাছে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু আজ সম্পূর্ণ সত্যনিষ্ঠ হইয়া আর সে আত্মবঞ্চনা করিতে পারিল না' [পৃঃ ১০১]। এই ভয়ানক সত্য আবিষ্কার করে সে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করার জন্য গৃহত্যাগ করেছে। গৃহে ফিরে আসার পর সে তার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারেনি এবং এই বিপর্যয়ে অমলের বিবাহ প্রস্তাব মেনে নিতে তার মনে কোন দ্বিধা দেখা দেয়নি। সন্ন্যাসিনীর জীবন থেকে সংসারজীবনে ফিরে এসে সে বাস্তব সত্যকেই প্রতিষ্ঠা করেছে।

'বিপর্যয়' উপন্যাস নরেশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলির অন্যতম। দুটি বিপরীত আদর্শের নারীর প্রেম ও পরিণতি তিনি এই উপন্যাসে বিবৃত করেছেন। অনীতার জীবনের মধ্য দিয়ে তিনি দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে যথার্থ ভালবাসা শুধুমাত্র পাওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। অনীতা যখন ইন্দ্রনাথকে ভালবেসেছে তখন থেকেই সে জানতো যে তার এই ভালবাসার প্রতিদান সে পেতে পারে না। তাই শেষ পর্যন্ত সে কৃচ্ছ্রসাধনার পথে চলে যেতে পেরেছে। আর সাধ আহ্লাদ বঞ্চিত মনোরমা কৃচ্ছ্রসাধনার পথ ত্যাগ করে স্বামীর স্মৃতি অতীতের ছায়াচ্ছন্ন স্বপ্ন মনে করে নতুন ঘর-সংসার করতে ব্রতী হয়েছে। স্বামী ও বৈধব্য তখন তার কাছে একটা মিথ্যা সংস্কার মাত্র। অনীতা যেমন বলেছে 'ভালবাসলেই কি ভালবাসার জিনিস পাওয়া যায়। আমি তো দেখি,

যতই ভালবাসি ততই সেই স্নেহাস্পদ দুর্লভ হয়ে ওঠে।' আর অমলের বিবাহের প্রস্তাবে মনোরমার 'এক মুহূর্তে সমস্ত অন্তর ভরিয়া এক বিশাল তাণ্ডবনৃত্য লাগিয়া গেল। আনন্দের বেদনায় মনোরমা পীড়িত হইল। তাহার মনে হইল এ আনন্দে তার অধিকার নাই। এ উৎসব হৃদয়ের অবৈধ বিদ্রোহ। কিন্তু বিদ্রোহই আজ সম্রাট হইয়া বসিয়াছে, তাহাকে বাধা দিবে কে?' এই দুটি বিপরীত চরিত্রের বিকাশ লেখক সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। কোথাও চরিত্রদুটি বা তার বিন্যাস অবাস্তব মনে হয় না। ইন্দ্রনাথের স্ত্রী সরযূর উপর লেখক নিজ আদর্শ ও সহানুভূতি পুরোমাত্রায় ঢেলে দিলেও চরিত্রটির মধ্যে একটু অবাস্তবতার স্পর্শ পরিলক্ষিত হয়। সরযূ সাধারণ পড়াশুনা জানা বাঙ্গালী হিন্দুঘরের স্ত্রী। স্বামীকে বাঁধার মত উপযুক্ত কৌশল তার জানা নেই। শিক্ষিত স্বামীর মনের উপযুক্ত হবার জন্য সে চেষ্টার ত্রুটি করেনি কিন্তু তা সে হতে পারে নি। বাধ্য হয়ে সে স্বামীর পরিপূর্ণ সুখের জন্য উদারভাবে ইন্দ্রনাথকে অনীতার হাতে তুলে দিতে চেয়েছে। হিন্দুনারীর এ ধরনের ত্যাগ স্বীকার হয়ত দুর্লভ নয় কিন্তু সরযূর মধ্যে নারীর সহজাত ঈর্ষা বা মানবিক প্রতিবাদও নেই। এ ধরনের চরিত্রকে ঠিক বাস্তবানুগ বলা চলে না। আর যদিও আমরা ইন্দ্রনাথের চরিত্রের মধ্যে খুব দৃঢ় ব্যক্তিত্বের সন্ধান পাইনি, তবু কাহিনীর শেষ অংশে একটা জড়বস্তুর মত সরযূর হাত থেকে অনীতার হাতে ফিরে আসা বাস্তবতাশূন্য এবং অতিনাটকীয়। অনীতার আকাঙ্ক্ষা ও আসক্তির জীবন থেকে ত্যাগের পথে চলে যাওয়ার পিছনে অজস্র যুক্তি ও বিশ্লেষণ থাকা সত্ত্বেও মনে হয় যেন লেখকের নিজের সৃষ্ট জটিলতার সহজ সমাধান।

নরেশচন্দ্রের অনেক উপন্যাসেই দেখা যায় যে নায়ক-নায়িকার আধ্যাত্মিক জীবনের মধ্যে তৃপ্তির সন্ধান করা যেন সুখদুঃখ জয় করার শেষ আশ্রয়। অর্থাৎ নাস্তিক, মনোবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে, নরেশচন্দ্র বিশ্বাস করতেন যে মানুষ যখন মানবমনের অনন্ত জটিলতার সমাধান খুঁজে পায় না আর সমাজের কাছে শুধু-মাত্র দুর্লঙ্ঘ্য বাধা পায় তখন তথাকথিত আধ্যাত্মবাদের এই প্রবঞ্চনার মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজতে মানুষ বাধ্য।

'গ্রামের কথা' গ্রন্থটিতে[২৯] 'দত্তগিন্নী', 'যোগী', 'সৃষ্টিছাড়া' ও 'নটবর' এই চারটি গল্প সংকলিত হয়েছে। এই চারটি গল্পে মূলত চারটি বিভিন্ন গল্প ও চরিত্র বর্ণিত হলেও, এই গল্পগুলির মধ্যে একটা সংযোগ রয়েছে। প্রতিটি গল্পই 'বাঁশবন' গ্রামের ও পারিপার্শ্বিক চরিত্রগুলি অভিন্ন। গ্রন্থের প্রথম গল্পে আমরা যে কটি চরিত্রের দেখা পাই তারাই পরবর্তী গল্পগুলিতে কখনো প্রধান বা কখনো পার্শ্বচরিত্র হয়ে উঠেছে। কোন একটি বিশেষ কাহিনী, চরিত্র বা ঘটনার প্রবহমানতা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রক্ষিত হয়নি, বরঞ্চ প্রতিটি গল্পই স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। ফলে 'গ্রামের কথা' গ্রন্থটিকে গল্প সংকলন বলাই ভাল এবং স্থান, কাল ও পাত্রদের অভিন্ন রেখে লেখকের বিভিন্ন গল্প বলার কৌশলের মধ্যে যে নতুনত্ব আছে তা অস্বীকার করা যায় না। এই গল্পগুলির মধ্যে 'সৃষ্টিছাড়া' ও 'যোগী'-'প্রাচী' পত্রিকায় এবং 'নটবর'-'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

গল্পগুলির কাঠামো খুব সুসংবদ্ধ নয়। গল্পগুলিতে বার বার অপ্রাসঙ্গিক ঘটনা এনে লেখক অহেতুক গল্পের আয়তন বৃদ্ধি করেছেন সত্য কিন্তু কোন নির্দিষ্ট আদর্শ প্রচার করতে গিয়ে তিনি কখনোই কাহিনীকে অবাস্তব করে তোলেন নি। আমরা জানি যে গল্প কাহিনীর বিষয়বস্তু ও চরিত্রের মধ্যে অনেকেই লেখকের রুচি বা আদর্শের পরিচয় খোঁজেন কেননা গল্পের কাহিনী ও বিষয়বস্তু লেখকের সম্পূর্ণ স্বনির্বাচিত। প্রসঙ্গত মনে হয় যে এখানেও লেখক বাস্তব সত্যে অধিক আস্থাশীল ছিলেন এবং এই দৃষ্টিভঙ্গী নিঃসন্দেহে আধুনিক। 'গ্রামের কথা' গ্রন্থের প্রতিটি চরিত্রই সাধারণ গ্রাম্য মানুষ, নিম্ন মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী। প্রচলিত সংস্কারকে শিক্ষার আলোতে বা সংস্কৃতির দীপ্তিতে তারা নস্যাৎ করতে পারেনি শুধুমাত্র নিজেদের প্রয়োজনে গ্রহণ-বর্জন করেছে।

'পিতা পুত্র'[30] উপন্যাসে নরেশচন্দ্র যে সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন তা হচ্ছে যৌথ পরিবারের সমস্যা। এই সমস্যা আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি দেখিয়েছেন যে পরিবারের বিভিন্ন জনের চিন্তাধারার ভিন্নধর্মিতা যৌথ পরিবারের অস্তিত্বকে কিভাবে বিপন্ন করে তোলে। যুগ পরিবর্তনের সাথে সাথে পিতাপুত্রের সম্পর্কেরও পরিবর্তন ঘটে তবু পিতাকে অনেক সময়ই পুত্রের ইচ্ছা মেনে নিতে হয় আবার পুত্রকেও পিতার আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করার জন্য সচেষ্ট হতে হয়। কিন্তু এই মেনে নেওয়ার মধ্যে আনন্দ নেই কোন-পক্ষরই, আছে বিষাদের ছাপ। পিতাপুত্র উপন্যাসে এই বিষাদের ছাপটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এই কাহিনীর মধ্যে পিতাপুত্রের যে বিরোধ তুলে ধরা হয়েছে মূলত তা হচ্ছে কালের ব্যবধানের বিরোধ। গোপীমোহন নিঃস্ব জমিদার শ্রেণীর প্রতিভূ। জীবন ধারণ করা সম্পর্কে তার ধ্যান-ধারণার সঙ্গে বংশে প্রথম চাকুরীজীবী মধ্যবিত্ত পুত্র সতীশের ধ্যান-ধারণার অবিরত সংঘাত দেখা দিয়েছে। যদিও সতীশ পিতার অনেক ইচ্ছা অনিচ্ছাকে প্রশ্রয় দিয়েছে কিন্তু তাদের সর্বনাশকর বিরোধের মীমাংসা হয়নি। আবার অপরপক্ষে চাকুরীজীবী জীবনমোহন জমিদারী আভিজাত্যের দম্ভ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে কৃচ্ছ্রসাধনার মধ্যে পুত্রদের মানুষ করে তুললেও জীবনে পরিপূর্ণ শান্তি পায়নি। আসলে গোপীমোহন ও জীবনমোহন উভয়ই ছিল যৌথ পরিবারের আদর্শে বিশ্বাসী যা কিছুতেই কালের পরিবর্তন প্রবাহে টিকে থাকতে পারে না।

'পিতা পুত্র', উপন্যাসটি নরেশচন্দ্রের অন্যান্য উপন্যাস থেকে একটু ভিন্ন স্বাদের। মানবমনের জটিল রহস্য, প্রেম বা তত্ত্বকথার জটিলতা এই উপন্যাসে নেই বরং এখানে লেখকের আদর্শ, জীবন সম্পর্কে মূল্যবোধ ও পারিবারিক সম্পর্কের প্রতি আনুগত্যই প্রকাশ পেয়েছে। তাই উপন্যাসে সতীশ কখনো পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, সোচ্চার প্রতিবাদ করেনি এবং জীবনমোহনও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সম্পত্তি রক্ষায় জন্য তৎপর হয়ে উঠেছে।

'রাজগী' উপন্যাসটি নরেশচন্দ্রের আরেকটি দুঃসাহসিক রচনা। উপন্যাসটি 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয় এবং পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশ লাভ

করে।[৩১] আলোচ্য গ্রন্থটিতে লেখক জমিদারী প্রথাকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেছেন। ইতিপূর্বে একটি প্রবন্ধে তিনি জমিদারী প্রথা বিলোপ ও কৃষকদের হাতে জমির বিলি ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করেছেন। যদিও এই উপন্যাসের মধ্যে তার এই বক্তব্য সংক্ষিপ্তভাবে রয়েছে, কিন্তু কাহিনীর পরিণতি ও নায়ক চরিত্রের উত্তরণের মধ্যে এই তত্ত্বই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এই 'রাজগী' উপন্যাস সম্পর্কে তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় লিখেছেন—'আমার একটি বিশেষ ঋণ আছে তাঁর [নরেশচন্দ্রের] কাছে। তাঁর রচনা রাজগীতে প্রথম পেয়েছিলাম সমাজ ও মানুষের উপর জমিদারী প্রথার ফলাফলের পরিচয়। পরিচয় আমার ছিল তবে তাকে যে সাহিত্যের মধ্যে গল্প উপন্যাসের অঙ্গীভূত করা যায় তা পেয়েছিলাম তাঁর রাজগীর মধ্যে। উপন্যাস হিসাবে রাজগী অগ্নিসংস্কারের মত সার্থক নয়। বিষয়বস্তু তার ভারী এবং বাস্তবতার রুক্ষতায় কণ্টকিত অমসৃণতা সেকালে অনভ্যস্ত পাঠক-চিত্তকে পীড়া দিয়েছিল একথা সত্য কিন্তু তিনি পথিকৃৎ। তাঁর থেকেই পেয়েছিলাম এবং বুঝেছিলাম যে দেশ ও সমাজে ভূমিব্যবস্থা জীবনের সুখদুঃখ ও মনের গতি ও ও প্রকৃতির নিয়ামক শক্তিগুলির অন্যতম প্রধান শক্তিশালী নিয়ামক। বাংলার পল্লীর মানুষের প্রেম দয়া মায়া শিক্ষা সংস্কৃতি সমস্ত কিছুর ঝুঁটি ধরে এই ভূমিবিধান নিয়ন্ত্রণ করছে। বাংলার জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের কল্পনা এবং আন্দোলন যাঁরা করেছেন—তাঁদের মধ্যে প্রথমদের তিনি একজন। তাঁর রাজগী এদিকে প্রথম পদরেখা অঙ্কিত করে গেছে। সেই পথে পরবর্তী কালে আমি হেঁটেছি, সে ঋণ আমার চিরস্মরণীয় ঋণ।"[৩৩]

নরেশচন্দ্রের 'রাজগী' উপন্যাসটি প্রায় দশ-বার বছর নিঃসন্দেহে জনপ্রিয় ছিল। রাজগী প্রকাশের প্রায় দশ বছর পর, ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৭ সালে উপন্যাসটি চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়ে শ্রী চিত্রগৃহে মুক্তি লাভ করে।[৩৪] এই চলচ্চিত্রে নায়ক দ্বিজেশের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন ধীরাজ ভট্টাচার্য। আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন, 'সুকুমার দাশগুপ্ত কমলা টকীজের হয়ে ডঃ নরেশ সেনগুপ্তের বিখ্যাত উপন্যাস রাজগীর চিত্ররূপ দেবেন, নায়কের ভূমিকায় আমাকে নির্বাচন করে ডেকে পাঠালেন। প্রথমটায় বিশ্বাস করতেই পারিনি ওরকম একটি জটিল মনস্তত্ত্বমূলক ভূমিকায় কি করে আমায় মনোনীত করলেন। সত্যকার রক্তমাংসের জলজ্যান্ত নায়ক দ্বিজেশের ভূমিকায়।'[৩৫]

'রাজগী' কাহিনী উত্তমপুরুষের জবানীতে বিবৃত। নায়কের স্মৃতিচারণায় কাহিনীটি আরম্ভ হয়েছে তাই প্রতিটি ঘটনাই পাঠকদের দেখতে হয় নায়কের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ এখানে গল্প পরিবেশন করেছেন রাজাবাবু দ্বিজেশচন্দ্র স্বয়ং।

নবাবগঞ্জের রাজাবাবু দ্বিজেশচন্দ্র অপুত্রক রাণীমার দত্তকপুত্র। সে ছিল এক কাঠকুড়ানি মার শিশু কার্তিক। রাজবাড়ীতে আসার পর দ্বিজেশের ভার পড়ে ছোকরা খানসামা বিপিনের উপর। বাল্যে ও কৈশোরে বিপিনই ছিল তার সাথী ও সহচর। বিপিন দরিদ্র ভৃত্য, তার জীবনের একমাত্র অভিপ্রায় অর্থ উপার্জন এবং তা যে কোন

মূল্যে। তাই সে রাজাবাবুর সমস্ত দুষ্কার্যের প্ররোচনা জুগিয়েছে, এমন কি নিজের বোন বিধুর সঙ্গে দ্বিজেশের অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। বিপিনের মা পার্বতী পিসিও এই একই উদ্দেশ্যে দ্বিজেশের মনে নানারকম সন্দেহ ঢুকিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছে এবং রাণীমার সঙ্গে দ্বন্দ্বে নামার জন্য তাকে উৎসাহিত করেছে। বিধু এদের মত নয়। বালবিধবা এই মেয়েটি দ্বিজেশকে শুধু ভালবেসেছে। তার মা ও দাদা বিপিনের কথা না শোনার জন্য দ্বিজেশকে সে শপথ করিয়েছে। অছিমদ্দির স্ত্রীর সঙ্গে তার রাজাবাবুর সম্পর্ক তাকে মর্মাহত করেছে এবং একমাত্র সেই দ্বিজেশকে ভালো হবার অনুরোধ জানিয়েছে বার বার। সে দ্বিজেশের স্ত্রী সাবিত্রীর সহচরী হতে চেয়েছে শুধু দ্বিজেশকে দেখার জন্য।

দ্বিজেশের বয়স যখন মাত্র সতের তখন তার বিয়ে হয় জমিদার কন্যা সাবিত্রীর সাথে। সাবিত্রী বালিকা হলেও বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন বুদ্ধিমতী মেয়ে, তাই বিধুর প্রতি তার স্বামীর আসক্তি তার চোখে ধরা পড়ে যায় এবং সেই কারণেই বিধুদের বাস্তু-ভিটা ছাড়তে হয়। এ রাজবাড়ীতে যদিও বড় রাণীমার রাণী হয়েও দাইমার 'প্রসাদগ্রহণ করতে হোত'—কিন্তু বালিকা সাবিত্রী রাজবাড়ীর সে নিয়মকে দূর করতে পেরেছে নিজের দৃঢ় চেষ্টায়। দ্বিজেশ অবশ্য সাবিত্রীর এই জেদের জন্যই তার উপর বিরূপ হয়ে উঠেছে কেননা সাবিত্রীর এই সতীত্বের অহংকার সে সহ্য করতে পারেনি। এই সময় দ্বিজেশকে পড়াশুনার জন্য কলকাতায় পাঠানো হয় এবং নরেনবাবুর কাছে তার শিক্ষার ভার দেওয়া হয় এবং নরেনবাবুর সংস্পর্শে এসে দ্বিজেশের চরিত্রে আশ্চর্য পরিবর্তন দেখা দেয়। এই পরিবর্তনের ফলে দ্বিজেশ নিজেই ভাবে তার ফেলে-আসা জীবনের অংশটা যদি জীবন থেকে মুছে ফেলা যেত! কিন্তু সম্পূর্ণ এক ভিন্ন চরিত্রের মানুষ হয়ে দ্বিজেশ দেশে ফিরে এলেও সাবিত্রীর মিথ্যা সন্দেহ থেকে সে রেহাই পায়নি। নরেন-বাবুর নতুন শিক্ষার আলোতে দ্বিজেশ বুঝতে পেরেছে জমিদারী শাসন ব্যবস্থার অবিচার এবং এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সে প্রতিবাদে জানিয়েছে। রাণীমা ও দেওয়ানজী দ্বিজেশের এই পরিবর্তন লক্ষ্য করে নরেনবাবুকে বিতাড়িত করে দ্বিজেশের জন্য এক নতুন শিক্ষকের ব্যবস্থা করেন। ক্রুদ্ধ দুঃখিত দ্বিজেশ কলকাতায় এসে আবার নতুন করে বিলাসব্যসনে নিজেকে ভাসিয়ে দেয়। ঠিক এসময় হঠাৎ বিধুর সঙ্গে তার দেখা হয়। বিধুর সঙ্গে পূর্ব সম্পর্কের জের টেনে কিছুদিন দ্বিজেশের আনন্দেই কাটে। কিন্তু নরেনবাবুর কাছে পাওয়া শিক্ষা তার রুচির যে পরিবর্তন ঘটিয়েছে তার ফলে দ্বিজেশের এই জীবনযাত্রাকে ক্রমশ বোঝা মনে হয়। এক অদ্ভুত অন্তর্দ্বন্দ্বে কাতর হয়ে দ্বিজেশ যখন বিধুকে ত্যাগ করে পালিয়ে আসে তখন বিধুর কোলে একটি সন্তান। এ সুখহীন আশাশূন্য অবস্থায় কলকাতার বিভিন্ন কুখ্যাত পাড়ায় ঘুরে বেড়িয়ে দ্বিজেশ যখন ক্লান্ত তখন তার আবার দেখা হয় রুগ্না স্বাস্থ্যহীনা দারিদ্র্যের প্রতিমূর্তি বিধুর সঙ্গে। বিধুর ছেলেটি তখন বিনা খাদ্যে বিনা চিকিৎসায় মারা গেছে। দ্বিজেশ নরেনবাবুর কাছে অকপটে সবকিছু স্বীকার করে তাকে অনুরোধ করে বিধুর ভার নেওয়ার জন্য। নরেনবাবু বিধুর ভার নেওয়ার

পর দ্বিজেশ আবার পড়াশুনা শুরু করে কিন্তু তার দেহ ও মনের অদৃশ্য অমোঘ এক উত্তেজনা তাকে মদ ও নারীর সান্নিধ্যে বার বার ছুটিয়ে নিয়ে যায়। জমিদারী যখন দ্বিজেশের হাতে আসে তখন বিধু ও রাণীমার মৃত্যু হয়েছে। ইতিপূর্বেই নরেনবাবুর সাহায্যে সে বুঝতে পেরেছিল জমিদারী ব্যবস্থার অকল্যাণকর দিকটা এবং মার্কস, ওয়েব দম্পতির বই ও ম্যাকডোনাল্ডের আলোচনা পড়ে তার দৃষ্টিভঙ্গী আরও স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে। তাই জমিদারী যখন দ্বিজেশের হাতে এসেছে তখন তার এক দোলায়িত অবস্থা যেহেতু জমিদারী ব্যবস্থার শোষণের দিকটাও তার কাছে তখন স্পষ্ট। কিন্তু সাবিত্রীর স্বামী সম্পর্কে ধারণা ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সে ভেবেছিল যে এবার দ্বিজেশ জমিদারীর পুরোটাই অনাচারে এবং অসংযত অর্থ ব্যয়ে উড়িয়ে দেবে। সে দ্বিজেশকে অনুরোধ করে জমিদারীর একটা অংশ তার নিজের নামে আইনসিদ্ধ করে দেওয়ার জন্য। দ্বিজেশ অবশ্য আগেই উপলব্ধি করেছিল যে, এই জমিদারীর উপর সাবিত্রীরও অধিকার আছে আর তার নিজেরও স্ত্রীর প্রতি কিছু কর্তব্য আছে। সবদিক বিবেচনা করে দ্বিজেশ তার জমিদারী দুই ভাগে ভাগ করে এক অংশ সাবিত্রীর নামে লিখে দেয় এবং বাকী-অংশ প্রজাদের মধ্যে বিলি করে দেওয়ার জন্য নরেনবাবুকে ট্রাস্টি করে তাঁর নামে লিখে দেয়। দ্বিজেশ স্থির করে যে সে চাকরী করে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেবে। এবার সাবিত্রী নিজের ভুল বুঝতে পারে। সাবিত্রী দ্বিজেশকে গ্রাম ছেড়ে যেতে দেয় না। দ্বিজেশ একটুকরো জমি চাষবাস করে অতি সাধারণ কৃষকদের মত জীবন কাটাতে থাকে আর খোকার হাত ধরে সাবিত্রীর তাতেই পরম তৃপ্তি। অবশ্য তখনও তারা রাজাবাবু রাণীমা হিসাবেই সবার শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্র।

'রাজগী' কিছুটা জীবনধর্মী উপন্যাস। জমিদার দ্বিজেশচন্দ্রের জীবনের একটা বৃহৎ অংশ এই কাহিনীর বিষয়বস্তু। মনে হয় যেন জমিদারী প্রথার বিচিত্র পরিবেশে মানব-চরিত্রের বিভিন্নতা ও বিবর্তন বিন্যাস করাই লেখকের উদ্দেশ্য। নিছক মানুষ হিসাবে দোষ-ত্রুটির মধ্য দিয়ে দ্বিজেশের পথযাত্রা বর্ণিত হলেও কাহিনীর আবর্তে দ্বিজেশের দ্বৈতচরিত্র বহুতলবিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। রেট্রোস্পেকটিভ আত্মজীবনী বলার ভঙ্গীর মধ্যে জমিদার দ্বিজেশের স্বীকারোক্তি স্পষ্ট, সত্যনিষ্ঠ ও আত্মসমালোচনায় মুখর। ঔপন্যাসিকের এই রীতি অনুসরণের মধ্যে বেশ কিছুটা নতুনত্ব রয়েছে। জমিদারী প্রথা বিলোপ বা পরিবর্তনের তত্ত্বকথা থাকলেও মানুষ দ্বিজেশের চরিত্রের উত্তরণই এখানে প্রধান হয়ে উঠেছে। তত্ত্বকথা এখানে চরিত্র বা কাহিনীকে গ্রাস করেনি। তাই প্রতিটি চরিত্রই সজীব ও সচল।

কাহিনীতে দ্বিজেশের চরিত্রের তিনটি রূপান্তর স্পষ্ট। কৈশোর যৌবনের সন্ধিক্ষণে সে নারী আসক্ত লিপ্সু ভোগী পুরুষ, প্রথম যৌবনে মূলত জ্ঞান পিপাসু এবং পরিণত যৌবনে ত্যাগী। কিন্তু তার এই পরিবর্তন রোমান্টিক উন্মাদনা নয়—এর কারণ নরেনবাবুর সান্নিধ্য ও শিক্ষা। যে শিক্ষার ফলে সে সমাজজীবনের বর্ণবৈষম্য ও অর্থের মানদণ্ডে রাজা-প্রজার তফাৎ বুঝতে শিখেছে। যারা সম্পদ উৎপাদন করে তাদের

বঞ্চিত করে জমিদারের মুনাফা করাটাকে সে অন্যায় মনে করেছে। তার তত্ত্বজ্ঞানকে সে প্রয়োগ করেছে প্রজাদের মধ্যে জমির বিলি ব্যবস্থা করে দিয়ে। যদিও অতীতে অশিক্ষায়, জমিদারী জীবনের প্রচলিত প্রবহমানতায় সে অতিবাহিত করেছে তার লাম্পট্যের জীবন। দ্বিজেশের জীবনে এই দুই সীমানার সমন্বয় এনে বস্তুত লেখক সমাজবিজ্ঞানের কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা বজায় রেখেছেন। সমাজের পাপপুণ্য, স্নেহ ভালবাসা, প্রেম, প্রীতি, শ্রদ্ধা, সন্দেহ সবকিছুই যে জমিদারী প্রথার সঙ্গে জড়িত এ বোধ নরেশচন্দ্রের ছিল। বাস্তব সচেতন নরেশচন্দ্র জানতেন যে এক আদর্শ সমাজ গড়ে তোলার পিছনে আছে অজস্র অন্তরায় কিন্তু তাঁর ধারণা ছিল যে সমাজের পরিবর্তনের জন্য প্রথম পদক্ষেপ হওয়া উচিত জমিদারী প্রথা বিলোপ করা। কিন্তু এই তত্ত্বকথা বাদ দিয়ে লেখক দেখিয়েছেন যে মানুষ দ্বিজেশচন্দ্র ছিল প্রেম ভালবাসার কাঙাল। বিধুর ভালবাসার মধ্যে তার একটা অপরাধবোধ কাজ করেছে তাই সেই প্রেম একনিষ্ঠতায় মহিমান্বিত হতে পারেনি। বিধুর জীবিতাবস্থায় এই প্রেম স্বীকৃতি পায়নি। মানুষ হিসাবে দ্বিজেশের আরও একটা কর্তব্য ছিল সাবিত্রীকে বঞ্চিত না করা। সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ সাবিত্রীকে লিখে দিয়ে সে তার কর্তব্য পালন করেছে। পরোক্ষভাবে জমিদারী প্রথাকে রক্ষা করা হলেও লেখক এখানে কাহিনীর স্বাভাবিকতা বজায় রেখেছেন কেননা উপন্যাস কিছুটা তত্ত্বনির্ভর বা উদ্দেশ্যমূলক হলেও তত্ত্বসর্বস্ব প্রবন্ধ নয়, মূলত তা রস সাহিত্য। আর এই একই কারণে দ্বিজেশ পত্নী সাবিত্রী পূর্বপ্রথাসিদ্ধ সতী, দ্বিজেশ-সাবিত্রীর প্রেম উপাখ্যানের প্রথাসিদ্ধ তিনটি স্তর—বিবাহ, বিচ্ছেদ ও পুনর্মিলন। অথবা সাবিত্রীর সতীত্বের মহিমায় লম্পট দুশ্চরিত্র জমিদার স্বামী মধ্যবিত্ত সুবোধ বালকের মত ঘরে ফিরে এসেছে। বস্তুত এই উপন্যাস পাঠে মনে হয় প্রগতিশীল আদর্শবাদী লেখক নরেশচন্দ্রও সেকালের প্রচলিত রোমান্টিক উপন্যাসের যুগচিহ্ন অতিক্রম করতে পারেন নি।

'দূরের আলো'[৩৬] উপন্যাসটি দাম্পত্য বিরোধ ও তার নিষ্পত্তি নিয়ে রচিত। এই উপন্যাসে লেখক স্বামী-স্ত্রীর বিরোধ আলোচনা করতে গিয়ে দেখিয়েছেন যে পারিপার্শ্বিক ঘটনাশ্রয়ে স্বামীর সন্দেহ কিভাবে একটি সৎ ও শান্ত স্ত্রীর জীবনে বিপর্যয় নিয়ে আসতে পারে। গান্ধীজীর অহিংসা অসহযোগ আন্দোলনকে লেখক এখানে দাম্পত্য বিরোধের একটি গৌণ কারণ হিসাবে ব্যবহার করেছেন। লেখকের 'শান্তি' উপন্যাসেও এই ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়।

'দূরের আলো' উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্রই অস্পষ্ট এবং কিছুটা অবাস্তব। কুমুদিনী চরিত্রের চলাফেরা কিছুটা স্বাভাবিক হলেও আকস্মিক ঘটনা নির্ভর করেই তা রচিত। যার প্রমাণ তার আত্মহত্যার চেষ্টা এবং সে চেষ্টা বিফল হওয়া। তার উপন্যাস লিখে জীবিকা উপার্জন করার ব্যাপারটিও স্বাভাবিক নয়। চিত্রার আচরণ আমাদের কাছে অপরিচিত, উপেনের সঙ্গে তার কলকাতায় এসে ব্রহ্মচারিণী রূপে বসবাস করার ব্যাপারটা অভিনব, আর উপেনের সন্দেহপ্রবণ মন হঠাৎ কি কারণে সন্দেহ মুক্ত হলো

সে বিশ্লেষণ ও চিন্তাভাবনাও উপন্যাসে নেই। তাই উপেনের আচরণও কিছুটা অদ্ভূত মনে হয়। শুধুমাত্র নবীন চক্রবর্তীর প্রবঞ্চক-দেশভক্ত চরিত্রটি যথাযথ পরিস্ফুটিত হয়েছে।

আলোচ্য উপন্যাসে স্বামী স্ত্রীর বিরোধের দুটি কারণ স্পষ্ট। এক, স্বামী স্ত্রীর চরিত্রগত ভিন্নধর্মিতা এবং দুই, স্বামীর অহেতুক সন্দেহ। যদিও এই দুটি কারণের মধ্যে যথেষ্ট গভীরতা রয়েছে কিন্তু লেখকের বিন্যাস ও বিশ্লেষণের অভাবে উপন্যাসটি গভীর ও মননধর্মী হয়ে ওঠেনি, এর কারণ অবশ্যই নবীন চক্রবর্তীর মত প্রবঞ্চক-দেশভক্তের ক্রিয়াকলাপ যা উপন্যাসের মেজাজটি লঘু ও তরল করে দিয়েছে।

মোটের উপর 'দূরের আলো' উপন্যাসটিকে নরেশচন্দ্রের সার্থক রচনা কোন ক্রমেই বলা চলে না।

'মিলন পূর্ণিমা'[৩৭] রচনাকালে নরেশচন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে কলকাতা এসে আইন ব্যবসায় পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করছেন। স্বাভাবিক কারণেই তিনি তখন খুব ব্যস্ত, ফলে উপন্যাসটির বিষয়বস্তু পিনদ্ধ হতে পারেনি। আবার পত্রিকা সম্পাদকের তাগাদার ফলে হয়ত খুব দ্রুত এই উপন্যাসটি রচনা করতে হয়েছে তাই মনে হয় যে এই উপন্যাসটি তিনি যত্নের সঙ্গে রচনা করতে পারেনি ফলে তার অন্যান্য উপন্যাসের তুলনায় এ রচনাটি গাম্ভীর্যবর্জিত ও লঘু হয়ে উঠেছে।

'মিলন পূর্ণিমা' একটি প্রেম উপাখ্যান। কিন্তু এই উপন্যাসেও লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী পুরোপুরি রোমান্টিক নয়। তিনি বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার কথাও এখানে উল্লেখ করেছেন। যদিও উপন্যাসে বর্ণিত কাহিনীকাল সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির কাল। [চল আজ সুরেনবাবুর কাছে যাই, পৃঃ-৫৭] তৎকালীন অপরিণামদর্শী যুবকদের রোমান্টিক উদ্দীপনায় দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রবণতা এবং বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যে প্রতিযোগিতা ও বিরোধের ঘটনাও তিনি এই উপন্যাসে তুলে ধরেছেন।

নরেশচন্দ্র এই উপন্যাসের মধ্যে তৎকালীন বিভিন্ন সমস্যার আভাস দিলেও তিনি কাহিনীটি সম্পূর্ণ হৃদয়বৃত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মানুষমাত্রই যে প্রেম ও গৃহের প্রতি একটা দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভব করে, উচ্চশিক্ষিত দেশপ্রেমী ও ত্যাগের আদর্শে অনুপ্রাণিত এ কাহিনীর নায়ক সৌরেনও তার বাইরে যেতে পারেনি। বাহ্যিক কারণে সে যতই দেশ সেবার জন্য মেতে উঠুক না কেন অন্তরে সে রেখার জন্য সব সময়ই দৈন্য অনুভব করেছে। লেখক নিত্যরঞ্জনের সংঘ বা খিদিরপুরের সমিতি ইত্যাদির সীমাবদ্ধতা প্রমাণ করার জন্য উপন্যাসের বহু পৃষ্ঠা ব্যয় করেছেন যেহেতু তাঁর মতাদর্শে শুধুমাত্র আবেদন নিবেদন বা সভা সমিতির দ্বারা দেশের উন্নতি সম্ভব নয়। এই সব তাত্ত্বিক আলোচনা কাহিনীর সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করতে পারেনি বরঞ্চ কাহিনীর মূলরসকে ব্যাহত করেছে এবং গতিকেও মন্থর করে তুলেছে। যদিও প্রতিটি ক্ষেত্রেই নায়ক নায়িকার সীমাবদ্ধতার উল্লেখে কাহিনীটি বাস্তবতা বর্জিত হয়নি। নিত্যরঞ্জনের স্পর্শে রেখার পুলকানুভব, চরিত্রগত দিকে অসংযত মনে হতে পারে কিন্তু বাস্তবতার বিচারে মোটেই অসংগত নয়।

'তৃপ্তি'[৩৮] উপন্যাস প্রকাশ কালে নরেশচন্দ্র ঔপন্যাসিক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে উপন্যাসটি 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল[৩৯]। গ্রন্থটির দুটি সংস্করণ হয়। 'শুভা', 'রক্তের ঋণ', 'শান্তি', 'বিপর্যয়' প্রভৃতি লেখকের পূর্ববর্তী গ্রন্থ থেকে এই উপন্যাসটি বেশ কিছুটা ভিন্ন স্বাদের, যদিও এই উপন্যাসের নায়িকাকেও তিনি তাঁর পূর্ববর্তী নায়িকাদের মতই তেজদীপ্ত ও দৃঢ়চেতা নারী হিসাবেই অঙ্কিত করেছেন। 'তৃপ্তি' উপন্যাসের নায়িকা তার বিবাহিত জীবনের জটিল প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আপোষহীন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নিজের সম্মান ও মর্যাদা অটুট রাখতে সক্ষম হয়েছে।

শিশির ও বিনোদ দুই বন্ধু। দুজনের বয়সই চল্লিশের উর্দ্ধে। দুজনেই বিবাহিত। শিশির বিপত্নীক। তার স্ত্রী বিদ্যুতের পাতিব্রত্য ও গৃহকর্মনিপুণতা পারিচিত মহলে প্রবাদে পরিণত হয়েছিল। শিশির স্ত্রী ছাড়া অন্য কোন নারীকে কল্পনায়ও স্থান দেয়নি। তারা ছিল এক আদর্শ দম্পতি। বিদ্যুতের মৃত্যুর পর চৌদ্দ বছরের ছেলে দিলীপকে নিয়েই শিশিরের দিনরাত কাটে। মাতৃহারা এই বালকটি যেন তার মায়ের অভাব না বুঝতে পারে এবং তার জীবন যাতে পরিপূর্ণ সার্থক হয়ে ওঠে সেজন্য শিশির তাকে অত্যধিক স্নেহমমতায় পালন করতে থাকে।

এসময় একদিন বিনোদের বাড়ীতে শিশিরের পরিচয় হয় বিনোদের শালী মিনতির সাথে। মিনতির বয়স কুড়ি, সে বি. এ পড়ে ও কবিতা লেখে। শিশির মিনতির সাথে আলাপ করে ও তার কবিতা পড়ে মুগ্ধ হয়ে যায়। বিশেষ করে মিনতির একটা কবিতার মধ্যে সে মিনতির উদার মাতৃস্নেহের পরিচয় পায়। সেই কবিতায় মিনতি লিখেছে—'আমার মায়ের স্নেহে নাহি থাকে সীমার বিবাদ / জঠরে সন্তান আসি / কেড়ে যদি লয় স্নেহ / অপুত্ররে দূরে দেয় ঠেলে / আমার সন্তান দিও / হে বিধাতা, অপরের কোলে।' মুগ্ধ বিস্মিত শিশির এই কবিতা পড়েই ভেবে নেয় যে এই মানসিকতার নারী মিনতিকে বিয়ে করলে দিলীপের কোন কষ্টই হবে না। আর বিদ্যুতের জন্য তার অটুট ভালবাসা থাকলেও মিনতিকে সে মনে মনে কামনা না করে পারেনি। এমনকি মিনতিকে বিয়ে করলেও সে যে তাকে তার প্রথম প্রেমের অখণ্ড হৃদয় দিতে পারবে না সেজন্য সংকোচ অনুভব করেছে।

মিনতি শিক্ষিত মেয়ে হয়েও বিবাহ ও সংসারের জন্য ব্যাকুল ছিল। যৌবনের প্রথম উন্মেষে নিজের রূপ সম্পর্কে তার একটা অভিমান ছিল কিন্তু ক্রমশঃ বিভিন্ন পাত্র পক্ষের অপছন্দের কারণে সে তার এই অভিমানটুকুকে চিরদিনের মত বিদায় করে দিয়েছিল। বাড়ীতে বহুদিন শিশির ও বিদ্যুতের প্রেমময় সুখী পরিবারের গল্প শুনে সে মনে মনে অনেকবার বিদ্যুতের সঙ্গে নিজের তুলনা করেছে এবং ভেবেছে যে শিশিরের মতো স্বামী পেলে সেও পারে বিদ্যুতের প্রশংসা ম্লান করে দিতে। তাই যখন সে জানতে পারে যে শিশির উপযাচক হয়ে তাকে বিয়ে করতে চেয়েছে তখন সে তার এই সৌভাগ্যকে

অভিনন্দিত না করে পারেনি এবং মনে মনে তখনই স্থির করেছে যে সপত্নী পুত্রকে সে স্নেহে সেবায় নিজের করে তুলবে।

মিনতি কিন্তু দিলীপকে আপন করে নেওয়ার সুযোগ পেল না। সে যেদিন বিয়ের পর শিশিরের বাড়িতে প্রথম এল সেদিনই দিলীপ নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ায় তার সমস্ত আশা মিথ্যে হয়ে গেল। শিশিরও এই আঘাত সহ্য করতে না পেরে দিলীপের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে আর অসহায় মিনতি শুধু দিলীপকে ফিরে আসার জন্য কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রতীক্ষা করতে থাকে।

বছর তিন-চার পরে একদিন মিনতি এক নবীন সন্ন্যাসীকে দিলীপ ভেবে বাড়ী নিয়ে আসে এবং দিলীপকে পাওয়া গিয়েছে এই মর্মে শিশিরকে চিঠি দেয়। মিনতির গৃহে স্থান নিলেও এই নবীন সন্ন্যাসী কিন্তু বার বার মিনতিকে বলেছে যে সে দিলীপ নয়। এদিকে বাড়ী ফেরার পথে শিশিরের সঙ্গে দিলীপের দেখা হয় এবং পিতাপুত্র বাড়ী ফিরে আসে। বাড়ী ফিরে এসে শিশির ও দিলীপ কিন্তু শুধুমাত্র সাধুকেই প্রবঞ্চক মনে করে না সেই সঙ্গে মিনতিকেও কুৎসিত সন্দেহ করে বসে। অপমানিত মিনতি পিতাপুত্রকে ত্যাগ করে বাপের বাড়ী ফিরে যায়। দিলীপ মিনতিকে পুরোপুরি অবিশ্বাসী ও হীন-চরিত্রা প্রমাণ করার জন্য মিনতির চিঠিপত্র অনুসন্ধান করতে থাকে। মিনতির চিঠিপত্র পড়ে কিন্তু দিলীপ তাদের নিজেদের ভুল বুঝতে পারে এবং লজ্জিত হয়ে মিনতিকে বাড়ী ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করে যদিও মিনতি তার পরিত্যক্ত সংসারে ফিরে আসতে রাজী হয় না।

দিলীপকে ফিরে পাওয়ার পর মিনতি বাপের বাড়ী ফিরে গেলে শিশির নিজের ব্যবহারে এক অপরিসীম আত্মগ্লানি অনুভব করে এবং ক্রমে ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ে। অসহায় দিলীপ তখন নবীন সন্ন্যাসী তোতারামের সহায়তায় মিনতিকে বাড়ী ফিরিয়ে আনে। মিনতির সেবাশুশ্রূষায় শিশির যখন বেঁচে ওঠে তখন সে পক্ষাঘাতে পঙ্গু। তখন মিনতি স্বামীর সেবা-শুশ্রূষার মধ্যেই জীবনের সার্থকতা খুঁজেছে এবং কাহিনী শেষে দেখা যায় পঙ্গু, বৃদ্ধ শিশির ও প্রৌঢ়া মিনতি পরস্পরের কাছে তৃপ্তি খুঁজছে।

শিশির 'তৃপ্তি' উপন্যাসের প্রধান পুরুষ চরিত্র। তার জীবনে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সম্পদ কিছুরই অভাব ছিল না কিন্তু স্ত্রী বিদ্যুতের মৃত্যুতে সে পুত্র দিলীপকে নিয়ে অসহায় হয়ে পড়েছে। দিলীপকে নিয়েই সে ব্যস্ত থাকতে চেয়েছে কিন্তু স্ত্রীর অভাববোধ থেকে সে পরিত্রাণ পায়নি। খুব স্বাভাবিক কারণেই সে তাই মিনতির উদার মনের পরিচয় পেয়ে তাকে বিয়ে করতে চেয়েছে এবং দিলীপকে ও সেই সঙ্গে নিজেকে মিনতির হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছে। কিন্তু তার এই সচেতন কর্তব্যজ্ঞানের অন্তরালে বস্তুতঃ সে মিনতির প্রতি এক দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভব করেছে এবং স্বতন্ত্রভাবে মিনতিকে কামনা করেছে। দিলীপ সম্পর্কে তার ভাবনার মধ্যেই এই অনুভূতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দিলীপকে দেখে তার মনে হয়েছে 'বিদ্যুৎ তার ভালবাসার এই শেষ চিহ্নটি শিশিরের হাতে সমর্পণ করিয়া গিয়াছে, শিশিরের কর্তব্য, নিঃশেষে ইহার সেবায় আত্মনিয়োগ

করা। অথচ এই মিনতির সন্ধানে কলিকাতায় ছুটিয়া ছুটিয়া সে ইহাকে অবহেলা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তার হাসি পাইল। তের বছরের ছেলের সামনে সে কোন লজ্জায় টোপর পরিয়া বিবাহ করিতে যাইবে? —তাছাড়া দিলীপের ঘাড়ে একটা সৎমা এবং তাহার স্নেহের অংশীদার বৈমাত্রেয় ভাই চাপাইবার তার কি অধিকার আছে?' [দ্বিঃ সং, পৃঃ-৪৭] এই চিন্তাভাবনার পরেও শিশির মিনতিকে দেখার জন্য বার বার কলকাতা গিয়েছে এবং মিনতির দেখা না পেয়ে অপ্রসন্ন হয়েছে। মিনতিকে বিয়ে করার জন্য শিশির যতই উতলা হয়েছে দিলীপের জন্য একটা অপরাধবোধ ততই মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। তাই দিলীপের গৃহত্যাগের কারণে শিশিরের মিনতির প্রতি তীব্র কামনা খুব সহজেই ঘৃণায় পরিবর্তিত হয়েছে। শিশির উচ্চশিক্ষিত হলেও সংস্কার ত্যাগ করতে পারেনি। তার মনে হয়েছে যে মিনতিকে বিয়ে করে সে পাপ করেছে এবং এই পাপের ফলেই তার একমাত্র পুত্রকে হারাতে হয়েছে। এই বিশ্বাসেই সে বিদ্যুতের ছবির সামনে নিজের অপরাধ স্বীকার করেছে এবং ভেবেছে—'সে যদি মোহে অন্ধ হইয়া মিনতির পিছনে না ছুটিয়া দিলীপের প্রতি তার কর্তব্য করিয়া যাইত, যদি সে দিলীপের উপর অনন্যমনা হইয়া দৃষ্টি রাখিত তবে তো দিলীপকে আজ সে হারাইত না। সে আপনাকে বার বার ধিক্কার দিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে মিনতির উপর তার একটা দারুণ বিতৃষ্ণার ভাব জাগিয়া উঠিল। সেই তো যত অনিষ্টের মূল।' [দ্বিঃ সং, পৃঃ-৮৯] পরবর্তী সময়ে শিশিরের এ ধারণা কিছুটা বদলালেও সে মিনতিকে কখনোই এ ব্যাপারে নির্দোষ ভাবতে পারেনি। বিদেশে দিলীপের সন্ধানে ঘুরে ঘুরে সে এই সিদ্ধান্তে এসেছে যে, মিনতির সঙ্গে ঘর করা তার পক্ষে আর সম্ভব নয়। এ চিন্তা আভাসিত হয়েছে মিনতিকে লেখা তার চিঠিতে—'বয়সের অযোগ্য মোহে অন্ধ হইয়া সে পাপ করিয়া ফেলিয়াছে, ভগবান তার শাস্তি হাতে হাতে দিয়াছেন। মিনতির তাতে কোন দোষ নাই সত্য, কিন্তু অভাগ্যের সঙ্গে যখন তার অদৃষ্ট জড়াইয়া গিয়াছে তখন তার দুঃখভোগ ছাড়া উপায় কি? সে মিনতিকে পিত্রালয়ে যাইতে লিখিল।' [দ্বিঃ সং, পৃঃ-৯৫] মিনতি সেই চিঠির উত্তর দিয়েছে কিন্তু শিশির সেই উত্তরের মর্মার্থ বিশ্বাস করেনি। তার ধারণা হয়েছে মিনতি দিলীপের ফিরে আসার জন্য কাঙাল হতে পারে না। খবরের কাগজে দিলীপকে ফিরে আসার জন্য মিনতি যে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল শিশিরের তা চোখে পড়েছে। এই বিজ্ঞাপন দেখে সে ভেবেছিল যে মিনতির কাছে ফিরে যাবে কিন্তু যে দম্ভে সে গৃহত্যাগ করেছিল সেই দম্ভই তাকে মিনতির কাছে ফিরে যেতে বাধা দিয়েছে। যদিও সে ভেবেছে 'সে মিনতির উপর দারুণ অবিচার করিয়া তার জীবনটা ব্যর্থ করিয়া দিতেছে। তার তো কোনও দোষ নাই, সে তো দিলীপকে তাড়ায় নাই।' [দ্বিঃ সং, পৃঃ-১৩০] শিশিরের মিনতির প্রতি ভালবাসার তীব্রতা ঘটনাপরম্পরা সাময়িক হ্রাসপ্রাপ্ত হলেও তা স্থায়ী হয়নি। শিশির ভালবাসার কারণেই মিনতিকে সম্ভব অসম্ভব নানা কারণে সন্দেহ করেছে। এই সন্দেহই শিশিরের চরিত্রের দুর্বলতা। নবীন সাধু তোতারামকে নিয়ে সে মিনতিকে সন্দেহ করেছে

আবার দিলীপের মুখের কথায়ই সে মিনতির প্রতি ব্যবহারে অনুতপ্ত হয়েছে এবং সর্বশেষে পঙ্গু অবস্থায় মিনতির সেবা-যত্নেই তৃপ্তি পেয়েছে।

শিশির ও বিদ্যুতের পুত্র দিলীপ উপন্যাসে খুব অল্প সময় উপস্থিত থাকলেও সমগ্র উপন্যাসটি তাকে নিয়েই আবর্তিত হয়েছে।

দিলীপ মাতৃহারা। মাতার মৃত্যুর পর পিতার কাছে সে সীমাহীন আদর যত্নে প্রতিপালিত হয়েছে। স্বভাবতই তার মনে পিতার জন্য একটা স্বতন্ত্র ভালবাসা গড়ে উঠেছে, এই অবস্থায় পিতার বিবাহের কথা শুনে প্রচণ্ড অভিমানে তার মনে প্রশ্ন জেগেছে 'এও কি সম্ভব? তার বাবা কি কখনো এমন অপকার্য করিতে পারেন?' [দ্বিঃ সং, পৃঃ ৬১] কেননা—'বিমাতা সম্বন্ধে তার আতঙ্ক বাঙ্গালা দেশের কোন বালকের চেয়ে কম ছিল না। শিশুকালে সে দুয়োরাণী সুয়োরাণীর গল্প শুনিয়াছে, ডালিমকুমারের কথা পড়িয়াছে, রামচন্দ্রের প্রতি কৈকেয়ীর কঠোর নির্যাতনের কাহিনী শুনিয়াছে। কাজেই বিমাতা যে মহাশত্রু একথা তার মনে স্বতঃসিদ্ধ রূপেই বরাবর প্রতিষ্ঠিত ছিল।' [দ্বিঃ সং, পৃঃ-৬২] তাই শিশিরের বিবাহের পরই সে নিরুদ্দেশ হয়েছে।

চার পাঁচ বছর বাড়ীর স্নেহমমতা বঞ্চিত হয়ে বিদেশে থাকার ফলে দিলীপের এক বিচিত্র মানসিকতা গড়ে উঠেছে। তার মাতৃহৃদয়ের স্নেহ মমতার জন্য কাঙাল মন হয়ে উঠেছে প্রচণ্ড রকমের নারী বিদ্বেষী। তার পিতা যে তার কারণেই গৃহত্যাগ করে দেশে বিদেশে ঘুরে বেড়িয়েছে এই সত্য কথাটা সে স্বীকার না করে অনায়াসে মিনতির ছলনা ও দুর্ব্যবহারকে এজন্য দায়ী করেছে। মিনতির প্রতি আক্রোশবশতঃই সে ফিরে এসেই মিনতির আশ্রিত সন্ন্যাসী তোতারামের প্রতি দুর্ব্যবহার করেছে। এমনকি বাড়ীর দাসীর মুখে মিনতি ও তোতারাম সম্পর্কে কুকথা শুনে তা বিশ্বাস করেছে এবং মিনতিকে এমন ঘৃণা করেছে যা তার পূর্বের বিমাতার প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ থেকে অনেক বেশী তীব্র। তখন তার ইচ্ছে হয়েছে—'যে মিনতির মাথা মুড়িয়া ঘোল ঢালিয়া চাবুক মারিতে মারিতে বাড়ী হইতে তাহাকে বাহির করিয়া দেয়।' [দ্বিঃ সং, পৃঃ-২২৩] শিশিরের প্রশ্নে যখন মিনতি জানায় যে সে কোন অপরাধই করেনি তখন দিলীপই তৎপর হয়ে তোতারামের কাছে মিনতির লেখা চিঠি নিয়ে এসে বিমাতার চূড়ান্ত অপরাধ প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু মনের অবচেতনে মাতৃস্নেহের জন্য তৃষিত হৃদয় নিয়ে মিনতির মাতৃস্নেহকে সে পূর্বেই স্বীকার করে নিয়েছে এবং তা প্রকাশের জন্য সে উন্মুখ হয়েছিল। তোতারামের প্রতি তার নির্যাতন তার ঈর্ষারই বহিঃপ্রকাশ। এই জন্যই মিনতির চিঠিপত্রের মধ্যে দিলীপ কোন ছলনার সন্ধান পায়নি। মিনতিকে সে নতুনভাবে আবিষ্কার করেছে—যেখানে তার পূর্বের সমস্ত সচেতন চিন্তাভাবনা এক মুহূর্তে ওলট-পালট হয়ে গিয়েছে। চিঠিপত্রের মধ্যে মিনতির স্নেহ ভরা বুভুক্ষু মাতৃহৃদয়ের পরিচয় পেয়ে সে মিনতিকে মা সম্বোধন করে পায়ে ধরে বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেছে এবং পিতার কাছে অকপটে নিজেদের নিদারুণ ভুলের কথা স্বীকার করেছে। শেষ পর্যন্ত যে তোতারামকে সে অপমান করে বাড়ী থেকে বের করে দিয়েছিল তার শরণাপন্ন

হয়ে ও তাকে অনুরোধ করেই শিশিরের অসুস্থতার সময় মিনতিকে ফিরিয়ে এনে নিজের দুর্ব্যবহারের প্রায়শ্চিত্ত করেছে। দিলীপ এই সমগ্র উপন্যাসটির চাবিকাঠি। মিনতি ও শিশিরের বিচ্ছেদ ও পুনর্মিলন এদুটি ঘটনা তারই কারণে সম্ভব হয়েছে।

মিনতি 'তৃপ্তি' উপন্যাসের নায়িকা। সে সপত্নীপুত্রের উপর তার মাতৃস্নেহ উজাড় করে দেওয়ার সংকল্প করেছে অথচ এই সপত্নীপুত্রের কারণেই স্বামী তাকে অবহেলা করেছে, পরিত্যাগ করেছে তার সান্নিধ্য, এমনকি তার বঞ্চিত জীবনের শেষ গর্বের বস্তু তার সতীত্বকেও ঘৃণ্য সন্দেহে কলঙ্কিত করেছে। যদিও সে তার অসীম ধৈর্য্য বজায় রেখে তার সম্মানকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে স্বামীর প্রতি একনিষ্ঠ ভালবাসায় এবং পুত্রের প্রতি স্নেহমমতায়।

মিনতি শিক্ষিতা হলেও আর পাঁচজন সাধারণ মেয়ের মতই তারও—'বিবাহিত জীবনের একটা প্রবল আকর্ষণ ছিল। সে অনেক সময় মনে মনে স্বামী-পুত্র-কন্যা পরিবৃত সংসারের কল্পনা করিয়া আনন্দলাভ করিত' [দ্বিঃ সং, পৃঃ ২৩] কিন্তু বহু পাত্র পক্ষই তাকে পাত্রী হিসাবে উপযুক্ত মনে না করায় সে ভেবেছিল যে তার বিবাহ হবে না। মিনতি তার দিদি ও ভগ্নিপতির মুখে বিদ্যুৎ ও শিশিরের অনেক গল্পই শুনেছিল এবং এসব শুনে তার বার বার মনে হয়েছে যে বিদ্যুতের মতো সে কখনোই স্বামীভাগ্যে সৌভাগ্যবতী হতে পারবে না, চিরদিনই তার একটা নিরর্থক ব্যর্থজীবন অতিবাহিত করতে হবে। অথচ তার বিশ্বাস ছিল—'যদি শিশিরের মত ধনবান সুচরিত্র প্রেমময় স্বামীর ঘরণী হইবার সৌভাগ্য তার হইত তবে সে কি না করিতে পারিত?' [দ্বিঃ সং, পৃঃ ৩১] অর্থাৎ শিশিরের মত স্বামী ও সংসারের প্রতি তার একটা প্রচণ্ড রকমের আকাঙ্ক্ষা ছিল, তাই শিশির যখন উপযাচক হয়ে মিনতিকে বিয়ে করার প্রস্তাব জানিয়ে চিঠি দিয়েছে তখন সেই চিঠির মধ্যে মিনতি দেখতে পেয়েছে—'শিশিরের পীড়িত কুসুম কোমল চিত্তখানি। হায় রে! মিনতি যাকে রাত্রিদিন বসিয়া ধ্যান করিয়াছে, দুর্লভ বস্তুবোধে সে যাকে ভাল করিয়া কামনা করিতেও সাহস পায় নাই—সে মিনতির জন্য ভিখারী হইয়া দাঁড়াইয়াছে ও প্রত্যাখ্যানের ভয়ে ব্যাকুল।' [দ্বিঃ সং, পৃঃ ৪১] মিনতির রোমান্টিক কবিসুলভ মন, শিশির যে বৃদ্ধপ্রায় সপুত্র বিপত্নীক এই রূঢ় বাস্তবকে স্বীকার করেনি। সে শিশিরকে দুর্লভ পাত্র হিসাবেই গ্রহণ করেছে এবং সেই সঙ্গে ভেবেছে যে তার হৃদয়ভরা স্নেহ দিয়ে সে সপত্নীপুত্র দিলীপকে আপন করে নেবে।

মিনতির বিয়ের পর দিলীপ নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ায় মিনতি মাতার মতই পুত্রের নানা অমঙ্গলের কথা ভেবে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছে এবং মনে মনে বলেছে—'অবোধ ছেলে না জেনেই আমার স্নেহের এত অপমান করে গেলি। একবার ফিরে দেখ বাপ, আমি তোর শত্রু নই।' [দ্বিঃ সং, পৃঃ-৯২] কিন্তু শিশিরও মিনতিকে ভুল বুঝেছে। দিলীপের জন্য যে মিনতিরও প্রাণ কাঁদতে পারে এ বিশ্বাস সে করেনি এবং মিনতিকে পিত্রালয়ে ফিরে যাওয়ার জন্য চিঠি দিয়েছে। শিশিরের চিঠি ও ব্যবহারে মর্মাহত মিনতি সংকল্প

করেছে যে দিলীপ ফিরে এলেই সে শিশিরের সংসার ত্যাগ করবে। সে দিলীপ ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করেছে, লোকজন পাঠিয়ে তার অন্বেষণ করেছে এবং খবরের কাগজেও এই মর্মে বিজ্ঞাপন দিয়েছে। কিন্তু দিলীপের কোন সংবাদই সে পায়নি এবং শেষে দিলীপ ভ্রমে সাধু তোতারামকে গৃহে স্থান দিয়ে শিশিরকে দিলীপের ফিরে আসার সংবাদ জানিয়ে চলে আসতে লিখেছে।

শিশির ও দিলীপ ফিরে এসে যে ব্যবহার করেছে তার জন্য মিনতি স্তম্ভিত হলেও ধৈর্য্যচ্যুত হয়নি বা তার দৃঢ়তা হারায়নি। শিশিরের মিথ্যা অভিযোগকে সে স্পষ্টভাবে অস্বীকার করেছে এবং তার প্রমাণ দেওয়ার প্রশ্নে বলেছে—'আমার কথায় যদি তোমার বিশ্বাস না হয়, আমি প্রমাণ দিয়ে তোমাকে বিশ্বাস করাতে যাব, নিজের ধর্ম নিয়ে তোমার সঙ্গে তর্ক করবো এত ছোটলোক আমি নই। তোমার বিশ্বাস নিয়ে তুমি থাক—আমার ধর্ম আমি দেখবো।' [দ্বিঃ সং, পৃঃ-২৩১] শেষ পর্যন্ত মিনতির কাছে শিশির পরাজয় স্বীকার করেছে। পক্ষাঘাতে পঙ্গু শিশিরের তখন একমাত্র হাহাকার, সেই মিনতির সারা জীবনটাকে নষ্ট করে দিয়েছে। আর মিনতি তার একনিষ্ঠ ভালবাসার প্রমাণ দিয়েছে শিশিরকে সান্ত্বনার বাণীতে অভিষিক্ত করে।

এই উপন্যাসের পরিণতি ঘটেছে একটা আশাপ্রদ মিলনের মধ্যে সত্য কিন্তু মিনতির জীবনের দুঃখ লাঞ্ছনা পরিপূর্ণভাবে প্রশমিত হতে পারেনি। কাহিনীর শেষ অংশে সে তৃপ্তির অন্বেষণ করেছে মাত্র। শিক্ষিত উচ্চবিত্তের পরিবারেও নারীর মূল্য, সম্মান ও স্বাতন্ত্র্য সমাজব্যবস্থা অনুসারে যে কতটা অপ্রয়োজনীয়—এই উপন্যাসে লেখক মিনতির জীবন বর্ণনার মধ্য দিয়ে তা স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। বাংলাদেশের মেয়ে মিনতি তার আদর অনাদর সবকিছুই তাই যেন অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে মেনে নিয়েছে।

মিনতি বিবাহের পরই স্বামীর ভালবাসায় বঞ্চিত হয়েছে। যে সপত্নী পুত্রকে তার বুভুক্ষু নারী হৃদয় একান্ত করে পেতে চেয়েছিল, সেও তাকে সম্পূর্ণভাবে নিরাশ করেছে। কিন্তু তার ধৈর্য, নিরলস চেষ্টা ও একাগ্রতা এবং সর্বোপরি তার স্নেহ প্রেম প্রীতি তাকে তার হৃতসর্বস্ব ফিরিয়ে দিয়েছে সন্দেহ নেই, তবু তার এই পাওয়ার মধ্যে রচিত হয়েছে একটা ব্যবধান—যে ব্যবধান কালের ব্যবধান। তার চিরতৃষিত যৌবন প্রৌঢ়ত্বের সীমায় এসে যে তৃপ্তি ও সান্ত্বনা পেয়েছে তা আত্মপ্রবঞ্চনার নামান্তরমাত্র। তাই উপন্যাসটি অন্তিমে মিলনান্ত হয়ে উঠলেও এর মধ্যকার করুণ সুরটি কাহিনীটিকে আরও রমণীয় করে তুলেছে।

'একা'[৪০] গল্প সংগ্রহটিতে দশটি গল্প স্থান পেয়েছে, প্রথম গল্পটির নামে সংকলনটির নামকরণ হয়েছে 'একা'। প্রতিটি গল্পের মধ্যে এমন কোন নির্দিষ্ট সুর নেই যার ফলে গল্পগুলির মধ্যে কোন একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী বা সংহতি দেখতে পাওয়া যায়, তবে শেষ তিনটি গল্পকে রূপকধর্মী বলা চলে। মোটামুটি প্রতিটি গল্পই ভিন্নস্বাদের এবং সমসাময়িক কালের রচনা।[৪১]

'একা' বড় গল্পটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের প্রথম বার্ষিক পত্রিকা

হয়ে ও তাকে অনুরোধ করেই শিশিরের অসুস্থতার সময় মিনতিকে ফিরিয়ে এনে নিজের দুর্ব্যবহারের প্রায়শ্চিত্ত করেছে। দিলীপ এই সমগ্র উপন্যাসটির চাবিকাঠি। মিনতি ও শিশিরের বিচ্ছেদ ও পুনর্মিলন এদুটি ঘটনা তারই কারণে সম্ভব হয়েছে।

মিনতি 'তৃপ্তি' উপন্যাসের নায়িকা। সে সপত্নীপুত্রের উপর তার মাতৃস্নেহ উজাড় করে দেওয়ার সংকল্প করেছে অথচ এই সপত্নীপুত্রের কারণেই স্বামী তাকে অবহেলা করেছে, পরিত্যাগ করেছে তার সান্নিধ্য, এমনকি তার বঞ্চিত জীবনের শেষ গর্বের বস্তু তার সতীত্বকেও ঘৃণ্য সন্দেহে কলঙ্কিত করেছে। যদিও সে তার অসীম ধৈর্য্য বজায় রেখে তার সম্মানকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে স্বামীর প্রতি একনিষ্ঠ ভালবাসায় এবং পুত্রের প্রতি স্নেহমমতায়।

মিনতি শিক্ষিতা হলেও আর পাঁচজন সাধারণ মেয়ের মতই তারও—'বিবাহিত জীবনের একটা প্রবল আকর্ষণ ছিল। সে অনেক সময় মনে মনে স্বামী-পুত্র-কন্যা পরিবৃত সংসারের কল্পনা করিয়া আনন্দলাভ করিত' [দ্বিঃ সং, পৃঃ ২৩] কিন্তু বহু পাত্র পক্ষই তাকে পাত্রী হিসাবে উপযুক্ত মনে না করায় সে ভেবেছিল যে তার বিবাহ হবে না। মিনতি তার দিদি ও ভগ্নিপতির মুখে বিদ্যুৎ ও শিশিরের অনেক গল্পই শুনেছিল এবং এসব শুনে তার বার বার মনে হয়েছে যে বিদ্যুতের মতো সে কখনোই স্বামীভাগ্যে সৌভাগ্যবতী হতে পারবে না, চিরদিনই তার একটা নিরর্থক ব্যর্থজীবন অতিবাহিত করতে হবে। অথচ তার বিশ্বাস ছিল—'যদি শিশিরের মত ধনবান সুচরিত্র প্রেমময় স্বামীর ঘরণী হইবার সৌভাগ্য তার হইত তবে সে কি না করিতে পারিত?' [দ্বিঃ সং, পৃঃ ৩১] অর্থাৎ শিশিরের মত স্বামী ও সংসারের প্রতি তার একটা প্রচণ্ড রকমের আকাঙ্ক্ষা ছিল, তাই শিশির যখন উপযাচক হয়ে মিনতিকে বিয়ে করার প্রস্তাব জানিয়ে চিঠি দিয়েছে তখন সেই চিঠির মধ্যে মিনতি দেখতে পেয়েছে—'শিশিরের পীড়িত কুসুম কোমল চিত্তখানি। হায় রে! মিনতি যাকে রাত্রিদিন বসিয়া ধ্যান করিয়াছে, দুর্লভ বস্তুবোধে সে যাকে ভাল করিয়া কামনা করিতেও সাহস পায় নাই—সে মিনতির জন্য ভিখারী হইয়া দাঁড়াইয়াছে ও প্রত্যাখ্যানের ভয়ে ব্যাকুল।' [দ্বিঃ সং, পৃঃ ৪১] মিনতির রোমান্টিক কবিসুলভ মন, শিশির যে বৃদ্ধপ্রায় সপুত্র বিপত্নীক এই রূঢ় বাস্তবকে স্বীকার করেনি। সে শিশিরকে দুর্লভ পাত্র হিসাবেই গ্রহণ করেছে এবং সেই সঙ্গে ভেবেছে যে তার হৃদয়ভরা স্নেহ দিয়ে সে সপত্নীপুত্র দিলীপকে আপন করে নেবে।

মিনতির বিয়ের পর দিলীপ নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ায় মিনতি মাতার মতই পুত্রের নানা অমঙ্গলের কথা ভেবে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছে এবং মনে মনে বলেছে—'অবোধ ছেলে না জেনেই আমার স্নেহের এত অপমান করে গেলি। একবার ফিরে দেখ বাপ, আমি তোর শত্রু নই।' [দ্বিঃ সং, পৃঃ-৯২] কিন্তু শিশিরও মিনতিকে ভুল বুঝেছে। দিলীপের জন্য যে মিনতিরও প্রাণ কাঁদতে পারে এ বিশ্বাস সে করেনি এবং মিনতিকে পিত্রালয়ে ফিরে যাওয়ার জন্য চিঠি দিয়েছে। শিশিরের চিঠি ও ব্যবহারে মর্মাহত মিনতি সংকল্প

করেছে যে দিলীপ ফিরে এলেই সে শিশিরের সংসার ত্যাগ করবে। সে দিলীপ ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করেছে, লোকজন পাঠিয়ে তার অন্বেষণ করেছে এবং খবরের কাগজেও এই মর্মে বিজ্ঞাপন দিয়েছে। কিন্তু দিলীপের কোন সংবাদই সে পায়নি এবং শেষে দিলীপ ভ্রমে সাধু তোতারামকে গৃহে স্থান দিয়ে শিশিরকে দিলীপের ফিরে আসার সংবাদ জানিয়ে চলে আসতে লিখেছে।

শিশির ও দিলীপ ফিরে এসে যে ব্যবহার করেছে তার জন্য মিনতি স্তম্ভিত হলেও ধৈর্য্যচ্যুত হয়নি বা তার দৃঢ়তা হারায়নি। শিশিরের মিথ্যা অভিযোগকে সে স্পষ্টভাবে অস্বীকার করেছে এবং তার প্রমাণ দেওয়ার প্রশ্নে বলেছে—'আমার কথায় যদি তোমার বিশ্বাস না হয়, আমি প্রমাণ দিয়ে তোমাকে বিশ্বাস করাতে যাব, নিজের ধর্ম নিয়ে তোমার সঙ্গে তর্ক করবো এত ছোটলোক আমি নই। তোমার বিশ্বাস নিয়ে তুমি থাক —আমার ধর্ম আমি দেখবো।' [দ্বিঃ সং, পৃঃ-২৩১] শেষ পর্যন্ত মিনতির কাছে শিশির পরাজয় স্বীকার করেছে পক্ষাঘাতে পঙ্গু শিশিরের তখন একমাত্র হাহাকার, সেই মিনতির সারা জীবনটাকে নষ্ট করে দিয়েছে। আর মিনতি তার একনিষ্ঠ ভালবাসার প্রমাণ দিয়েছে শিশিরকে সান্ত্বনার বাণীতে অভিষিক্ত করে।

এই উপন্যাসের পরিণতি ঘটেছে একটা আশাপ্রদ মিলনের মধ্যে সত্য কিন্তু মিনতির জীবনের দুঃখ লাঞ্ছনা পরিপূর্ণভাবে প্রশমিত হতে পারেনি। কাহিনীর শেষ অংশে সে তৃপ্তির অন্বেষণ করেছে মাত্র। শিক্ষিত উচ্চবিত্তের পরিবারেও নারীর মূল্য, সম্মান ও স্বাতন্ত্র্য সমাজব্যবস্থা অনুসারে যে কতটা অপ্রয়োজনীয়—এই উপন্যাসে লেখক মিনতির জীবন বর্ণনার মধ্য দিয়ে তা স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। বাংলাদেশের মেয়ে মিনতি তার আদর অনাদর সবকিছুই তাই যেন অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে মেনে নিয়েছে।

মিনতি বিবাহের পরই স্বামীর ভালবাসায় বঞ্চিত হয়েছে। যে সপত্নী পুত্রকে তার বুভুক্ষু নারী হৃদয় একান্ত করে পেতে চেয়েছিল, সেও তাকে সম্পূর্ণভাবে নিরাশ করেছে। কিন্তু তার ধৈর্য, নিরলস চেষ্টা ও একাগ্রতা এবং সর্বোপরি তার স্নেহ প্রেম প্রীতি তাকে তার হৃতসর্বস্ব ফিরিয়ে দিয়েছে সন্দেহ নেই, তবু তার এই পাওয়ার মধ্যে রচিত হয়েছে একটা ব্যবধান—যে ব্যবধান কালের ব্যবধান। তার চিরতৃষিত যৌবন প্রৌঢ়ত্বের সীমায় এসে যে তৃপ্তি ও সান্ত্বনা পেয়েছে তা আত্মপ্রবঞ্চনার নামান্তরমাত্র। তাই উপন্যাসটি অন্তিমে মিলনান্ত হয়ে উঠলেও এর মধ্যকার করুণ সুরটি কাহিনীটিকে আরও রমণীয় করে তুলেছে।

'একা'[৪০] গল্প সংগ্রহটিতে দশটি গল্প স্থান পেয়েছে, প্রথম গল্পটির নামে সংকলনটির নামকরণ হয়েছে 'একা'। প্রতিটি গল্পের মধ্যে এমন কোন নির্দিষ্ট সুর নেই যার ফলে গল্পগুলির মধ্যে কোন একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী বা সংহতি দেখতে পাওয়া যায়, তবে শেষ তিনটি গল্পকে রূপকধর্মী বলা চলে। মোটামুটি প্রতিটি গল্পই ভিন্নস্বাদের এবং সমসাময়িক কালের রচনা।[৪১]

'একা' বড় গল্পটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের প্রথম বার্ষিক পত্রিকা

'বাসন্তিকায়' প্রকাশিত হয়। এক বৃদ্ধের মনস্তত্ত্ব নিয়ে গল্পটি রচিত। আমাদের সমাজে যে কুটিল চিন্তাভাবনা ও সন্দেহ মানুষের জীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে কাহিনীর মূল-চরিত্রের পরিণতির মধ্যে এই বক্তব্যটিই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

'বহিষ্কার' গল্পটি 'মানসীও মর্মবাণীতে'[৪২] প্রথম প্রকাশলাভ করে। উড়িষ্যার করদরাজ্য ললিতগড় এ কাহিনীর পটভূমি। এখানকার এক কাগজের কলের অন্যতম ডিরেক্টর ভূপতি এই গল্পের মূল চরিত্র। জোনস ও বেকার এই কাগজের কলের অন্য দুই ডিরেকটর। এই তিনজন ও জোনসের পত্নী লেনাকে নিয়েই এই গল্পটি রচিত হয়েছে।

'বিশ্বনাথ'[৪৩] গল্পটি 'প্রাচী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই গল্পটির মধ্যে লেখকের অভিনবত্ব লক্ষ্য করা যায়। গল্পটির বক্তব্য হচ্ছে একটি বিধবা যুবতীর এক পাগলের প্রতি প্রীতি ও ভালবাসা ও গল্পের সমাধান পাগলের আত্মহত্যা, যে আত্মহত্যার উপায় যুবতীর প্রীতির দান একটি কাপড়। ট্র্যাজেডি এখানেই।

গল্পের বিধবা যুবতীর স্বামীও পাগল ছিল। স্বাভাবিক কারণেই তার পাগলের প্রতি একটা দুঃখবোধ ও সহানুভূতির উদ্রেক হয়েছিল। কিন্তু এই প্রীতি ও সহানুভূতি স্থায়ী হতে পারে না, তাই গভীর রাত্রির সুপ্ত নির্জনতায় পাগল যখন তার হারিয়ে যাওয়া স্মৃতি ফিরে পেয়ে বিধবা সরমাকে তার নিজের কথা শোনাবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল তখন সরমা পালাতে গিয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়েছিল—আবরণহীন সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারেনি। আর জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর পাগল বেছে নিয়েছে আত্মহত্যার পথ।

'ভিখারিণী' গল্পটিতে লেখকের যে সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে তা পাঠকদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়।

কাহিনীর ভিখারিণী চিরদিন দুঃখকষ্ট স্বীকার করেও স্বামীর প্রতি একনিষ্ঠ ভালবাসা ও সন্তানদের প্রতি স্নেহমমতা বজায় রেখে নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে। সে বুদ্ধিহীন জড়পিণ্ড স্বামীকে নিয়ে দারিদ্র্যের চরমে পৌঁছেও দেহ যৌবনকে পসরা করেনি, নিজের সতীত্ব ও সম্ভ্রমকে রক্ষা করেছে এবং অর্থের তাগিদে বিবেককে বিসর্জন দেয়নি।

এই গল্পের পটভূমি ঢাকা সহর সংলগ্ন কাজির বাগ গ্রাম। নরেশচন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিয়ে এই কাজির বাগ গ্রামের উন্নতি করার চেষ্টা করেছিলেন। তাই মনে হয় এই কাহিনীর রচনাকাল ১৯২২-১৯২৪'এর মধ্যে এবং এই গল্পে লেখকের কিছুটা বাস্তব অভিজ্ঞতা বর্ণিত হয়েছে।

'বিষে বিষক্ষয়' নরেশচন্দ্রের একটি কৌতুক কাহিনী। সংসারে ঝি চাকরের সমস্যা এক অতি পরিচিত সমস্যা। এই সমস্যার মুসকিল আসান কি ভাবে হল কাহিনীতে সেই মজার ঘটনা উল্লেখ করে লেখক আমাদের বিষে বিষক্ষয় এই নিদান দিয়েছেন।

লাজুক প্রকৃতির সুশীলবাবু কিছুতেই অকর্মণ্য সৌখিন রাঁধুনী ঠাকুরকে তাড়াতে

পারছিল না। শেষ পর্যন্ত যে দজ্জাল ঝি'র হাত থেকে সুশীলবাবু পরিত্রাণ পেতে চেয়েছিল তার কৃপায়ই এই ঠাকুরকে বিদায় করতে সমর্থ হয়েছে।

'পিপাসার বারি' একটি কৌতুক গল্প। শুধুমাত্র এক অপূর্ব নারী কণ্ঠস্বর শুনে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত জমিদার বিপিন তার কল্পনার চোখে যে রূপবতী যুবতীর প্রেমে উন্মাদ হয়ে উঠেছিল বস্তুতঃ সেই কণ্ঠস্বর এক মুসলমান বৃদ্ধার।

'সাহিত্যে প্রগতি' গল্পটিও কৌতুক কাহিনী। 'বাসন্তী' পত্রিকায় গল্পটি প্রথম প্রকাশ লাভ করে।[৪৪] আমাদের সমাজে প্রচলিত সমস্যাগুলির মধ্যে বিবাহ সমস্যা অন্যতম। মধ্যবিত্ত বা নিম্নবৃত্ত মানুষের কন্যার বিবাহের জন্য যে ছলনা ও চাতুরীর আশ্রয় নিতে হয়, এই দৃষ্টান্ত তিনি তাঁর বহুরচনায় ব্যবহার করেছেন। আলোচ্য গল্পটিও এই বিষয়বস্তু নিয়েই রচিত।

নারী সমালোচক অনামীর প্রেমে পড়ে লেখক সাহিত্যিক যাকে বিয়ে করল সে আসলে পূর্ববঙ্গের গ্রামে প্রতিপালিত বুঁচি।

'পুরাণকথা', 'নষ্টনিধি' ও 'সাগরিক ও নাগরিক' এই তিনটি গল্পই রূপক গল্পের মধ্যে সমাজ ও দেশবাসীকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে।

'সতী' উপন্যাসটি 'বিচিত্রা'য় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ভূমিকাংশে লেখক 'সতী' সম্পর্কে লিখেছেন 'সতী একটি সাধ্বী চরিত্রবতী নারীর কাহিনী' এবং লেখক এই উপন্যাসে সতীত্বের নতুন কোন ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেননি, প্রচলিত নীতিতেই সতী সুরমার চরিত্র বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এই উপন্যাসেও নরেশচন্দ্রের কিছু কিছু নির্ভীক বক্তব্য ও ঘটনাবিন্যাস স্থান পেয়েছে যদিও কাহিনীর মূল বক্তব্যে তিনি প্রচলিত সমাজবিধি ও সতীত্বের আদর্শের প্রতি আনুগত্যই দেখিয়েছেন এবং শরৎ সাহিত্যের কনভেনশনটিকেই অনুসরণ করেছেন।

'রূপের অভিশাপ' উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় 'কালি কলম' পত্রিকায়।[৪৫] উপন্যাসটির রচনাকালে লেখক ঢাকায় ছিলেন। অধ্যাপক সুকুমার সেন লিখেছেন...'ঢাকায় থাকিবার সময় নরেশচন্দ্র কয়েকটি কাহিনী লিখিয়াছিলেন পূর্ববঙ্গের নিম্নশ্রেণীর লোকের জীবনচিত্র দিয়া। নরেশচন্দ্রের এই ধরণের লেখার মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য রূপের অভিশাপ।'[৪৬] পূর্ববঙ্গে দরিদ্র মুসলমান পাটচাষী শ্রেণী এই উপন্যাসের নায়ক নায়িকা। এই শ্রেণীর সামাজিক ও আর্থিক সমস্যা লেখক এই উপন্যাসে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন। ইতিপূর্বে তিনি এই পাট চাষ সমস্যা নিয়ে প্রবন্ধও রচনা করেছেন।[৪৭] বস্তুতঃ 'রূপের অভিশাপ' উপন্যাসটির পটভূমি পাটচাষ অধ্যুষিত অঞ্চল হলেও কাহিনী মূলত পরী নামে একটি গ্রাম্য মেয়ের জীবন আলেখ্য।

পরী এক অসামান্য রূপবতী দরিদ্র চাষী পরিবারের মেয়ে। পাটের দর বেঁধে দেওয়ার ফাটকা খেলায় তার পিতা নিঃস্বপ্রায়। পাড়ার গরীব ছেলে লতিফকে সে ভালবাসে কিন্তু দরিদ্র পিতাকে ঋণমুক্ত করার জন্য তাকে বিয়ে করতে হয় ধনী চাষী কুৎসিত দর্শন বৃদ্ধ কাশিম বেপারীকে। আর বিবাগী লতিফ দূরের এক গ্রামে এক সম্পন্ন

চাষীর বাড়ীতে কাজ নিয়ে চলে যায়। সেই চাষীর বউ নেকজান লতিফকে ভালবেসে ফেলে। এই ভালবাসা অসম হলেও লতিফ নেকজানের এই ভালবাসাকে অস্বীকার করতে পারে নি, কিন্তু সেই সঙ্গে পরীকেও সে ভুলতে পারেনি। এদিকে কাশিম বেপারীর অবর্তমানে পাটচাষী ফকির চেয়েছে বিধবা পরীকে নিকা করতে আর লম্পট আলি বেপারী পরীকে চেয়েছে তার কামনা চরিতার্থ করতে কিন্তু পরী বিধবা হওয়ার পরও মনে প্রাণে যাকে চেয়েছে সেই লতিফের সঙ্গে তার মিলন সম্ভবপর হয়নি, বরঞ্চ পাকচক্রে লতিফের ভালবাসাকে পরী এক মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে অস্বীকার করেছে। তাই লতিফের সঙ্গে পরীর শেষ সাক্ষাৎ মনোরম হয়ে ওঠেনি। লতিফের ভালবাসা তখন ঘৃণায় পরিবর্তিত হয়েছে আর পরী লতিফকে তার অন্তরের কথা জানাতে গিয়ে লাভ করেছে দুর্বিসহ লাঞ্ছনা। তার প্রিয়তম লতিফের কাছ থেকে অপমাণিত হয়ে পরীর বেঁচে থাকাকে অর্থহীন মনে হয়েছে তাই সে তার সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণার অবসান ঘটিয়েছে আত্মহত্যা করে।

'রূপের অভিশাপ' রূপসী পরীর অভিশপ্ত জীবনকাহিনী। সে বুদ্ধিহীন, ব্যক্তিত্বহীন সাধারণ এক গ্রাম্য নারী। জীবনকে সে কখনোই বাস্তববুদ্ধি দিয়ে বিচার করেনি, সবকিছুকেই বিনা প্রতিবাদে মেনে নিয়েছে। তার উপর যে অভিশাপ নেমে এসেছে তা হচ্ছে সমাজের অনিবার্য ফসল। বাস্তব সচেতন লেখক পরীর জীবনের মধ্য দিয়ে দেখাতে চেষ্টা করেছেন দারিদ্র্যের জন্মভূমিতে প্রোথিত সমাজব্যবস্থার রূপটিকে। তিনি এই উপন্যাসে একদিকে দেখিয়েছেন অর্থলিপ্সু মানুষের চক্রান্ত ও প্রতারণা আর অন্যদিকে দেখিয়েছেন ভঙ্গুর অর্থনীতির চাপে মানুষের নিদারুণ দারিদ্র্য যেখানে প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা অর্থহীন। সেখানে বিনা দোষে স্ত্রী হচ্ছে বিতাড়িত, মাতা পিতা অনায়াসে অর্থের লালসায় কন্যাকে বিকিয়ে দিচ্ছে। সরল পরী সমাজের এই স্বার্থপর দৃষ্টিভঙ্গীকে আয়ত্ত করতে পারেনি। ধনী হলেও বৃদ্ধ, কুদর্শন স্বামীকে সে ভালবাসতে পারেনি দরিদ্র লতিফের ভালবাসার কথাই সে একান্ত করে অন্তরের গভীরে অনুভব করেছে। এমন কি কাশিম বেপারীর মৃত্যুর পরও পরী—'তার ঘরের উঁচু জানালার ভিতর দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া ছিল। তার দৃষ্টি পড়িয়াছিল দূরের ঐ সুপারী গাছের ডগার উপর।…ঐ গাছের পাতা কটার সঙ্গে তার অনেক স্মৃতি জড়িত। তার বিবাহের পর অনেকদিন সে হতাশ নয়নে ঐ গাছের দিকে চাহিয়াছে—সে জানিত ও গাছ লতিফের পৈতৃক ভিটায়। কাশিমকে বিবাহ করিয়া তার মনে লতিফের জন্য যে একটা ব্যগ্র আশাশূন্য কামনা জাগিয়া উঠিয়াছিল ও গাছের কটা পাতার দিকে চাহিয়া চাহিয়া অনেকদিন তার মনে তার আগুন ধুক ধুক করিয়া জ্বলিয়াছে।' [পৃঃ ১৬৪] লতিফের প্রতি তার প্রেম সে কখনোই অস্বীকার করেনি শুধুমাত্র সংসারের ও সমাজের জটিল আবর্তে ক্ষণবিস্মৃত হয়েছে এবং এই ক্ষণবিস্মৃতির মোহে প্রিয়তম আপনজনকে পরোক্ষ আঘাত হেনেছে, সেটাই তার জীবনের করুণ পরিণতির অন্যতম কারণ।

লতিফ গ্রাম্য সরল মানুষ। সে যেমন তীব্রভাবে পরীকে ভালবেসেছে তেমনি পরীর ব্যবহারে সে পরীকে তীব্র ভাবে ঘৃণা করেছে। তার উত্তেজিত অস্থির স্বভাবের জন্য কোন ঘটনাকেই বিচার বা বিশ্লেষণ করে দেখেনি এবং এই একই কারণে নেকজানের ভালবাসায়ও তৃপ্তি পায়নি। সম্পন্ন বিধবা নেকজান লতিফের যৌবনদীপ্ত দেহের প্রতিই আকৃষ্ট হয়নি, কালক্রমে সে সত্যিই লতিফকে ভালবেসেছে। তাই লতিফের মনের দিকে চেয়ে লতিফের বাঞ্ছিতা নারী পরীর সঙ্গে তার মিলন অনুমোদন করেছে বিনিময়ে চেয়েছে শুধু লতিফকে স্বহস্তে যত্ন ও সেবা করতে এবং এজন্যই মধ্যবয়স্ক মুখরা নেকজান পাঠকের সহানুভূতি লাভ করেছে। এক্ষেত্রে অবশ্যই নেকজান ভাবপ্রবণ, কিন্তু দয়িতের জন্য এই ভাবপ্রবণতা অবাস্তব বা অর্থহীন অবাস্তব নয়। এই নিঃসন্তান গ্রাম্য নারীর কাছে লতিফই সব কিছু, তাই লতিফ যখন তার কাছে বিদায় নিয়ে নিজের গ্রামে যাত্রা করে তখন তার সকরুণ অনুরোধ পাঠকমাত্রের হৃদয়ই স্পর্শ করে। সে সময় নেকজান লতিফকে বলেছে—'সোনা বেশী দেরী কইরো না, শীগ্‌গির আইসো। আমি তোমার পথ চাইয়া বইসা থাকুম, দেরী করলে বাচুম না—তোমার দিল যদি চায় সোনা তুমি আবার নিকা কইরো। কিন্তু আমারে ছাইর‍্যা যাইও না সোনা, তোমার নয়া বউ নিয়্যা তুমি আইস। আমি তোমার বউরে যতন করুম, তোমার সেবা করুম। আমার মাথা খাও শীগ্‌গির ফির‍্যা আইসো।' [পৃঃ ১৫৩]

'দুষ্টগ্রহ' উপন্যাসটি ১৩৩৪ সালে ধারাবাহিকভাবে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়।[৪৮] এই কাহিনীতেও নরেশচন্দ্র একটি বিদ্রোহিনী নারী চরিত্র এঁকেছেন। এই কাহিনীর নায়িকা চরিত্রহীন স্বামীর প্রভুত্ব মেনে নিতে পারেনি, স্বেচ্ছায় এক বিধর্মী যুবকের সাথে ঘর বেঁধেছে।

করুণা ও লতা একই স্কুল হোস্টেলে থেকে পড়াশুনা করে। দুজনেই অনাথ এবং দরিদ্র। স্কুল কর্তৃপক্ষের দাক্ষিণ্যই তাদের একমাত্র সম্বল, ফলে দুজনার মধ্যে নিবিড় বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। হঠাৎ লতার বিয়ে হয় অবিনাশ নামে এক ধনী রূপবান যুবকের সাথে কিন্তু বিয়ের কিছুদিন পরেই একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়ে লতা মারা যায়। অবিনাশ করুণাকে লতার এই নবজাত শিশুটির ভার নিতে অনুরোধ করে এবং তাকে বিয়ের প্রস্তাব করে। অপরের দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভরশীল আত্মীয়-স্বজনহীন করুণা এই প্রস্তাব ফিরিয়ে দিতে পারেনি। করুণার সাথে অবিনাশের বিয়ে হয়ে যায় এবং করুণা তখন জানতে পারে যে অবিনাশ তার নেশা ও লাম্পট্যের চাহিদা মেটাতে সর্বস্বান্ত। করুণার প্রতি তার কোন কর্তব্য নেই ভালবাসা নেই, এমন কি নেলীর উপরও তার এক ফোঁটা স্নেহ নেই, সে শুধু চায় করুণার স্কুলের সামান্য রোজগারের টাকা। বাধ্য হয়ে করুণা লতার মেয়ে নেলীকে নিয়ে অন্যত্র আত্মগোপন করে থাকে যাতে অবিনাশ তার কোন খোঁজ না পায়।

এসময় একদিন রমেন নামে এক পরোপকারী ভদ্রলোক খাদ্যাভাবে দুর্বল নেলীকে অজ্ঞান অবস্থায় রাস্তায় পায় এবং নেলীকে বাড়ী পৌঁছে দেয়। নেলীর খোঁজখবর

নিতে গিয়ে রমেন করুণার সংসারের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে। করুণা কিন্তু যথাসম্ভব রমেনকে এড়িয়ে চলতো কেননা তার ধারণা রমেন নিঃস্বার্থভাবে তাদের সাহায্য করতে আসেনি। ক্রমশঃ করুণার ধারণা হয় যে রমেন তাকে ভালবাসে তাই রমেনের ইচ্ছার উপর নিজেদের সম্পূর্ণ ছেড়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে সে রমেনকে একটা চিঠি দেওয়ার সংকল্প করে দুটি চিঠির খসড়া করে কিন্তু চিঠির খসড়া তার পছন্দ না হওয়ায় সেই খসড়া দুটি সে ফেলে দেয়। ইতিমধ্যে অবিনাশ করুণার ঠিকানা সংগ্রহ করে সেখানে আসে এবং চিঠির খসড়া দুটিও তার হাতে আসে। অবিনাশ করুণার কাছে অসুস্থ নেলীকে দাবী করে এবং বিকল্পে করুণার কাছে টাকা চায়। এই নিয়ে করুণা ও অবিনাশের মধ্যে প্রচণ্ড বচসা শুরু হয় আর ঠিক এসময় রমেন এসে অবিনাশকে ঘাড় ধরে রাস্তায় বের করে দেয়। অবিনাশ আদালতে এই মর্মে রমেনের বিরুদ্ধে, নালিশ করে যে সে তার স্ত্রী করুণার সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত এবং তার প্রমাণ স্বরূপ সে আদালতে করুণার সেই চিঠি দুটির খসড়া পেশ করে। অবশ্য অবিনাশের আসল উদ্দেশ্য ছিল রমেনের কাছ থেকে টাকা আদায় করা। শেষ পর্য্যন্ত অবশ্য রমেন অর্থদণ্ড দিয়েই এই মামলা থেকে পরিত্রাণ পায়। এদিকে করুণা মন্মথ নামে এক বিপত্নীক ধনী প্রৌঢ়ের বাড়ী কাজ করতে গিয়ে তার মাথা উঁচু করে চলার শেষ সম্বলটুকু হারিয়ে আসে। এরপর যদিও এক উকিল বাড়ীতে ছেলেমেয়ে পড়ানোর একটি কাজ সে জুটিয়ে নিয়েছে কিন্তু মন্মথ সম্পর্কিত ঘটনার জন্য সে সবসময় শঙ্কা অনুভব করেছে। তারপর সত্যিই যখন একদিন মন্মথ সে বাড়ীতে এসে উপস্থিত হয় তখন করুণা নিরূপায় হয়ে নেলীকে সে বাড়ীর আশ্রয়ে রেখে তার পুরোনো বাসায় ফিরে আসে। এই পুরোনো বাসায় করুণার পরিচয় হয় নতুন ভাড়াটে ফকীরের সাথে। ফকীর একা মানুষ, পুতুল ও খেলনা বিক্রি করে পেট চালায়। করুণাও ফকিরের সাথে পুতুল ও খেলনা তৈরী করে নানাভাবে জীবন কাটাতে থাকে।

এসময় আবার অবিনাশ এসে দেখা দেয় এবং করুণাকে জানায় যে এখন সে এ বাড়ীতেই করুণার সঙ্গে বসবাস করবে। কিন্তু অবিনাশের সঙ্গে করুণার প্রেমহীন সম্মানহীন জীবনযাপন করা সম্ভব হয়নি। সে ফকীরের সঙ্গে অন্যত্র গিয়ে বাসা বেঁধেছে। ক্রমশঃ তারা উপলব্ধি, করেছে যে তারা দুজনই দুজনকে ভালবাসে। দুজনের এই ভালবাসা আইন ও সমাজ স্বীকৃতি না দিলেও তারা স্বামী স্ত্রীর মতই জীবন কাটাতে থাকে।

নরেশচন্দ্রের এই উপন্যাসটির শ্রমজীবী নিম্নবিত্ত নায়িকার জীবন অতিমাত্রায় ঘটনাবহুল। লেখক এখানে নায়িকাকে কোন একটি নির্দিষ্ট আদর্শে বিশ্বাসী করে দেখাননি। জীবিকা নির্বাহের জন্য বিভিন্ন পরিবেশে তাকে চলতে হয়েছে, যদিও সব ক্ষেত্রেই সে পরিবেশকে মেনে নিতে পারে নি। লেখক করুণার মিথ্যা সংস্কারগুলিকে বিভিন্ন ঘটনা ও ভাবনার সাহায্যে একে একে দূর করে দিতে সমর্থ হয়েছেন আর নায়িকা করুণা তার বাস্তব বিবেচনায় আইনসিদ্ধ ও সমাজ স্বীকৃত বিবাহকে অর্থহীন

প্রতিপন্ন করে এই পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেও পুরুষের সহকর্মীর মর্যাদা নিয়ে ধর্ম নিরপেক্ষ হয়ে বাঁচতে পেরেছে।

'তাবিজ'[৪৯] নরেশচন্দ্রের অন্যতম গল্প সংকলন। এই গ্রন্থে সংকলিত অনেকগুলি গল্পই ইতিপূর্বে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থে মোট বারটি গল্প স্থান পেয়েছে। যথা : তাবিজ, কান্নার চেয়ে করুণ, অসতী, পাঁকের ফুল, চিত্রকর, শিবকালীর সংসার, ঝগড়া কিসের, পুরোহিত, সাধনা ও সিদ্ধি, পুত্রাৎ শিষ্যাৎ পরাজয়, রামচরণ ও বিচার।

'তাবিজ' গল্পটি ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রচিত। এই গল্পের নায়িকা ফতেমা সাধারণ এক উচ্চাকাংক্ষী যুবতী হলেও গল্পের অন্যান্য প্রধান চরিত্রগুলি ইতিহাসিক। তাই এই গল্পটিকে ইতিহাস আশ্রিত গল্প বলা যেতে পারে তবে গল্পের মূল কাহিনীটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক। যার বিষয়বস্তু নারীর অসম্ভব উচ্চাভিলাষ ও তার পরিণতি।

নরেশচন্দ্রের সমগ্র কথাসাহিত্যে এধরণের গল্প আর নেই। গল্পটির মধ্যে আরবি-ফার্সী শব্দের ব্যবহার গল্পটিতে মুসলমানী পরিবেশ সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছে। গল্পটি সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিকতা বর্জিত এবং দৃঢ়বদ্ধ, কোথাও কোন শিথিলতা নেই এবং সেজন্য প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠকের কৌতূহল ধরে রাখতে পারে। রচনাশৈলী বা স্টাইলের দিকেও গল্পটির অভিনবত্ব অস্বীকার করা যায় না। নরেশচন্দ্রের পরবর্তী 'শুভা' উপন্যাসের মতই এখানেও নায়িকা ফতেমার মনে একটি ইচ্ছার উদয় হয়েছে ও বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্য দিয়ে সে সেই ইচ্ছার পরিতৃপ্তি খুঁজেছে। যদিও শেষ পর্যন্ত এই ইচ্ছার জন্যই তাকে মৃত্যুদণ্ড পেতে হয়েছে।

'কান্নার চেয়ে করুণ' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'মানসী ও মর্মবাণী' পত্রিকায়।[৫০] গল্পটির নায়ক নায়িকা উভয়ই খেটে খাওয়া মানুষ। এই শ্রমজীবী মানুষের হাসির মধ্যেও যে কান্না লুকোনো থাকে লেখক এই সত্যটিকে এখানে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন।

'অসতী' গল্পটি নরেশচন্দ্রের একটি দুঃসাহসিক রচনা। এই গল্পে লেখক শুধুমাত্র নারীর দৈহিক শুচিতাকেই অস্বীকার করেননি সেই সঙ্গে তিনি সংস্কার আচ্ছন্ন লোভী পুরুষদের চরিত্রগত লোভী স্বার্থপর রূপটিকে উদ্ঘাটিত করার চেষ্টা করেছেন। এই গল্পে তিনি একটি ষোল বছরের অন্তঃসত্ত্বা কুমারীকে বিয়ে দিয়ে তাকে সমাজের হাতে নির্যাতন দিতে কার্পণ্য করেননি কিন্তু নিজ আদর্শে স্থির থেকে শেষ পর্যন্ত তাকে দেবীর আসনে প্রতিষ্ঠা করেছেন। যেহেতু লেখকের বিশ্বাস যে ষোল বছরের একটি কুমারীর ভুল তার সারা জীবনকে বিপর্যস্ত করতে পারে না।

অতুল বি. এল পাশ অতি সাধারণ পরিবারের ছেলে। ধনীকন্যা অপূর্ব লাবণ্যবতী লতিকাকে বিয়ে করার পরই সে জানতে পারে যে লতিকা অন্তঃসত্ত্বা। বাধ্য হয়ে লতিকাকে বাপের বাড়ী ফিরে যেতে হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিশ হাজার টাকার চেক নিয়ে অতুল লতিকাকে গ্রহণ করে এবং নাগপুরে গিয়ে ওকালতি আরম্ভ করে। এই

বিয়ের ছ মাস পরে লতিকার একটি ছেলে হয় কিন্তু অতুলের অযত্ন ও তাচ্ছিল্যে মাত্র দেড় বছর বয়সেই শিশুটি প্রাণ হারায়। লতিকার মাতৃহৃদয়ে এই আঘাত আরো বেশী করে চেপে বসে যখন তার পরবর্তী সন্তানদের জন্য অতুলের যত্ন ও সমারোহের সীমা থাকে না। ইতিমধ্যে তাদের মধ্যে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপিত হলেও তাদের মধ্যে সামান্যতম মনের মিল ছিল না যেহেতু অতুল লতিকার সেই অতীত ভুলের কথা সব সময়ই স্মরণ করিয়ে দিয়ে কটুবাক্য শোনাত। এভাবে দশ বছর কেটে যায়। এদিকে লতিকা অতুলের বাক্যবাণে ক্রমশঃ অধৈর্য হয়ে ওঠে আর অতুল তাকে একথা কখনো ভুলতে দেয় না যে সে তাকে গৃহে স্থান দিয়ে মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছে। এই অপমানে লতিকা শুধুমাত্র দুঃখ পায় কিন্তু যখন একদিন লতিকাকে পাদ্রী সাহেবের সঙ্গে করমর্দন করাতে লাথি মেরে তাকে তাড়িয়ে দেওয়ার ভয় দেখায় তখন সত্যিই লতিকা গৃহত্যাগ করে এবং প্লেগ রোগের সেবিকা হিসাবে জনসাধারণের কাছে সম্মান ও প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সমর্থ হয়।

এই গল্পটির মধ্যে লেখকের আদর্শটি অস্পষ্টতার আড়ালে থাকেনি। তাই ষোল বছরের কুমারীর ভুল তার সারা জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলতে পারেনি—যেহেতু দৈহিক শুচিতাই জীবনের সবচাইতে বড় কিছু নয় এবং মাতৃত্বকে কখনোই হীন চোখে দেখা যায় না। যথার্থ গুণের স্বীকৃতি দিতে সমাজ বাধ্য।

স্বামী অতুল এখানে প্রচলিত সমাজ ও সংকীর্ণ নীতির প্রতিভূ, যে সমাজে যে কোনো পাপ ও অপরাধ শুধুমাত্র অর্থের বিনিময়ে ক্ষমা পায়।

অথচ এই সমাজ ক্ষমাশীল শুধুমাত্র এই অজুহাতেই নিজেদের শ্রেষ্ঠ ক্ষমাশীল দয়াশীল ও আদর্শবাদী ভাবতে কসুর করে না। অতুল লতিকাকে, তার অপরাধকে ক্ষমা করে, ভালবাসতে পারেনি। সে শুধু গ্রহণ করেছে লতিকার পিতার টাকা, লতিকার দেহ ও সর্বপ্রকার সেবা কিন্তু যথার্থ স্ত্রীর মর্যাদা দিতে পারেনি। লতিকা সম্পর্কে অতুলের বিবেচনা 'কয়লার কালো দাগের মত দুশ্চরিত্রা এ নারীর স্বভাব দোষ কিছুতেই যায় না।' [পৃঃ ৪৭] তাই লতিকাকে সে বলেছে 'ভেবে দেখ কি হত তোমার দশা, যদি আমি তোমাকে গ্রহণ না করতাম। একদিন হয়ত সোনাগাছি ছেড়ে খোলার চালায় আশ্রয় নিতে হত।' [পৃঃ ৪৮]

লেখক লতিকাকে সেবাধর্মের মধ্যে নিয়োজিত করে তাকে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠা করেছেন যদিও প্রচলিত নীতিবাদীদের বিস্ময় অতুলের সংলাপে তুলে ধরেছেন 'ভেবে দেখ কি আশ্চর্য কোথায় তুমি কলকাতার রাস্তায় গান বেচবে, না একেবারে লাট দরবারে নেমন্তন্ন।' [পৃঃ ৫১]

'পাঁকের ফুল'[৫১] গল্পে নরেশচন্দ্র তুলে ধরেছেন নারীর সহজাত সেবাধর্ম এবং ভালবাসা, যে ভালবাসা অঙ্কুরিত হয় শ্রদ্ধার মধ্য দিয়ে। এই গল্পটি 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

সন্ধ্যা ষোল বছরের হাফ গেরস্থ ঘরের মেয়ে। পুরুষ মাতান হাবভাব ও রূপের গর্বে

সে ধরাকে সরা জ্ঞান করে। পাড়ার ছেলে ললিত ও যোগেনের সঙ্গে তার ছেলেবেলা থেকেই মাখামাখি—সেই অন্তরঙ্গতা যৌবনে এসেও স্তিমিত হয়নি। এই ললিতদের বাড়ীতে থেকে পড়াশুনা করে সতীশ নামে একটি গরীব ছেলে। ছেলেটি পড়াশুনায় সাধারণ হলেও পরিশ্রমী ও কর্তব্যপরায়ণ। ললিত ও যোগেনের চেষ্টা ছিল তাকেও দলে টেনে সন্ধ্যার বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া কিন্তু কিছুতেই যখন তাকে সে পথে নিয়ে যাওয়া হল না তখন তারা সতীশের ঘরে সন্ধ্যাকে এক রাতে নিয়ে আসে। সন্ধ্যার কোন ছলনাই কিন্তু সতীশকে আকৃষ্ট করতে পারে না উপরন্তু সে সন্ধ্যাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দেয়।

তারপর দু বছর কেটে গেছে। সতীশ মোক্তারী পাশ করে সেখানেই প্র্যাকটিস করছে। আর সন্ধ্যার সঙ্গে যোগেনদের সম্পর্ক মোটামুটি বজায় আছে। সন্ধ্যা কিন্তু সতীশের সব খবরই তাদের কাছে জানতে পারত।

একদিন কথা প্রসঙ্গে যোগেনের কাছে সন্ধ্যা জানতে পারে যে সতীশ ও তার স্ত্রী দুজনেই ভয়ানক অসুস্থ এবং বাড়ীতে এমন কেউ নেই যে তাদের একগ্লাস জল এগিয়ে দেয়। সন্ধ্যা এ খবরে স্থির থাকতে পারে না সে সতীশের বাড়ী গিয়ে তাদের সেবা শুশ্রূষায় ভাল করে তোলে। সতীশ সন্ধ্যাকে তার বাড়ীতেই থাকার অনুরোধ করে কিন্তু সে অনুরোধ শান্ত ভাবে এড়িয়ে সন্ধ্যা ফিরে যায় তার নিজের ঘরে। সন্ধ্যা যাওয়ার আগে সতীশকে বলেছে—'আমার উপর রাগ কর না সতীশবাবু।···তোমার কাছে মন্দ দিকটা আমার দেখাতে পারবো না।·· জানোয়ার নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি তো দিনরাত করছি। একটা মানুষ থাক্ আমার।'

'চিত্রকর' [৫২] গল্পটি শিল্পীর অতৃপ্তির উপর রচিত। এই গল্পটিও 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। নরেশচন্দ্রের বিচিত্র-ধর্ম গল্পের মধ্যে, এই গল্পটি অন্যতম। মানবমনের যে বিচিত্র গতিপ্রকৃতি নরেশচন্দ্রের বহু রচনার মূল বিষয়-বস্তু, এই গল্পটির মধ্যেও সে কথাই আভাসিত হয়েছে। মানুষ যা চায় তা পায়না, নিজের সীমাবদ্ধতাকে সে সবসময়ই কল্পনায় অস্বীকার করে এবং সেজন্যই জীবনে দেখা দেয় চরম বিপর্যয়।

চিত্রকরের চারদিকে দৈন্যের অন্ধকার কিন্তু সে তার মানস চোখে দেখতো এক অজানা স্বর্গের অসীম শোভা। স্ত্রী অলকা ও তিনটি শিশুর ছবি এঁকে সে তার ঘর ভরিয়ে ফেলেছিল, কিন্তু কিছুতেই যখন সে তার স্বপ্নের শারদলক্ষ্মীকে তার হাতের তুলিতে রূপ দিতে পারলো না, তখন সে উন্মত্ত হয়ে আগুন জ্বালিয়ে দেয় তার ঘরে। সেই আগুনে পুড়ে মরে তার তিনটি শিশু ও অলকা। চিত্রকর নিষ্ফল আক্রোশে পাগল হয়ে বেঁচে থাকে, আর তার সেই আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তি হয়না কোন দিন।

'শিবকালীর সংসার' [৫৩] গল্পে নরেশচন্দ্র এক সংসার আসক্ত পুরুষের ট্র্যাজিডি বর্ণনা করেছেন। সংসারী শিবকালী চেয়েছিল সংসারকে ছিমছাম ফিটফাট রাখতে কিন্তু তার তিনটি স্ত্রীই তার সেই ক্ষুদ্র আশাটিকে মেটাতে পারেনি। প্রসঙ্গত এখানে লেখক তিনটি ভিন্নধর্মী নারী চরিত্রের বর্ণনা করছেন যারা শিবকালীকে মোটেই শান্তি দিতে পারে নি।

'ঝগড়া কিসের' নরেশচন্দ্রের একটি রূপক গল্প। এই গল্পে তিনি রূপকথার কাঠামোর মধ্য দিয়ে আমাদের দলাদলিকে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছেন। রচনাটিকে ব্যঙ্গ ও উদ্দেশ্যমূলক রচনা বলা চলে। তিনি এখানে বলতে চেয়েছেন যে দলাদলি করাই যাদের উদ্দেশ্য তাদের কোন কারণ বা অজুহাতের দরকার করে না। তথাকথিত দলের উদ্দেশ্য হল নিজেদের কিছু না করে অন্য দল যাতে কিছু না করতে পারে তারই চেষ্টা করা।

'পুরোহিত' [৫৪] গল্পটি 'কালিকলমে' প্রকাশিত হয়েছিল। এই গল্পটিও রূপক গল্প। সাহিত্যের মন্দিরে নবীন ও প্রবীণদের প্রবেশ নিয়ে তর্ক বিতর্ক একদা প্রকট হয়ে উঠেছিল সেই সময়কার সেই তিক্তরসটি এই গল্পের মধ্যে প্রকাশিত হয়ে পড়েছে।

'সাধনা ও সিদ্ধি' গল্পটি একটি সরস রচনা। গল্পের নায়ক নীলরতন সুরার সেবা করত। বাড়ীতে এই সেবার বিঘ্ন হওয়ায় সে কলকাতায় এক বাসা বাড়ী ভাড়া করে উঠে এল। পাড়াটি খুব বনেদী নয়।

এই নতুন বাসায় এসে সে এক সপ্তাহ ধরে অবিরাম মদ্য পান করার পর হঠাৎ তার নজর পড়ে একটি মেয়ের উপর। মেয়েটির কটাক্ষে নীলরতন সম্পূর্ণ কাবু হয়ে পড়ল। তারপর বহু চেষ্টার পর একদিন সে মেয়েটিকে বাইরে বের করে নিয়ে এসে সারারাত ট্যাক্সিতে ঘুরে বেড়ায় এবং অবশেষে বাড়ী নিয়ে আসে। সকালে ঘুম ভাঙ্গার পর নীলরতন আবিষ্কার করে যে মেয়েটির সাথে সাথে তার টাকা পয়সা ইত্যাদিও উধাও হয়েছে। মেয়েটি কুলবধূ নয়। নীলরতন মদ্যের সাধনায় এই সিদ্ধি লাভ করার পর আর মদ্য স্পর্শ করেনি।

'পুত্রাৎ শিষ্যাৎ পরাজয়'[৫৫] গল্পটি ইতিহাসভিত্তিক হলেও দুটি চরিত্রই—পক্ষধর মিশ্র ও রঘুনাথ, তার বর্ণনায় বাস্তব ও মানবিক হয়ে উঠেছে। লেখক এখানে দেখিয়েছেন যে নবদ্বীপ ও মিথিলার এই দুটি পণ্ডিত প্রবরই মূলত মানুষ এবং সেজন্য এদের মধ্যে ঈর্ষা ও পরশ্রীকাতরতা প্রকাশ পেয়েছে। নবদ্বীপের যুবক রঘুনাথের কাছে মিথিলার প্রবীণ পক্ষধর মিশ্রের পরাজয় কাহিনী এই গল্পের বিষয়বস্তু।

'রামচরণ' [৫৬] গল্পটি 'মানসী ও মর্মবাণীতে' প্রকাশিত হয়েছিল। গল্পটির মধ্যে একটি গৃহভৃত্যের সুমতি ও কুমতি উভয়ই দেখানো হয়েছে। গল্পে দেখানো হয়েছে যে অসাধু গৃহভৃত্য রামচরণের বুদ্ধিতেই অনাথ বিধবা গৃহকর্ত্রীর সম্পত্তির কিছু অংশ রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে।

'বিচার' গল্পটি [৫৭] তাবিজ গল্পগ্রন্থের শেষ গল্প। গল্পটি উত্তম পুরুষের জবানীতে লেখা। গল্পের নায়ক ফাঁসির আসামী। কিন্তু জেলার সাহেবের ধারণা এ আসামী আসলে মহাপুরুষ। অতএব জেলার সাহেবের উৎসাহে অনেক আবেদন নিবেদন ভরা দরখাস্ত করা হয়েছে কিন্তু সবই বিফল হয়েছে।

আসামীকে যে খুনের জন্য ফাঁসি যেতে হবে সেই খুন কিন্তু সে করেনি।

ভগবানের বিচারে তার যে ফাঁসি হবে সে তার অতীত কুতকর্মের ফল। সে সত্যি একটি খুন করেছিল আর যার জন্য অন্যের ফাঁসি হয়েছিল।

আসামী জেলর সাহেবকে সে কাহিনীই শুনিয়েছে। বস্তুতঃ সে কাহিনীই 'বিচার' গল্পের মূল কাহিনী। একটি গল্পের মধ্যে অন্য একটি গল্প বলার রীতি নরেশচন্দ্রের গল্প রচনার একটি অন্যতম কৌশল। এ গল্পেও সেই একই রীতি ব্যবহার করা হয়েছে।

আসামী ভদ্র ঘরের ছেলে। লেখাপড়া বেশী দূর শেখেনি, দরকার ছিল না বলে আর ছেলেবেলা থেকেই তার মতিগতি ছিল স্ফূর্তির দিকে। নিয়মিত শরীর চর্চা করে সে পালোয়ান হয়ে উঠেছিল এবং শক্তির পরীক্ষা দিতে কখনো অগ্র-পশ্চাৎ চিন্তা করেনি তাই বন্ধু যখন সুন্দরী গয়লা বউকে চুরি করার জন্য তার মত শক্তিমান পুরুষের সাহায্য চাইল তখন সে দুঃসাহসিক কাজে না গিয়ে পারেনি এবং গয়লাদের ঘরে আগুন দিয়ে সেই আগুনে গয়লাকে ছুঁড়ে দিতেও কসুর করেনি। সেই বন্ধু ধরা পড়ে এবং গয়লাকে পুড়িয়ে মারার জন্য তার ফাঁসি হয়।

এই ঘটনার দশ বছর পর আসামীর আলাপ হয় নিস্তারিণীর সঙ্গে। নিস্তারিণী ভদ্রঘরের ব্রাহ্মণ কুলবধূ। তার সঙ্গে চললো আসামীর দুর্বার প্রেম। নিস্তারিণীর স্বামী কলকাতায় চাকরী করত তাই আসামী তার প্রেম সম্ভাষণে বাধা পেত না। কিন্তু একদিন নিস্তারিণীর স্বামী সঞ্জীব অসময়ে ফিরে এসে নিস্তারিণীকে জানায় যে সে সব জানে এবং সে আজই নিস্তারিণীর গোপন প্রেমিককে খুন করবে। সেদিন সত্যিই আসামীর নিস্তারিণীর বাড়ী যাওয়ার কথা ছিল। নিস্তারিণী আসামীকে সাবধান করতে পারে নি কিন্তু স্বামী সঞ্জীব যখন খেতে বসেছে তখন সে মানসচোখে দেখতে পেল যে সঞ্জীব আসামীকে খুন করছে। এ অবস্থায় সে তার বাহ্যজ্ঞান হারাল এবং স্বামীর মাথায় কালীপূজার বলির খাড়া নিয়ে এসে এক কোপ বসিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ। এরপর আসামী যখন নিস্তারিণীর বাড়ী এল তখন সে আসামীকে সব ঘটনা স্বীকার করে তাকে উদ্ধার করতে বলে। কিন্তু আসামী তখন অন্য মানুষ, তার তখন মনে হয়েছে—

'ভেবেছিলাম, তাকে [নিস্তারিণীকে] ছেড়ে আমি কোন দিন থাকতে পারবো না। কিন্তু সেই মুহূর্তে আমার অন্তরের সব ভালবাসা এক নিমিষে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। আমার চোখে সে কদর্য্য ক্রিমির মত অস্পৃশ্য ঘৃণাস্পদ হয়ে দাঁড়াল।

জীবনে বিবেকের সঙ্গে আমার এই প্রথম পরিচয়। কোনও দিন পাপ পুণ্যের বিচার করিনি। পাপ বলে কোনও দিন কিছু জানিনি। আজ প্রথম মনের ভিতর একটা নতুন আলো জ্বলে উঠলো, আমি দেখতে পেলাম পাপের বীভৎস মূর্তি।'

নিস্তারিণীর সাশ্রু অনুনয় বিনয়েও কিন্তু আসামীর মন ভিজলো না। তখন হঠাৎ নিস্তারিণী ছুটে গিয়ে ঘরে শিকল তুলে দিল, তারপর খুন! খুন! করে চিৎকার করে উঠলো। আসামী দ্রুত পালাতে গিয়ে রক্তাক্ত সঞ্জীবের মৃতদেহের উপর হুমড়ি খেয়ে

পড়ল। সে অবস্থায় রক্তাক্ত আসামীর মনে হল বিধাতার আদেশ……'পালালে চলবে না এ বোঝা বইতে হবে।' আসামীই নিস্তারিণীকে পাপের পথ দেখিয়েছিল, প্রাণ দিয়ে তার জীবন রক্ষা করতে চেয়েছিল কিন্তু ভগবানের সূক্ষ্ম বিচারে পাগল হয়ে নিস্তারিণী আগুনে পুড়ে মরেছে। আসামীর চেষ্টায় নিস্তারিণী বাঁচেনি।

এই গল্পটির মধ্যে যে আদর্শ অনুসৃত হয়েছে তা হচ্ছে 'পাপের বেতন মৃত্যু'। মানুষ যতই পাপ করুক না কেন তার শুভবোধ আসতে বাধ্য তাই নিস্তারিণীর স্বামীর মৃত্যুতে আসামীর বোধোদয় হয়েছে, আর নিস্তারিণী তার কৃতকর্মের জ্বালায় পাগল হয়ে আগুনে পুড়ে মরেছে। এই গল্পে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে নিস্তারিণীর স্বামীকে খুন করার মানসিক ব্যাখ্যা। বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে সে তার কল্পনাকে প্রত্যক্ষের মত দেখেছিল, তাই সে যাকে খাঁড়ার আঘাত করেছে তার তখনকার কল্পনায় সে তার স্বামী নয়—কেউ নয়, সে শুধু তার গোপন প্রেমিকের হত্যাকারী। কিন্তু যে মুহূর্তে তার বাস্তব জ্ঞান ফিরে এসেছে তখনই সে তার পাপ অন্যের উপর চাপিয়ে দিতে দ্বিধা করেনি। এইখানে গল্পটির নতুনত্ব।

'লক্ষ্মীছাড়া'[৫৮] উপন্যাসটি যখন প্রকাশিত হয় তখন লেখক বাংলা সাহিত্য জগতে প্রতিষ্ঠিত ঔপন্যাসিক। এই উপন্যাসে তিনি কোনও সামাজিক সমস্যাজড়িত প্রশ্নের উত্থাপন করেন নি, বিশেষ কোন আদর্শ বা তত্ত্বের উপরও উপন্যাসটি রচিত হয় নি, অতি সাধারণভাবে তিনি এক জমিদার পরিবারের পিতাপুত্রের পারিবারিক দ্বন্দ্ব তুলে ধরেছেন—যদিও পিতাপুত্রের এই দ্বন্দ্বও আদর্শেরই দ্বন্দ্ব।

বংশানুক্রম, পিতাপুত্রের দ্বন্দ্ব ও যুগপরিবর্তনের সাথে সাথে বংশধরদের মানসিকতার পরিবর্তন ইত্যাদি নরেশচন্দ্রের একটি প্রিয় বিষয়। তিনি তার একাধিক উপন্যাসে এই বিষয়বস্তুগুলির অবতারণা করেছেন, আলোচ্য উপন্যাসটিও লেখকের সেই ভাবনারই অন্যতম প্রকাশ।

'সর্বহারা'[৫৯] উপন্যাসে একটি উচ্চাভিলাষী যুবকের সর্বস্ব হারানোর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এই উপন্যাসটির দুটি সংস্করণ হয়। প্রথম সংস্করণের প্রায় ত্রিশ বছর পর দ্বিতীয় সংস্করণটি প্রকাশিত হয়।

'লুপ্তশিখা'[৬০] উপন্যাসটি গ্রাম্য বালক বটুককে নিয়ে শুরু হলেও আসলে এই কাহিনীটি একটি রূপোপজীবিনী নারীর মানসিক পরিবর্তনের ইতিবৃত্ত। সমাজের পতিতা-নারীদের নিয়ে ইতিপূর্বেও নরেশচন্দ্র উপন্যাস রচনা করেছেন কিন্তু এই উপন্যাসটির নায়িকাকে বাস্তবধর্মী লেখক সুস্থ সমাজ জীবনে ফিরিয়ে আনেন নি, কোন বিকল্প ভদ্রবৃত্তি গ্রহণ করিয়ে তার জীবনের কোন শুভ পরিণতিও এনে দেন নি, বরঞ্চ অমার্জনীয় অপরাধের কারণে তাকে কারাগারের অন্ধকারে নিক্ষেপ করতে দ্বিধা করেন নি।

বটুক সুন্দর চেহারার গ্রাম্য বালক। বাড়ীর অবস্থা ভাল না হওয়ায় সে লেখাপড়া করার জন্য তার মামার সঙ্গে কলকাতায় আসে। মামার বাসা ছিল কলকাতার এক

ঘিঞ্জি গলিতে। কলকাতায় এসে কিন্তু পড়াশুনা করার বদলে তাকে করতে হত তার মামা ও মামার আশ্রিতা বিমলার সেবা। ফলে পড়াশুনা করার মোটেই সুযোগ সে পেত না।

একদিন রাস্তার কলে জল আনতে গিয়ে বটুকের আলাপ হয় সুন্দরী একটি মেয়ের সঙ্গে। মেয়েটি রূপোপজীবিনী এবং বয়সে বটুকের চেয়ে বড়। তবু বটুকের সঙ্গে তার একটা প্রীতির সম্পর্ক খুব সহজেই গড়ে ওঠে। মেয়েটির নাম মালতী। বটুকের ছিল অস্বাভাবিক রকমের পড়ার ঝোঁক, এখন সে প্রতিদিন দুপুরে মালতীর ঘরে বসে অনেকক্ষণ পড়তে পারতো। সন্ধ্যার পর বটুকের কিন্তু মালতীর ঘরে যাওয়া বারণ ছিল যেহেতু রূপোপজীবিনী মালতীকে প্রতি সন্ধ্যায় অতিথিদের আপ্যায়ন করতে হত। প্রতিদিন দুপুরটা বটুকের ভালই কাটতো কারণ সে সময় মামা তার কাজে বেরুত আর বিমলা থাকতো দিবানিদ্রায় ব্যস্ত। কিন্তু বেশীদিন এভাবে চললো না। একদিন মালতী এক ধনী যুবকের সাথে উঠে গেল মনোহর পুকুরের এক বাড়ীতে আর বটুকের উপর মামা ও বিমলার শুরু হল আরও বেশী অত্যাচার। বটুক মামার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে একদিন পালিয়ে চলে এল মালতীরই আশ্রয়ে। মালতীর বাড়ীতে তার নতুন পরিচয় হল রান্নার বামুন ঠাকুর। কেননা মালতীর এই বাবুটি অব্রাহ্মণের হাতে খাদ্য গ্রহণ করেন না, যদিও মালতীর হাতে মদ্যপান করতে তার কোন আপত্তি ছিল না। মালতীর দয়ায় আবার বটুকের পড়াশুনা চলতে লাগলো। কিন্তু এই সুখ সুবিধাও বটুকের ভাগ্যে বেশীদিন সইল না। ইতিমধ্যে বটুক প্রবেশিকা পরীক্ষার দরজায় এসে উপস্থিত হয়েছে। মালতীর এই নতুন বাবুটি, বটুকের প্রতি মালতীর স্নেহ প্রীতির আতিশয্য দেখে মালতীকে সন্দেহ করতে শুরু করে। এবার আবার বটুককে অন্যত্র চলে যেতে হয়। বটুক কিন্তু এসব প্রতিকূল অবস্থায়ও পড়া ছাড়েনি। এবং মালতীর সাথে দেখা করারও চেষ্টা করে নি।

কিন্তু প্রথম দিনের পরীক্ষার পরই মালতী এসে তার সাথে রাস্তায় দেখা করে এবং তাকে পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করে একগুচ্ছ টাকা তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। বটুক এর পর মালতীকে অনেক দিন আর খুঁজে পায় নি।

ইতিমধ্যে বহুদিন কেটে গিয়েছে। কিশোর বটুকের স্বপ্ন সার্থক হয়েছে। একদিন যাকে এক যুবতীর স্নেহ ও করুণায় পড়াশুনা করতে হত, সে এখন একজন প্রতিষ্ঠাবান উকিল।

এসময় এক দিন আশ্চর্যজনকভাবে বটুকের সাথে মালতীর আবার দেখা হয়। মালতী তখন আদালতের কাঠগড়ায় অভিযুক্ত আসামী। সেই অতীতের স্নেহশীলা মালতী হারিয়ে গেছে, এ মালতী যেন জীবন্ত পাপের প্রতিমূর্তি। মালতীই বটুককে তার নিজের পরিচয় দেয়—'কিগো, আমাকে চিনতে পারছ না? আমি যে তোমার মনোহরপুকুরের মালতী।' বটুক ঘৃণায় মুখ তুলতে পারে না, এ জঘন্য অমার্জনীয়

অপরাধে অপরাধিনী মালতীকে সে বাঁচাতে চায় না। বাঁচাতে পারে না নিষ্ঠুর কারাদণ্ডের হাত থেকে। বটুকের আদর্শ ও নিষ্ঠাই জয়ী হয়।

এই উপন্যাসের নায়িকা এক শুভবুদ্ধিসম্পন্ন স্নেহশীলা পতিতা নারী। প্রথম জীবনে তার মধ্যে যে নারীসুলভ প্রীতি ও স্নেহ ছিল, নষ্ট পরিবেশে ক্রমশঃ সেই সদ্‌গুণগুলি বিলীন হয়ে গেছে। সে রূপান্তরিত হয়েছে এক অপরাধিনী উচ্ছৃংখল পতিতায়। এই রূপান্তর দেখিয়ে লেখক এখানে বাস্তবতা রক্ষা করেছেন সত্য কিন্তু তাঁর নারী দরদী মন মালতীকে পাঠকদের সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত করে নি।

'ব্রতী'[৬১] উপন্যাসটি সমসাময়িক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর উপর রচিত হলেও এই কাহিনীতেও লেখক মানুষের প্রেমপ্রীতি, সন্দেহ ও ঈর্ষা নিয়েও আলোচনা করেছেন। এই উপন্যাসের নায়ক বিপ্লবের মাধ্যমে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য 'ব্রতী' দলে যোগ দিয়েছে কিন্তু তার পরিণতি ঘটেছে নৈরাশ্যের মধ্যে।

দরিদ্র মৈনাক শশীবাবুর ছেলেমেয়ে দেবব্রত ও মেনকাকে বাড়ীতে পড়ায় ও মেসে থেকে রাজনীতির চর্চা করে। একদিন শশীবাবুর সঙ্গে তার মতবিরোধ হওয়ায় সে এই পড়ানোর চাকরী ছেড়ে দেয় ও সম্পূর্ণ উপার্জনহীন হয়ে পড়ে। এসময় তার আলাপ হয় অনিলের সাথে। অনিলও বিপ্লবে বিশ্বাসী, এই আদর্শগত মিলের কারণে অনিলদের 'ব্রতী' দলে মৈনাক যোগ দেয়। তখন তার একটিই উদ্দেশ্য ভারতবর্ষকে স্বাধীন করা।

একদিন মৈনাক জানতে পারে যে তাদের দলনেতা অনিল বিয়ে করছে। পাত্রী মৈনাকের ছাত্রী মেনকা। এই বিয়ে সে কিছুতেই মেনে নিতে পারেনা যেহেতু সে বিশ্বাস করত যে বিপ্লবীকে হতে হবে যথার্থ ব্রহ্মচারী। এই ঘটনা নিয়েই মৈনাকের সঙ্গে অনিলের একটা সূক্ষ্ম বিরোধ দেখা দেয়। অনিলের বিয়েতে মৈনাকের সঙ্গে যখন মেনকার দেখা হয় তখন মেনকার রূপে মৈনাক মোহিত না হয়ে পারে নি। অনিল মেনকাকে নিয়ে মৈনাককে অস্পষ্টভাবে সন্দেহ করে। যেহেতু মেনকাকে মৈনাক একদা পড়াত। তার বিয়েতে অনিল তাই মেনকা ও মৈনাককে নিভৃতে আলাপ করার সুযোগ করে দেয় এবং আড়াল থেকে তাদের কথাবার্তা শুনে ধারণা করে যে মৈনাক মেনকার প্রেমাস্পদ।

এসময় 'ব্রতী' দলের কাজকর্ম পুলিশের নজরে পড়ে এবং এই ঘটনা নিয়ে 'ব্রতী' দলের সভ্যরা একে অপরকে সন্দেহ করে। মৈনাকও এই ব্যাপারে অনিলকে সন্দেহ করে কিন্তু 'ব্রতী' দলের সভ্যরা স্থির জানতে পারে যে তাদের দলের অজিত আসলে পুলিশের গুপ্তচর। এই গুপ্তচর অজিতকে হত্যা করার দায়িত্ব মৈনাক ও অন্য দুজনকে দেওয়া হয়। মৈনাক কিন্তু এই সিদ্ধান্ত পুরোপুরি মানতে পারে নি তাই শেষ মুহূর্তে সে অজিতকে হত্যা করতে বাধা দেয়। মৈনাক পুলিশের হাতে ধরা পড়ে এবং বিচারে তার ছ বছর জেল হয়ে যায়।

প্রায় সাত বছর পর জেল থেকে ফিরে এলে মৈনাকের দেখা হয় তার পুরোনো বন্ধু

নরেন ডাক্তারের সাথে। নরেন তখন পল্লীগ্রাম উন্নতির চেষ্টা করছে। নরেনের অনুরোধে মৈনাক নরেনদের ডেয়ারীর ভার নেয় এবং গ্রামে বাস করতে থাকে। ইতিমধ্যে তার মনের বেশ কিছুটা পরিবর্তন দেখা দিয়েছে এবং গ্রামের উন্নতির জন্য সে নতুনভাবে চিন্তা করছে।

এসময় একদিন এক জার্মান পরিদর্শক তাদের ডেয়ারী দেখতে এসে কথা প্রসঙ্গে জানায় যে অনিলকে সে চিনতো এবং অনিল মারা গিয়েছে। এরপর মৈনাক আরও জানতে পারে যে অনিল তার উইলে মেনকাকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত করেছে। এই দুঃসংবাদে মৈনাক স্থির থাকতে পারে না। উইলের ব্যাপারে মেনকাকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য সে মেনকার সঙ্গে দেখা করতে যায়।

ইতিপূর্বেই অনিল দেশ ছাড়ার সময় মেনকাকে একটি চিঠি লিখে যায়। সে চিঠিতে মেনকার চরিত্রের প্রতি তার সন্দেহ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল এবং মৈনাক সম্পর্কে তার বিদ্বেষও গোপন ছিল না। এইসব কারণে মেনকা তার এই দুর্ভাগ্যের জন্য মনে মনে মৈনাককে দায়ী করেছিল, তবু তার মনে আশা ছিল যে অনিল ফিরে এসে তাকে গ্রহণ করবে। অনিলের মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার পর মেনকার এই শেষ আশাটুকুও নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। তাই মৈনাক তাকে সহানুভূতি জানাতে এলে, মেনকা তাকে অপমান করে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয়।

এই অপমানের পর মৈনাকের, পৃথিবীতে মুখ দেখানোর মত আর কিছুই থাকে না। জীবনের শুরুতে যে স্বপ্ন সে গড়ে তুলেছিল তা আজ বিনষ্ট, তবু যে আত্মসম্মান নিয়ে সে এতদিন মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে ছিল, মেনকার অপমানে আজ সে সম্মানও ধূলায় লুণ্ঠিত। তাই মৈনাকের মনে হয় আর বেঁচে থাকাটা তার পক্ষে সম্পূর্ণ অর্থহীন।

মৈনাক 'ব্রতী' উপন্যাসের নায়ক। সে দরিদ্র কিন্তু প্রচণ্ড আত্মভিমানী। তার স্বপ্ন ভারতের সাম্যবাদ ও স্বাধীনতা। শশীবাবুর সঙ্গে আলোচনায় সে নিজেই বলেছে যে সে সোস্তালিষ্ট এবং তার আদর্শ সম্পর্কে বলেছে '—আমার বিশ্বাস জমিদারী জিনিসটাই অন্যায়। চাষাদের পরিশ্রমের উপার্জনের উপর ভাগ বসাবার অধিকার জমিদারের নেই। তারা কোনও কাজ করে না পরের অর্জন শোষণ করে।' [পৃঃ ১১] সে সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী তাই তার বক্তব্য—'নন-কো-অপারেশন কাপুরুষের পরামর্শ।' [পৃঃ ১৬] তার ধারণা যদি স্বাধীন হতে হয় তবে লড়াই ছাড়া আর পথ নেই। অনিলকে সে মন্ত্রগুরু স্বীকার করেছে কিন্তু নিজে সম্পূর্ণ গুরুবাদী হতে পারে নি এবং ধীরে ধীরে অনিল সম্পর্কে তার মতের পরিবর্তন হয়েছে। মৈনাক জানতে পেরেছে যে অনিলের সত্যনিষ্ঠা বা ব্রহ্মচর্যের উপর বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই। শ্রমিক ধর্মঘটের উপরও মৈনাকের যতখানি আশাভরসা, অনিলের তা নেই, বরঞ্চ অনিলের ধারণা কুলি মজুরদের ক্ষেপিয়ে তুললে—'সমস্ত সমাজের বিরুদ্ধে তারা রুখে দাঁড়াবে। সমাজ শাসনের অধিকার চেয়ে বসবে।' [পৃঃ ১০৬] সেটা অনিল চায় না। অনিলের এই কথায় মৈনাক প্রশ্ন করেছে—'ভারতবর্ষকে স্বাধীন করতে চাও তুমি, ভারতের পনের আনা লোককে

পদানত দাস করে কি স্বাধীনতা দেবে তাদের?' [পৃঃ ১০৬] আসলে মৈনাকের স্বাধীনতার ধারণা থেকে অনিলের স্বাধীনতার ধারণা পৃথক। মৈনাক মার্ক্স, লেনিন প্রভৃতির যুক্তি দিয়ে অনিলের ধারণাকে সংশোধন করার চেষ্টা করেছে। প্রিভিলেজ ত্যাগ করার কথা বলেছে। কিন্তু অনিল তাকে পরাজিত করেছে তার ব্রাহ্মণত্বের 'প্রিভিলেজ' এর কথা দিয়ে। সাম্যবাদে বিশ্বাসী হলেও মৈনাক গোঁড়া ব্রাহ্মণ। ধর্মাচার থেকে রাজনীতিকে সে সব সময়ই আলাদা করে ভেবেছে। সে বলেছে—'ব্যক্তিগত ধর্মাচার জিনিসটা Politics-এর বাইরে।' [পৃঃ ১০৭]

নিজের গ্রামে মৈনাকের মনের আরও পরিবর্তন হয়েছে। গ্রামের দরিদ্র পীড়িত মানুষের রূপ দেখে তার মন ব্যথাতুর হয়ে উঠেছে। 'নিবার্য্য ব্যাধিতে মৃত্যু শয্যায় শায়িত তার মায়ের মূর্তিতে।' [পৃঃ ১৪১] সমগ্র গ্রামবাসী তার কাছে একাকার হয়ে গিয়েছে। সে গ্রামেই সে আবার শশী ডাক্তারের মত অক্লান্ত গ্রাম সেবকের দেখা পেয়েছে। যে শুধুমাত্র নিজের চেষ্টায় ও পরিশ্রমে গড়ে তুলেছে স্কুল, হাসপাতাল, লাইব্রেরী ও কৃষি উন্নয়ন সংস্থা। শশী ডাক্তারকে দেখে সে মোহিত হয়েছে, শশী ডাক্তারের দরিদ্র গ্রামবাসীদের জন্য প্রাণ কাঁদে সে তাদের উন্নতি দেখতে চায় আর অনিল, অনিল চায় দেশের স্বাধীনতা কিন্তু গরীবকে সে অশ্রদ্ধা করে। মৈনাক তাই ভেবেছে—'অনিলের চোখে শশী ডাক্তারের প্রয়োজন নেই আর শশীর চোখে অনিল একটি বাজে খরচ। শশী ডাক্তার ও অনিলের হাতে হাত লাগাইতে হইবে। সমস্ত দেশব্যাপী মঙ্গল চেষ্টার সমবায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে স্বাধীনতার চেষ্টা। নতুবা সকলই নিষ্ফল।' [পৃঃ ১২৬]

এতদিন মৈনাকের কাছে দেশ ছিল একটা কল্পনার জগৎ, কিন্তু গ্রামে এসে সে দেখতে পেয়েছে দেশের যথার্থ রূপ। সে দেখেছে দেশের মানুষের দারিদ্র্য ও দুর্দশা, দেখেছে রোগে, অশিক্ষায়, অনাহারে ক্লিষ্ট গ্রামবাসীদের। মৈনাক 'ব্রতী' দলে যোগ দিয়েছে তার কল্পনার দেশকে স্বাধীন করার জন্য, কিন্তু বর্তমানে সে সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তার বাস্তব দেশ— যে দেশের জন্য অন্ন, বস্ত্র, স্বাস্থ্য, শিক্ষা চাই। তাই মৈনাকের মনে নতুন প্রশ্ন জেগেছে—'স্বাধীনতা পাইলেই কি সব মিলিবে? 'ব্রতী' দল যে স্বাধীনতার জন্য চঞ্চল তার ভিতর শুধু অনধীনতা ছাড়া আর কিছুই নাই। দেশের লোকের ঋদ্ধি বা স্বাচ্ছন্দ্য তারা চায়না, তারা চায় বিশ্বসমাজে ভারতের শাসক সমাজের কৌলীন্য, স্বাধীন বলিয়া তাহাদের প্রতিপত্তি।' [পৃঃ ১৪১] মৈনাক এই স্বাধীনতায় সন্তুষ্ট নয়।

বিপ্লবের প্রাক্ মুহূর্তে 'ব্রতী' দলের সভায় মৈনাক তাই বলেছে—'দেশ প্রস্তুত হয়েছে তার মানে কি?—কয়েকজন লোক গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে খুব উত্তেজিত হয়েছে কিন্তু জনসাধারণ এখনও সম্পূর্ণ নির্বিকার।......আমাদের প্রথম কাজ গ্রামবাসীদের প্রস্তুত করা স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা লোকের মধ্যে জাগাবার জন্য একটা প্রকাণ্ড mass movement করা।' [পৃঃ ১৪৬] মৈনাকের এই বক্তব্য 'ব্রতী' দলের নেতারা মানে নি, তাদের

সংকল্প মুষ্টিমেয় বিপ্লবী নিয়েই তারা এগিয়ে যাবে। মৈনাক ভেবেছে 'ভারতের স্বাধীনতার প্রচেষ্টা যদি জনসাধারণের চেষ্টা না হয়, সমগ্র দেশবাসী জাগিয়া উঠিয়া যদি স্বাধীনতা লাভে প্রয়াসী নাহয়, তবে 'ব্রতীর' ব্রত সফল হইলেও ভারত স্বাধীনতা লাভ করিবে না। ইংরাজ অধিকারের স্থলে দেশী লোকের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবে, কিন্তু দেশের জনসাধারণ পড়িয়া থাকিবে তাদের চিরাভ্যস্ত অধীনতার অন্ধকারে।··· তারপর সমস্ত জাতকে প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করবার জন্য আবার একটা প্রকাণ্ড বিপ্লব করতে হবে।' [পৃঃ ১৪৭] সে 'ব্রতী' দল ত্যাগ করার সংকল্প করেছে কিন্তু ব্রতীদলের চরম দুর্দশার সময় .আদর্শবান ব্রতী মৈনাকের পক্ষে দল ছাড়ার সংকল্প ত্যাগ করা ছাড়া উপায় ছিল না। সে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে কিন্তু 'ব্রতী' দলের মঙ্গলের জন্য পুলিশের কাছে কোন কথাই প্রকাশ করে নি। কিন্তু সে যখনই বুঝতে পেরেছে যে 'ব্রতী' দলের নির্দেশে ভুল হচ্ছে তখনই সে তার বিরোধিতা করেছে। এর প্রমাণ মৈনাকের অজিতকে বাঁচিয়ে দেওয়া।

বিপ্লবী দলের নেতা অনিলের সঙ্গে মৈনাকের প্রথম বিরোধ দেখা দেয় অনিলের বিয়ের ব্যাপারে। মৈনাকের ধারণা ছিল যে বিপ্লবী মাত্রই হবে ব্রহ্মচারী কিন্তু অনিলের এ ধরণের কোন আদর্শ ছিল না। দ্বিতীয়তঃ অনিলের মনোনীতা পাত্রীটিকে সে একদা পড়াত এবং এই কুসুম কোমল নিষ্পাপ বালিকাটির জন্য মৈনাকের একটি স্বতন্ত্র ভালবাসা ছিল। অনিল যে তারই ছাত্রীকে বিয়ে করছে এ সংবাদ মৈনাক যখন পেল তখন তার ধারণা হয়েছে যে বিপদ জনক বিপ্লবী সংস্থার সঙ্গে জড়িত অনিলের একটি অসহায় বালিকাকে বিয়ে করার কোন অধিকার নেই। অনিলকে সে এই বিয়ে না করার জন্য অনুরোধ করেছে কিন্তু অনিল কথাটা অন্যভাবে নিয়েছে—সে মৈনাককে ভেবেছে মেনকার গোপন প্রণয়ী এবং রহস্যছলে মৈনাককে সেকথা বলেছেও। অনিলের এই সন্দেহের বীজাণু Incubation period' এর মত মৈনাকের মনে বেড়ে উঠেছে। তাই বিয়ের কনে বেশে মেনকাকে দেখে মৈনাক অভিভূত হয়েছে। সে সময়কার মৈনাকের অবস্থা সম্পর্কে লেখক—বর্ণনা করেছেন—'কঠোর ব্রহ্মচারী মৈনাক, দৃঢ়তার চিত্ত চরিত্রবলে তার কোনও দিন কোনও দুর্ব্বলতা স্পর্শ করে নাই কিন্তু মেনকার এই অপরূপ রূপরাশি তার চিত্তের সবগুলি প্রাকার যেন এক আঘাতে চুরমার করিয়া দিল।' [পৃঃ ৯২]

তারপর দীর্ঘসময় নানা কাজ কর্মে মৈনাক, মেনকা সম্পর্কে মনকে স্থির রাখতে পেরেছিল কিন্তু জেল থেকে ফিরে অনিলের মৃত্যু সংবাদ এবং সেই সঙ্গে উইলে মেনকার বঞ্চিত হওয়ার সংবাদ পেয়ে স্থির থাকতে পারে নি। মেনকাকে ভালবাসার দাবী নিয়েই সে তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে গিয়েছে—কিন্তু সেখান থেকে বিতাড়িত হয়েছে চরম অপমানিত হয়ে। পরহিতে আত্মসমর্পিত ব্রতী মৈনাকের জীবনের সেটাই চরম ট্র্যাজিডি। এবং বাস্তবতার দিকেও এই পরিণতিই সার্থক।

কাহিনীতে বিজলী ওরফে অনিলের আগমন আকস্মিক। প্রথম দিকে তার

চাল-চলন আচার ব্যবহার সবই অসংলগ্ন তবু উপন্যাসটিতে তার চরিত্রটি পরিপূর্ণতা পেয়েছে। অনিল কোন রোমান্টিক আদর্শে বিশ্বাসী নয় বরঞ্চ সে যুক্তিবাদী। তার ব্যক্তিত্ব, সাংগঠনিক ক্ষমতা, আকর্ষণ করার শক্তি, মনের ভাব গোপন রাখার পটুত্ব, যুক্তি তর্কের কৌশল এবং অতি সংযত ব্যবহার সহজেই মৈনাকের সাথে সাথে পাঠকদেরও আকর্ষণ করে। আপাতদৃষ্টিতে অনিলের মনকে খুব দৃঢ় মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তার মন দুর্বল। তাই স্ত্রী মেনকা সম্পর্কে তার মনে তীব্র সন্দেহ দেখা দিয়েছে। সে মেনকাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য নানাভাবে নিগ্রহ করেছে এমন কি তাকে সম্পত্তি থেকেও বঞ্চিত করেছে।

অনিল ভারতের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা করেছে শুধুমাত্র নেতৃত্বের লোভে। 'ব্রতী' দলের নেতৃত্বের ভার নিয়ে সে চেয়েছে সভ্যদের নিজের অধীনে রাখতে। সাধারণ মানুষের মুক্তির কথা সে কখনো ভাবেনি, তাই বিপ্লব ও স্বাধীনতার কথার অন্তরালে তার চিন্তা প্রকাশিত হয়েছে, শ্রমিক রাজ্য প্রসঙ্গে সে বলেছে 'সমাজ শাসন একটা যা তা কাজ নয়, সমাজের ভালমন্দ যে খুসী বুঝতে পারে না, শাসন যন্ত্র যে কেউ ইচ্ছা করলেই চালাতে পারে না। এজন্য একটা শিক্ষা চাই, Education চাই, culture চাই। সেটা যাদের নেই সেই Mob-কে এনে যদি সমাজের মাথার উপর বসিয়ে দাও তবে ফল হবে ঠিক তেমনি, Athens-এ যেমন হয়েছিল Cleon the Tanner' এর সময়। বেশীর ভাগ লোক শাসিত হওয়ার যোগ্য, শাসন করার যোগ্য নয়। তাদের থাকতে হবে পায়ের তলায়, মাথার উপর তাদের চড়ালে চলবে না।' [পৃঃ ১০৭] তার এইসব বক্তব্য হয়ত পুরোপুরি গ্রহণীয় নয় তবু তার চরিত্রের একটা স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সেও এই উপন্যাসে পরাজিত চরিত্র। তার পরিকল্পিত বিপ্লব প্রচেষ্টা সফল হয় নি, তার মনের সন্দেহের দাহ তার পারিবারিক জীবনকে শান্তিময় করতে পারে নি ও শেষ পর্যন্ত সে আত্মীয় স্বজনহীন বিদেশে মৃত্যুবরণ করেছে। আর সে উপন্যাসে 'ভিলেন' চরিত্র না হয়েও পাঠকদের সহানুভূতি হারিয়েছে।

মেনকা এই উপন্যাসের একমাত্র নারী চরিত্র যাকে নিয়ে ব্রতী দলের দুই প্রধান পুরুষের মধ্যে বিরোধিতা দেখা দিয়েছে অথচ এই ব্যাপারে সে ছিল সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত।

মেনকা তার মাস্টার মশাই মৈনাককে শ্রদ্ধা করত। এমনকি তার বিয়ের পরেও শিশুসুলভভাবে মৈনাককে সে যে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে সেকথা প্রকাশ করেছে। এই অসতর্ক কথাটি যে তার জীবনে একটা অভিশাপ ডেকে আনতে পারে সে ধারণা তার ছিল না। অনিল তাকে কোনদিন পিত্রালয়ে যেতে দেয়নি, প্রতি নিয়ত তাকে সন্দেহের চোখে দেখেছে এবং শেষ পর্যন্ত তাকে ত্যাগ করে দেশ ছেড়ে বিদেশে পাড়ি দিয়েছে। যাওয়ার সময় অনিল মৈনাক সম্পর্কে তার সন্দেহের কথা প্রকাশ করেছে তাই মেনকা তার এই দুর্বিসহ অদৃষ্টের জন্য মৈনাককে দায়ী করেছে, যদিও তখন তার মনে এই আশা ছিল যে অনিল তার ভুল বুঝে ফিরে এসে তাকে গ্রহণ করবে। অনিলের মৃত্যু

সংবাদ পাওয়ার পর, এতদিনের অপমান ও মিথ্যা সন্দেহের কথা আরও তীব্রভাবে তার মনে আঘাত হেনেছে তাই মৈনাককে সে চরম অপমান করতে কুণ্ঠিত হয়নি। সে সময় মৈনাককে দেখেই তার মনে হয়েছে—'তার স্বামী তাকে অবহেলা করিয়াছে, তার প্রাপ্য সম্পদে বঞ্চিত করিয়া ভিখারিণী করিয়া গিয়াছে তাই সে এতটা খেলো হইয়া গিয়াছে লোকের চক্ষে, যে পথের ভিখারী মৈনাক, যাকে তার পিতা চাকুরী দিয়া বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন সেও তাকে এতবড় অপমান করিতে সাহস করে। সে আসে সদ্যবিধবা মেনকাকে প্রেম নিবেদন করতে।' [পৃঃ ২১৯] চির আদরিণী মেনকার এই নিদারুণ ভাগ্য বিপর্যয়ে এই ভাবনা খুবই স্বাভাবিক।

'ব্রতী' উপন্যাসটিকে নরেশচন্দ্রের একমাত্র রাজনৈতিক উপন্যাস বলা চলে। এই উপন্যাসটিতে হৃদয়বৃত্তি সম্পূর্ণ অনুপস্থিত না হলেও মূলত কাহিনীটি রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর উপরই রচিত, যদিও শেষ পর্যন্ত কাহিনীটি সমাপ্ত হয়েছে দুটি রোমান্টিক বিপ্লবে বিশ্বাসী যুবক ও একটি সরল যুবতীর বিয়োগান্ত পরিণতিতে। দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতির পক্ষে কোন নীতি বা মতবাদ উপযুক্ত লেখকের এই কৌতূহল এই উপন্যাসেও প্রকাশ পেয়েছে। ইতিপূর্বে 'শুভা' [১৯২০] উপন্যাসের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন "আমাদের সমাজে বর্তমান অবস্থায় কয়েকটি শক্তি ও আদর্শের ক্রিয়া দেখা যায়, তাহাদের সমন্বয় এখনও হয় নাই। কোন পথে সমন্বয় হইবে তাহা দেখানো আমার উদ্দেশ্য নয়।"—লেখক এখানে কোন একটি বিশেষ মতবাদকে প্রাধান্য দেননি বরঞ্চ, নায়কের জীবনে সমাধানহীন সমস্যা দেখিয়েই কাহিনীর পরিসমাপ্তি টেনেছেন।

'অভয়ের বিয়ে' [৬২] নরেশচন্দ্রের অন্যতম জনপ্রিয় উপন্যাস। এই উপন্যাসটি দুবার চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছিল।[৬৩] উপন্যাসটির জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করে ১৯৭৬ সালের জুন মাসে দেব সাহিত্য কুটির আবার গ্রন্থটির একটি নবসংস্করণ প্রকাশ করেন।

নরেশচন্দ্র গম্ভীর প্রকৃতির লেখক তাই আলোচ্য কাহিনীটি লঘুরসের মধ্য দিয়ে শুরু করলেও শেষ পর্যন্ত তিনি এই লঘু হাস্যরসটি তাঁর স্বভাবসুলভ গাম্ভীর্যে ঢেকে দিয়েছেন। মানব চরিত্রের জটিল রহস্যময়তা তাঁর একটি প্রিয় বিষয়। এই রহস্যময়তা নিয়ে তিনি এখানেও আলোচনা করেছেন আর সবচেয়ে বড় কথা যে, আমাদের এই সমাজ ব্যবস্থায় আর্থিক সংগতি যে মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ নিয়ামক সেই সত্যটিকে তিনি গোপন করেন নি, এমন কি প্রেমের ক্ষেত্রেও যে অর্থের ও বিত্তের একটা নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে বাস্তব সচেতন লেখক সেকথাও অস্বীকার করেন নি। যদিও আলোচ্য উপন্যাসে দেখতে পাওয়া যায় যে উপন্যাসটির প্রধান বক্তব্য বাস্তব জ্ঞানহীন ধনী রূপবান ও বিদ্বান যুবকের বিবাহ সমস্যা ও তার সহজ সমাধান।

এই উপন্যাসটি পড়ার পর নরেশচন্দ্রের স্ত্রী লাবণ্যপ্রভা দেবী সরমার দুঃখে কাতর হয়ে নরেশচন্দ্রকে অনুরোধ করেছিলেন সরমার একটি সুন্দর পরিণতি দেবার জন্যে। তাঁর এই অনুরোধের ফলেই আমরা পাই লেখকের 'তারপর' [১৯৩২] উপন্যাসটি।[৬৪]

বলা বাহুল্য 'অভয়ের বিয়ে' ও 'তারপর' বাংলা সাহিত্যে প্রথম এবং সম্ভবত একমাত্র যুগল উপন্যাস।

আলোচ্য উপন্যাসটি গল্প বলার স্টাইলে আরম্ভ হলেও, কাহিনীর অনেকাংশেই এগিয়েছে সংলাপের মধ্য দিয়ে, এবং এই রচনারীতি গ্রন্থটিকে সুখপাঠ্য করে তুলেছে।

'অন্তরায়'[৬৫] নরেশচন্দ্রের এমন একটি উপন্যাস যার মধ্যে নায়ক নায়িকার সমাজ-তান্ত্রিক চিন্তাভাবনা উচ্চমধ্যবিত্তকুলের দৈনন্দিন জীবনের সংঘাতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। মার্ক্সীয় দর্শন ও সমসাময়িক ঘটনার পটভূমিতে তার ব্যক্তিগত প্রেম সমস্যার সমাধান খুঁজে পায় নি। নরনারীর প্রেম কোন একটা আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও সমাজ জীবন ও ব্যক্তি জীবনের নানা সমস্যা যে সেখানেও গভীর অন্তরায় হয়ে দেখা দিতে পারে, এই দৃষ্টিভঙ্গী এখানে অতিমাত্রায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

বিলাত ফেরত ইঞ্জিনিয়ার সতীনাথ বলশেভিকবাদে বিশ্বাসী। সে এমন একটি আদর্শ নারীকে বিয়ে করতে চেয়েছে যে হবে তার মতই প্রগতিশীল এবং কর্মে ও আদর্শে তার সঙ্গে সহকর্মীর মত কাজ করতে পারবে। সতীনাথের স্বপ্ন রুশ আদর্শে নিজের দেশকে গড়ে তোলা। আর বাঙালী মেয়ে সম্পর্কে তার ধারণা যে তারা দীর্ঘদিন পর্দার আড়ালে ও অশিক্ষার অন্ধকারে থেকে থেকে হয়ে উঠছে 'আইসব্যাগ' ও 'কাদার ঢেলা'।

কিন্তু সতীনাথের বন্ধু, অপূর্বর বোন শৈবলিনী নিজেকে অপরিচয়ের আড়ালে রেখে সতীনাথের কাছে প্রমাণ করেছে যে সে বাঙ্গালী মেয়ে হয়েও আত্মরক্ষা করতে জানে এবং বাইরে বেরিয়ে এসে সমাজ উন্নয়ণের কাজে জীবন কাটিয়ে দিতে পারে। সতীনাথ শৈবলিনীকে তাই দ্বিধাহীনভাবে গ্রহণ করে সহকর্মিণী রূপে। কাজকর্মে ও আলোচনায় দুজনার সান্নিধ্য হয়ে ওঠে অচ্ছেদ্য।

ইতিপূর্বেই শৈবলিনীর পরিচয় হয়েছিল অনুপম নামে একটি ছেলের সাথে। শৈবলিনী পিতার উইলের শর্ত ছিল যে বিয়ে না করলে সে সম্পত্তি পাবে না। তাই শৈবলিনী অনুপমকে বিয়ে করে এবং সম্পত্তির টাকা তুলে এনে সতীনাথের হাতে দেয় চটকল শ্রমিকদের বাসস্থান নির্মাণের কাজে ব্যয় করতে। অনুপমকে বিয়ে করলেও শৈবলিনী কিন্তু কখনো তাকে স্বামীর মর্যাদা বা অধিকার দেয় নি এমন কি সে একা বসবাস করতে থাকে শ্রীরামপুরের চটকল এলাকায় যেখানে কর্মসূত্রে সতীনাথ থাকে।

অনুপম প্রথম থেকেই শৈবলিনীর অদ্ভুত আচরণে ক্রমশ ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে উঠেছিল এবং শেষে একদিন শৈবলিনীর কাছে শ্রীরামপুরে এসে সে বুঝতে পারলো যে সতীনাথ সম্পূর্ণভাবে শৈবলিনীকে গ্রাস করেছে। সতীনাথ ছাড়া শৈবলিনীর আর কোন স্বতন্ত্র সত্তা নেই। অনুপম বিলাতের পথে পাড়ি দেয় আর যাওয়ার আগে শৈবলিনীকে চিঠিতে জানিয়ে দেয় সে বিবাহিতা নারী হয়েও সতীনাথের উপপত্নীতে পরিণত হয়ে গেছে এবং শুধুমাত্র মানবী হিসাবেও তার আর বিন্দুমাত্র সম্মান পাওয়ার অধিকার নেই।

শৈবলিনীর জীবনে নেমে আসে এক অদ্ভুত ক্লান্তি। যে প্রচণ্ড উৎসাহ নিয়ে সে গৃহত্যাগ করেছিল, অনুপমকে তথাকথিত একটি বিয়ে করেছিল, জীবনকে উৎসর্গ করতে চেয়েছিল সমাজসেবায় তার সবকিছুই ক্রমশঃ যেন ম্লান হয়ে গেছে আর সবকিছু অতিক্রম করে উজ্জ্বল মূর্তিতে স্থির হয়ে আছে সতীনাথ, সতীনাথকে সে ভালবাসে কিন্তু তাকে স্বামীত্বে বরণ করে নেওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। তার কোন অধিকারও নেই। সে বিবাহিতা। যে তথাকথিত বিয়েকে সে নানা শর্তে বেঁধে রেখে, তার গুরুত্বকে অস্বীকার করতে চেয়েছিল আজ সেই ঘটনাই তার জীবনে দেখা দিয়েছে প্রধান অন্তরায় হয়ে।

'অন্তরায়' উপন্যাসের প্রধান চরিত্রগুলিকে ঠিক বাস্তব চরিত্র বলা চলে না। কোন প্রগতিশীল নারীর পক্ষেই রুশদেশের আদর্শে নিজের দেশকে গড়ে তোলার মধ্যে যদিও অস্বাভাবিকতা কিছু নেই কিন্তু শুধু সেই আদর্শের গুণগানে বিশ্বাসী হয়ে কোন নারীর পক্ষে সাধারণ সমাজজীবনকে অস্বীকার করে একটি উদ্দেশ্য প্রণোদিত তথাকথিত বিবাহ করে অপর এক অবিবাহিত যুবকের সান্নিধ্যে বসবাস করাকে ঠিক বাস্তবানুগ বলা যায় না।

সতীনাথের চরিত্রকে ঠিক বাস্তব মনে হয় না। শৈবলিনীর রূপে গুণে, সাহসিকতায় সে আশ্চর্য হতে পারে, তাকে গ্রহণ করতে পারে, নিজের সহকর্মীর মর্যাদা দিতে পারে, কিন্তু প্রশ্নহীন ভাবে নয়। শৈবলিনী কে? সে কোথায় টাকা পেল? সে বিবাহিতা কি না? এসব কোন প্রশ্নই তার মনে জাগেনি। অথচ সে তো বাঙ্গালী সমাজ সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিল। এই সব প্রশ্নের উত্তর কাহিনীতে নেই। আর যেখানে প্রেম ও আদর্শের সমন্বয় সম্ভব হয়েছে সেখানে শুধু মাত্র তথাকথিত বিবাহের অনুষ্ঠানই এক সজীব অন্তরায় এ দৃষ্টিভঙ্গীও গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা সতীনাথ ও শৈবলিনী যে উভয়ই উভয়কে কামনা করে কাহিনীর মধ্যে সেকথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

অনুপমের চরিত্রটি কাহিনীর প্রথমাংশে ঠিক স্বাভাবিক না হলে পরে তার চরিত্র ক্রমশঃ বাস্তব হয়ে উঠেছে। তার শেষ চিঠিতে সে তার চরিত্রটিকে সম্পূর্ণ ও অর্থবহ করে তুলেছে।

উপন্যাসটির ঘটনার জটিলতা, বহু চরিত্র ও গল্পের পথে অপ্রয়োজনীয় সুদীর্ঘ আলোচনা গ্রন্থটির অহেতুক আয়তন বৃদ্ধি করেছে। ফলে গল্পটি পুরোপুরি রসোত্তীর্ণ হতে পারে নি। যদিও ছোটখাট চরিত্র, চটকল শ্রমিকদের ধর্মঘট ও ধর্মঘটের কারণ, তাদের জীবন-ধারণের বর্ণনা ইত্যাদি উপন্যাসে সঙ্গতিপূর্ণ হয়েছে এবং তথ্য বা তত্ত্বের ভারে মূল কাহিনী লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নি।

'তারপর'[৬৬] 'অভয়ের বিয়ে' [১৯৩০] উপন্যাসের যুগল গ্রন্থ হলেও দুটি উপন্যাসই স্বয়ং সম্পূর্ণ এবং তুলনামূলকভাবে এই উপন্যাসটি 'অভয়ের বিয়ে' উপন্যাসের চেয়ে অনেকাংশে উৎকৃষ্ট যদিও উপন্যাসটি ফরমাসি রচনা। সরমা চরিত্রের বর্ণনায় লেখকের মনোজ্ঞ মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ গ্রন্থটিকে অনবদ্য করে তুলেছে। 'অভয়ের বিয়ে' উপন্যাসের

সহনায়ক ও প্রায় খল চরিত্র অজয়ের উত্তরণ ও ভগ্নীর জন্য আত্মত্যাগিনী সরমার বিবাহই এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। 'তারপর' কাহিনীর প্রায় সব চরিত্রই অভয়ের বিয়ের মধ্য দিয়ে আমাদের পরিচিত, শুধুমাত্র নিরুপমের চরিত্রটি নতুন। এই নতুন চরিত্রটি এনে লেখক কাহিনীটিকে যেমন একদিকে জটিল করে তুলেছেন তেমনি আবার কৌতূহল উদ্দীপকও করে তুলেছেন। আবার নায়িকা সরমার জীবনে এই চরিত্রটি নিয়ে এসে নতুন করে এক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছেন এবং স্বাভাবিক ভাবেই নায়িকা সরমার চরিত্র স্ফুরণের অন্যতম উপায় হিসাবেও ব্যবহার করেছেন, এই নিরুপম চরিত্রটি।

ইতিপূর্বে নরেশচন্দ্র তাঁর বহু কাহিনীতে নারী চরিত্রের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেছেন, নারীর ত্যাগ স্বীকার তাঁর রচিত কাহিনীগুলিতে দুর্লভ নয় কিন্তু এখানে তিনি দেখিয়েছেন যে নারী যতই ত্যাগিনী বা স্বয়ংসম্পূর্ণ হোক না কেন পুরুষের সাহচর্য কামনা না করে সে পারে না। আর নারী পুরুষের সম্পর্কের অনেকখানিই নিহিত থাকে করুণা ও শ্রদ্ধার মধ্যে।

এই উপন্যাসের নায়িকা সরমা তার বোনের প্রতি স্নেহবশতঃ নিজের প্রেমকে অন্তরের অন্তরালে বন্দী রেখে অনায়াসে বোনের হাতে তার প্রেমাস্পদকে তুলে দিয়েছে এবং স্থির করেছে যে বিয়ে করবে না। কিন্তু তার সেই প্রেমের ধারা শুকিয়ে যায় নি। তার হৃদয়ের মানুষ অভয়ের সংস্পর্শে এসে সব সময় ভয় ছিল যে তার এই গোপন প্রেম প্রকাশ হয়ে পড়বে। আবার সরমার বোন ও অভয়ের স্ত্রী মায়ার অবচেতনেও এই একই ভয় ছিল কেননা সরমার মনের এই কথাটি মায়া জানত এবং সেজন্যই সে দেওর নিরুপমের সঙ্গে সরমার বিয়ে দিতে চেয়েছে। আর সরমারও নিরুপমকে এমন নিকৃষ্ট মনে হয় নি যে কারণে সে কোন জোরালো আপত্তি রাখতে পারে, কিন্তু নিজের মনের কাছে অভয়ের প্রতি তার ভালবাসাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে সে কিছুতেই নিরুপমকে স্বামী হিসাবে গ্রহণ করতে পারে নি। অথচ অভয়ের প্রতি তার দুর্বলতার কথা স্মরণ রেখে তার সহজ সমাধান খুঁজেছে নিজের বিয়ে করার সংকল্পে এবং কাছের মানুষ নিরুপম সহজেই সে কল্পনায় স্থান পেয়েছে। ঠিক এ সময়ই নিরুপম নিয়ে আসে সেই অজয়ের ঠিকানা, যাকে একদিন মায়া বিয়ে করতে চেয়েছিল আর সে বিয়ে হতে না দেওয়ার মধ্যে সরমার যথেষ্ট হাত ছিল। নিরুপম জানায় যে কোর্টে অজয়ের নামে একটা চমকপ্রদ মামলা হচ্ছে। মামলাটি হচ্ছে একটি গহনা চুরির ব্যাপারে, অজয় একটি মেয়েকে নিয়ে হীরালাল শেঠের দোকানে গিয়ে কয়েকটি গহনা দেখতে চায়। পরে হীরালাল জানতে পারে যে সেই গহনাগুলির মধ্য থেকে একটি চুরি গেছে এবং সেই চোরাই মাল বিক্রীর সময় অজয় ধরা পড়ে এবং পালিয়ে যায়। এখন অজয় ফিরে এসেছে এবং কোর্টে সে মামলা উঠেছে। নিরুপমের মুখে এই ঘটনা শুনে মায়া শঙ্কিত হয়ে পড়ে কেননা অজয়ের সঙ্গে স্ত্রীর পরিচয়ে সেই হীরালালের দোকানে গিয়েছিল এবং ঘটনাটা ঘটেছিল তার অভয়ের সঙ্গে বিয়ের আগে।

মায়া ভয়ে বিহ্বল হয়ে শেষ পর্যন্ত তার এই কীর্তির কথা সরমার কাছে স্বীকার করে এবং একথাও জানায় যে এই ঘটনা কোর্টে প্রকাশ হয়ে পড়লে অভয়ের কাছে সে মুখ দেখাতে পারবে না এবং আত্মহত্যা করা ছাড়া তার আর কোন উপায় নেই। সরমা এ ব্যাপারে মায়াকে আশ্বাস দেয় এবং হীরালালকে বাড়ীতে ডেকে এনে নিজেকে অজয়ের স্ত্রী বলে পরিচয় দিয়ে কেস উঠিয়ে নেওয়ার জন্য তাকে সব টাকা বুঝিয়ে দেয়। এ সমস্তই সে করেছে মায়াকে কেলেঙ্কারীর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য। অজয় সম্পর্কে তখনও তার মনে নতুন কোন উৎসাহ জাগে নি। শুধুমাত্র নিরুপমের কাছ থেকে অজয়ের ঠিকানা নিয়ে সে অজয়কে সাবধান করে এসেছে, যাতে এ ব্যাপারে মায়ার নাম না ওঠে। অজয় তখন ছোট মোটর মেরামতির কারবার করছে এবং সম্পূর্ণ অন্যভাবে জীবন কাটাচ্ছে, যা দেখে সরমা বিস্মিত না হয়ে পারে নি এবং এ সম্পর্কে প্রায় নিশ্চিন্ত হয়েছে যে কোর্টে কখনোই অজয় মায়ার নাম তুলবে না। এ সম্পর্কে সরমা আরো নিশ্চিন্ত হয়েছে যখন অজয় উপযাচক হয়ে এসে হীরালালকে দেওয়া সেই টাকা সরমাকে ফিরিয়ে দিয়ে গেছে। অজয়ের এই পরিবর্তন ও তার শ্রম ও অধ্যবসায় দেখে সরমা নতুন করে অজয় সম্পর্কে ভাবতে শুরু করেছে এবং ক্রমশঃ অজয় সম্পর্কে একটা দুর্বলতাও তার মনে গড়ে উঠেছে।

শেষ পর্যন্ত খুব নাটকীয় ভাবে অভয়, মায়া, নিরুপম ও হীরালালের সামনে সরমা অজয়কে স্বামীত্বে বরণ করে নিয়েছে এবং লেখক এই কাহিনীর সমাপ্তি টেনেছেন।

আলোচ্য উপন্যাসটিও ঘটনাবহুল কিন্তু পাত্রীর মানসিক চিন্তাভাবনা ও আত্ম-উপলব্ধিও কাহিনীতে ব্যাপকভাবে স্থান পেয়েছে এবং এর পরিমিতি লেখক অত্যন্ত সচেতনভাবে রক্ষা করেছেন, ফলে উপন্যাসটি পাঠ করতে পাঠকদের কখনো ক্লান্তি আসে না এবং পাঠকের কৌতূহলটিও শেষ পর্যন্ত বজায় থাকে। তাই একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে নরেশচন্দ্রের জটিল তত্ত্বনির্ভর উপন্যাসগুলির চেয়ে পারিবারিক ঘটনাশ্রয়ী এই উপন্যাসটি অনেক বেশী সার্থক হয়ে উঠেছে।

এই কাহিনীতে অজয়ের চরিত্রের পরিবর্তন অনেক আঘাতের ফলে সম্ভব হয়েছে। অভয়েরও সাংসারিক বুদ্ধির পরিণতি ঘটেছে, আর সবচেয়ে বাস্তব মায়ার সরমার প্রতি ঈর্ষা। যদিও লেখক তা মায়ার অনুশোচনার মধ্য দিয়ে মায়া সরমার সম্পর্ককে অটুট বন্ধনে বেঁধে রাখতে সমর্থ হয়েছেন।

'তরুণী ভার্য্যা'[৬৭] নরেশচন্দ্রের একটি নতুন ধরনের উপন্যাস। এই উপন্যাসের মধ্যে তিনি একটি লঘু হাস্যরস পরিবেশন করেছেন। নায়ক চরিত্রটি প্রায় সর্বগুণের আধার হলেও তার একটিমাত্র দুর্বলতার জন্য তার প্রতি আমাদের সহজেই করুণা জাগে। এই ধরনের পুরুষ চরিত্র নরেশচন্দ্রের সাহিত্যে আর নেই যদিও বাংলা উপন্যাসের গতানুগতিক নিয়মানুসারে এই উপন্যাসটিও মূলত নায়িকাপ্রধান, ফলে উপন্যাসে নায়কের কিছুটা দুর্বলতা স্বাভাবিকও।

'মেঘনাদ' [৬৮] নরেশচন্দ্রর দ্বিতীয় প্রকাশিত উপন্যাস। গ্রন্থাকারে উপন্যাসটির নাম পরিবর্তন করে 'পাপের ছাপ'[৬৯] রাখা হয়। অনুমান করা হয় যে গ্রন্থটির রচনাকালে তিনি অধ্যাপনা সূত্রে ঢাকায় ছিলেন অর্থাৎ 'পাপের ছাপের' রচনাকাল ১৯১৬ থেকে ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে।

আলোচ্য কাহিনীর উপাদান প্রধাণত মানবমনের বিচিত্র গতিপ্রকৃতি ও পারিপার্শ্বিক ঘটনা নির্ভরতার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া। একটি সাধারণ সৎ মানুষের জটিল চিন্তাভাবনা ও কাজকর্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সাহায্যে এই কাহিনীতে বর্ণিত হয়েছে। যদিও কাহিনীর নায়কের এই সব জটিল চিন্তাভাবনা গড়ে উঠেছে একটি 'জন্ম অপরাধী' নারীর সংস্পর্শে। এখানে লেখকের যে কৌতূহল প্রকাশ পেয়েছে তা হচ্ছে আধুনিক মনো-বিজ্ঞানের কৌতূহল। লেখক এখানে দেখাতে চেষ্টা করেছিলেন যে একটি প্রতিষ্ঠিত, উচ্চশিক্ষিত অবিবাহিত যুবক কিভাবে মানসিক অসুস্থ একটি নারীর প্রভাবে নিজের অবচেতন মনের অপরাধ প্রবণতাকে প্রশ্রয় দিয়ে জটিল ও দুর্বিসহ এক অশান্তিময় জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়েছে। এই উপন্যাসটি প্রকাশকালে সমালোচকদের মন্তব্য ছিল, যে উপন্যাসটি অপরাধ তত্ত্বের উপর রচিত, আদর্শমূলক এবং উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। 'পাপের ছাপ' উপন্যাসের ভূমিকায় নরেশচন্দ্র এই অভিযোগগুলি সম্পর্কে নিজের বক্তব্য রেখেছেন। প্রসঙ্গত তাঁর আদর্শ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন—"আমি আদর্শ লইয়া একেবারে কারবার করি নাই এমন কথা বলিতে পারি না। কিন্তু আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি একএকটি বিশিষ্ট বাস্তব জীবনে এক একটি আদর্শের ক্রিয়া। আমি আদর্শ মানুষ গড়িতে চেষ্টা করি নাই। যারা আমার নায়ক নায়িকা তারা নিতান্তই মানুষ, তাই তাদের যেমন একদিকে আদর্শ আছে, অপরদিকে তাদের রক্ত মাংসের শরীরটাও আছে। তাই তারা কোন পূর্ণাদর্শের অভ্রান্ত কল্পনা করে নাই, তার অনুশীলনেও পায়ে পায়ে ঠেকিয়া গিয়াছে। তাহাদের কোন আদর্শ যে ঠিক এমন কথা আমি হলপ করিয়া বলি নাই।" নরেশচন্দ্রের এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে কোন একটি বিশেষ আদর্শ প্রচার তার উদ্দেশ্য ছিল না বরঞ্চ বাস্তবজীবনের ছোটখাট ঘটনার প্রভাবে পরিবর্তনশীল মানব মনের বৈচিত্র্য বর্ণনা করাই তাঁর লক্ষ্য ছিল। হয়ত তাঁর এই বর্ণনা অপ্রিয় সত্য, কিন্তু বাস্তব এবং এই দৃষ্টিভঙ্গী বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার।

টাঙ্গাইলের সরকারী ডাক্তার মেঘনাদ চক্রবর্তীর কাছে মনোরমা নামে যে মেয়েটিকে বয়স পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয় সেই প্রমথ ভট্টাচার্যের মেয়ে এবং এই মেয়েটির সাথেই একদা মেঘনাদের বিবাহের সম্বন্ধ হয়েছিল কিন্তু আজ মেয়েটি বিচারাধীন আসামী। পরীক্ষার পর মেঘনাদ জানতে পারে যে মনোরমা স্খলিতা। জেলে মনোরমা মেঘনাদকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে তার এই পরিণতির জন্য কিছুটা মেঘনাদই দায়ী যেহেতু মেঘনাদ তাকে পাত্রী হিসাবে পছন্দ করেনি এবং তার গরীব পিতাও অন্যত্র টাকার অভাবে তার বিয়ে দিতে পারেনি। মনোরমার যুক্তি হল এই

যে সেদিন যদি মেঘনাদ তাকে পছন্দ করে বিয়ে করতো তবে সে এখন এক সম্ভ্রান্ত মহিলার সম্মান ও প্রতিষ্ঠা নিয়ে জীবনধারণ করতে পারতো। কিন্তু সেটা তার জীবনে সম্ভব হয় নি, আর বাধ্য হয়েই তাকে অপরাধ করতে হয়েছে। তাই মেঘনাদের উচিত তাকে উদ্ধার করা।

মেঘনাদ এক অবিবাহিত যুবক, আর মনোরমা আশ্চর্য মোহিনী রূপসী,—প্রাকৃতিক কারণেই মেঘনাদ তাই মনোরমার প্ররোচনায় সাড়া না দিয়ে পারে নি এবং সে ক্রমশঃ মনোরমার প্রতি একটা তীব্র আকর্ষণ অনুভব করে। যদিও মনে মনে একটা অপরাধবোধ তাকে পীড়িত করে তোলে। এরপর মেঘনাদ কিছুটা নিজের অতীত কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্তের জন্য এবং কিছুটা মনোরমার প্রতি দুর্বলতার জন্য নিজের আদর্শ বিসর্জন দিয়ে আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে মনোরমাকে বাঁচায় কিন্তু বিবেকের দংশনে আদালতে অভিযুক্ত সতীশ বাবুর স্ত্রী সুনীতিকে সন্তান সহ নিজের বাড়ীতে আশ্রয় দেয় এবং সুনীতির সম্মান রক্ষার জন্যই সরিৎ নামে একটি মেয়েকে বিয়ে করে। মেঘনাদ কিন্তু সরিৎকে বিয়ে করার পরও মনোরমাকে মন থেকে সরিয়ে দিতে পারে নি। মনোরমাকে ভুলবার জন্য মেঘনাদ সরকারী চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে এক ঔষধের কারখানায় যোগ দেয়, কিন্তু এই নতুন পরিবেশেও সে কখনোই মনোরমার অস্তিত্ব অনুভব না করে পারে নি। আর তার এই অনুভবের মধ্যে সবচাইতে প্রবল ছিল অপরাধবোধ। এই সময় হঠাৎ রাজনৈতিক কারণে মেঘনাদকে জেলে যেতে হয় এবং জেল থেকে ফিরে এসে সে স্থির করে যে দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করবে। মেঘনাদ তার গ্রামের বাড়ীতে যখন ফিরে আসে সরিৎ তখন কলকাতায় নিজের সভাসমিতি নিয়ে ব্যস্ত।

এই সময় ঘটনাচক্রে মনোরমা আবার মেঘনাদের আশ্রয়ে ফিরে আসে, তখন তার অপরাধের তালিকা আরো দীর্ঘ হয়েছে। মনোরমার জন্ম-অপরাধবৃত্তি, সাত্ত্বিক জীবন বেছে নেওয়া মেঘনাদের শান্ত সৌম্য সাহচর্যে তৃপ্তি পায় নি। সরিৎ মেঘনাদের গ্রামের বাড়ী এসে মনোরমাকে মেঘনাদের সঙ্গে দেখে এক কুটিল সন্দেহে ভেঙে পড়ে। আর মনোরমাও তার অতৃপ্ত কামনা-বাসনায় উন্মত্ত হয়ে মেঘনাদকে হত্যা করতে গিয়ে ভুল করে মেঘনাদের শ্যালক অজিতকে হত্যা করে। এই দৃশ্যে সরিৎ পাগল হয়ে যায়। আদালতে মনোরমার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত মনোরমা তার শেষ ইচ্ছায় মেঘনাদের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে কিন্তু মেঘনাদ তার সে ইচ্ছা পূরণ করে নি।

'পাপের ছাপ' উপন্যাসের প্রধান নারী চরিত্র মনোরমাকে সব সময়ই অপরাধী দেখানো হয়েছে। অপরাধতত্ত্বের নিয়মানুসারে স্ত্রীলোক অপরাধীদের অন্যতম অপরাধ যৌন ব্যাভিচার।[৭০] মনোরমা চরিত্রও এ নিয়মের বাইরের নয়। সে আলোচ্য উপন্যাসে মুখ্য মহিলা চরিত্র হলেও নায়িকা কখনোই নয়, লেখক তাকে শুধুমাত্র মেঘনাদের চরিত্র প্রকাশের পটভূমি হিসাবে ব্যবহার করেছেন আর উপন্যাসে তার জীবনের কোন উত্তরণও দেখানো হয় নি এমনকি কাহিনীর শেষ অংশে তাকে দিয়ে এক নৃশংস হত্যা করানো হয়েছে। এর বাস্তব কোন ভিত্তি থাকলেও এই রূঢ়তা আমাদের

আঘাত করে। তাই মনোরমাকে কখনোই যেন রক্ত মাংসের মানবী মনে হয় না, মনে হয় জীবন্ত পাপ ও ব্যভিচারের প্রতীক। তবু লেখকের বর্ণনা কৌশলে মনোরমা চরিত্রের পরিণতি জানার জন্য পাঠকদের কৌতূহল শেষ পর্যন্ত বজায় থাকে। সে জন্য বলা যায় যে মনোরমা নায়িকা না হয়েও কাহিনীকে দ্রুত পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে।

সতীশবাবুর স্ত্রী সুনীতি অদৃষ্টচক্রে মেঘনাদের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছে। আপাতদৃষ্টিতে তাকে মনে হয় সে যেন আদর্শের প্রতীক কিন্তু বস্তুত তার নিভৃত চিন্তার বর্ণনা করে লেখক তাকেও রক্তমাংসের জীবন্ত নারীতে পরিণত করেছেন। সে তার দুশ্চরিত্র স্বামীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে পেরেছে অথচ আত্মহত্যার পূর্বে তার তথাকথিত স্বামী দেবতার কাছে মেঘনাদের সঙ্গে তার সম্পর্কের সত্য কথাটুকু চিঠিতে প্রকাশ করতে দ্বিধা করে নি। মেঘনাদ তাকে বরাবরই মা ডেকেছে এবং সুনীতির আচরণেও কোন দুর্বলতা প্রকাশ পায় নি। কিন্তু লেখক সুনীতির অবচেতন মনের চিন্তা ভাবনা গোপন করেন নি—'সুনীতি লজ্জায় মরিয়া, ঘৃণায় ভরিয়া অনুভব করিল যে, শুধু এই দুঃখই তার দুঃখ নয়। অনেক দিন তার মনের আনাচে কানাচে একটা কথা মধ্যে মধ্যে উঁকি মারিয়াছে—এতদিন সে তাহাকে টিপিয়া মারিয়াছে। আপনার কাছেও তাহা স্বীকার করিতে সুনীতি কুণ্ঠিত, লজ্জিত, হইয়া উঠিল।...তার অন্তরের উপর দারুণ ক্রোধ হইল! কি ঘৃণিত, কি নীচ, কি সর্বনেশে, কি অবিশ্বাসী তার মন। এতদিন কি মেঘনাদ দুধ দিয়া ঘরে এমন কালসাপ পুষিয়া আসিয়াছে, তার আগে সুনীতি মরিল না কেন,—মনের তলায় সে মেঘনাদের মা ডাকের অপমান করিয়াছে।' [পৃ: ২০৩।২০৪] সুনীতি রক্তমাংসের নারী হলেও আদর্শচ্যুত হয় নি, তাই সে তার পাপচিন্তা ও অপরাধবোধের কারণে আত্মহত্যার সংকল্প করেছে। সে ভেবেছে—'এমন পাপ বুকের মধ্যে লুকাইয়া আর সে এখানে থাকিতে পারে না...মরণের তো বাধা নাই,...স্বামী তার পবিত্রতায় কলঙ্ক দিয়াছিলেন বলিয়া রাগের মাথায় তাহাকে সে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে। নিজেকে সেই অপরাধের যোগ্য জানিয়া আজ মনে হইল যে...স্বামীর কাছেই শাস্তি লইতে তাহাকে যাইতে হইবে।' [পৃ: ২০৪]

মেঘনাদের স্ত্রী সরিতের চরিত্রটি পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে নি। মেঘনাদের সহধর্মিণী হয়েও সে কখনোই মেঘনাদের মানসিক যন্ত্রণার উপশম ঘটাতে পারে নি অথচ স্বামীকে অন্যায় সন্দেহ করেছে। আসলে তার চরিত্রের দুর্বলতা তাকে এমন করে তুলেছে এবং যার পরিণতি ঘটেছে তার উন্মাদ অবস্থার মধ্যে।

মেঘনাদের চরিত্র বিন্যাসের একটি ধারাবাহিক বর্ণনা উপন্যাসে স্পষ্ট। লেখক তার প্রতিটি গতিবিধির বর্ণনা, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে এমনভাবে পাঠকদের পথনির্দেশ করে দিয়েছেন যে তাদের পক্ষে নতুনভাবে চরিত্রটি ব্যাখ্যা করার উপায় রাখেন নি। হয়ত লেখক বুঝতে পেরেছিলেন যে মানবমনের বিচিত্র স্তর সম্পর্কে বাঙালী পাঠক তখনও সচেতন হয়ে ওঠে নি এবং মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ যতই বাস্তবানুগ হোক না কেন পাঠকদের

এই রীতিটি বুঝিয়ে বলার দায়িত্বও লেখকের। মেঘনাদের মনের চিন্তাভাবনার সূত্রটিও তাই লেখক পাঠকদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। ফ্রয়েডীয় অবচেতনতত্ত্ব বা উপন্যাসে মনোবিশ্লেষণ অনুসৃত পদ্ধতির সঙ্গে পাঠক তখনও যথেষ্ট পরিচিত হয়ে ওঠে নি। নরেশচন্দ্র তাই কাহিনীর প্রথম দিকেই মেঘনাদের ভাবনার অংশ বিশেষ সামনে তুলে ধরেছেন, যেমন—'মনের তলায় মনোরমার যে অনাবৃত মূর্তি সে দেখিয়াছিল, তাহা জাগিয়া উঠিয়া তার কামনা প্রদীপ্ত করিয়া তুলিল···।' [পৃঃ ১৯] কিংবা—'মনের ভিতর যে পশুচৈতন্য, তার তাণ্ডব নর্ত্তনে মেঘনাদ সমস্ত দিনরাত একটা নেশাখোরের মত কাটাইয়া দিল—।' [পৃঃ ২৭] কিন্তু এই সব অনুভূতির রেশ তার মনে স্থায়ীভাবে বাসা বাঁধতে পারে নি, বরঞ্চ এই অনুভূতির পরপরই তার মনে অপরাধ এবং পাপবোধের একটা সংমিশ্রণ ঘটেছে। তাই মনোরমার বিচারের কাঠগড়া থেকে নেমে এসে সে সহজেই ভাবতে পেরেছে 'সে এত দুর্বল, এত হীন। অবশেষে একটা তুচ্ছ নারীর মোহে পড়িয়া সত্যধর্ম এমন করিয়া জলাঞ্জলি দিল' [পৃঃ ৬৯] এবং 'সে তার যথাসর্বস্ব হারাইয়া বসিয়া আছে'। [পৃঃ ৭০] কাহিনীর প্রথমাংশ থেকে দেখা যাচ্ছে যে মেঘনাদের কর্মের সঙ্গে ভাবনার, অপরাধের সঙ্গে আদর্শের একটা সংঘাত বরাবর চলে আসছে। নিজের কৃতকর্মের জন্য মেঘনাদ যেন সকলের মুখে বিদ্রূপের হাসি দেখতে পাচ্ছিল। এমন অবস্থায় সরকারী চাকরিতে ইস্তফা দেওয়া তার পক্ষে স্বাভাবিকই হয়েছে, যেহেতু এখন আর তার পক্ষে 'ফুলবাড়ীর জমিদার ইয়াসিন মিঞার ঘুষের টাকা প্রত্যাখ্যান করার কোন অধিকার নেই।' যে আদর্শ নিয়ে সে জীবন শুরু করেছিল, সেই আদর্শের মান থেকে সে ইতিমধ্যেই অনেকখানি নেমে গিয়েছে। কিন্তু সে তার এই নবলব্ধ জীবন থেকে মুক্তি খুঁজেছে, 'মুক্তির জন্য সে ছটফট করিতে লাগিল। সেই মুহূর্তে যদি পৃথিবীর গর্তে লুকাইয়া এসব ঝঞ্ঝাট হইতে মুক্তি পাইতে পারিত তবে বোধ হয় সে তাহাই করিত। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল তখনই সব ফেলিয়া একেবারে বেমালুম ভাবে কোথাও নিরুদ্দেশ হইয়া যায়।' [পৃঃ ১১৪] আসলে মেঘনাদ চেয়েছিল নতুনভাবে নতুন পরিবেশে তার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে। মেঘনাদ তার এই আদর্শ বজায় রাখতে চেষ্টা করেছে বটব্যাল কোম্পানির কারখানায়। কিন্তু এখানেও নানা ঘটনা তাকে পীড়িত করে তুলেছে।

উপন্যাসের অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে আমরা আবার মেঘনাদের সঙ্গে বিচলিত হয়ে পড়ি মনোরমা মোকদ্দমার শমন আসায়। নতুন পরিবেশে মেঘনাদ নতুনভাবে জীবন কাটানোর যে উপায়ের সন্ধান করছিল এই শমন তার সেই সব পরিকল্পনা এলোমেলো করে দিল। তাই—'এই শমন পাইয়া তার মনের ভিতর এই ছায়াচ্ছন্ন অতীত কাহিনী ভাসিয়া উঠিয়া তার সমস্ত ভবিষ্যত কল্পনা আজ অন্ধকারে ঢাকিয়া দিল।· তার মনের ভিতরে যে একটা কুৎসিত কলঙ্ককাহিনী লুকান আছে, একটা পাপের কলুষ স্পর্শ যে তার জীবনকে কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে সে কথাটা অতি তীব্র বেদনার সহিত সে অনুভব করিল। তার মনে হইল যে, যে অতীতকে সে একেবারে সিন্ধুকে বন্ধ করিয়া

নিশ্চিন্ত হইয়াছিল, তার আশার এই প্রথম উন্মেষের সময় সে যেন কেমন করিয়া ছাড়া পাইয়া আসিয়া তাহার ভবিষ্যতের অমৃত ভাণ্ডারকে বিষাক্ত করিয়া দিতেছে।'— [পৃঃ ১৪১] কিন্তু মেঘনাদের এই আক্ষেপ তার রক্তমাংসের তাড়নায় স্থায়িত্ব লাভ করতে পারে নি—সে মনোরমার মোহিনী আহ্বানকে উপেক্ষা করতে পারে নি বরঞ্চ অনায়াসে তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে 'আমি তোমাকে খালাস করে আনব…।' [পৃঃ ১৫৯] আবার পরমুহূর্তেই 'লজ্জায় ঘৃণায় তাহার মনটা ছাইয়া গেল।' [পৃঃ ১৫৯] অর্থাৎ মেঘনাদ চরিত্রের স্থিতিহীন দ্বৈতসত্তা প্রতিমুহূর্তে চঞ্চল ও দোলায়িত।

মেঘনাদের একটা আদর্শ ছিল বলেই সে সতীশবাবুর স্ত্রী সুনীতি ও তার সন্তানদের আশ্রয় দিয়েছে এবং এই কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেও কিন্তু শাস্তি পায় নি। আরো একটা মিথ্যা কলঙ্কের বোঝা তার মাথায় নিতে হয়েছে। কিন্তু এইসব ঘটনা—'তাহাকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল তাহার আশা শূন্য উৎসাহশূন্য জীবনের এক অন্তহীন বেদনা। সে আজ হঠাৎ আবিষ্কার করিয়া ফেলিল যে এতদিন সে যে কর্তব্যনিষ্ঠার স্পর্দ্ধা করিয়া আসিয়াছে ও ত্যাগের গৌরবে উৎফুল্ল হইয়াছে, তার ভিতর গোপন একটা অতল অভিমান ও অপরিমেয় যশোলিপ্সা আছে।…আজ যে কর্তব্য সে মাথা পাতিয়া লইয়াছে তাহাতে কেবল ত্যাগ আছে, প্রতিষ্ঠা নাই, খ্যাতি নাই—বরং সমস্ত জীবন ভরিয়া একটা মিথ্যা ভিত্তিশূন্য কলঙ্ক ও তীব্র অভিসম্পাত ও উপহাস তাহাকে পরিপাক করিতে হইবে।' [পৃঃ ১৬৬] দুঃখিত চিত্তে সে নিজেকে নিজে প্রশ্ন করেছে—যে প্রশ্ন আজও যন্ত্রণাকাতর আধুনিক মানুষের প্রশ্ন—'কিসের জন্য তার জীবনের সূত্রের মধ্যে বার বার এমন একটা জটিল গ্রন্থি পড়িয়া যাইতেছে? সে কেন সহজ সরল পথে জীবনে সফলতা লাভ করিতে পারিতেছে না?' [পৃঃ ১৬৮]

মেঘনাদ যখনই নিজের বিবাহ সম্পর্কে ভেবেছে তখন সর্বপ্রথম তার মনে হয়েছে মনোরমার কথা। কিন্তু এ অবস্থায় সুনীতির ভরণ পোষণের দায়িত্ব সে ত্যাগ করতে পারে না আর মনোরমাকে গ্রহণ করাও তার পক্ষে এখন আর সম্ভব না। অবশেষে মেঘনাদ সুনীতির সম্মানের কথা চিন্তা করে সরিৎকে বিয়ে করেছে, যেহেতু অবিবাহিত মেঘনাদের বাড়ীতে সুনীতির বাস করাটা অনেকের কাছেই দৃষ্টিকটু লাগছিল, যদিও আমরা জানি যে সুনীতিকে মেঘনাদ জননীর মতই সম্মান ও শ্রদ্ধা করত।

বিয়ের পর মেঘনাদ কিছুদিন মনোরমার মোহমুক্ত হয়ে থাকতে পেরেছিল কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই মেঘনাদ সংবাদ পেল যে পুনর্বিচারে মুক্তি পেয়ে মনোরমা তার কাছেই আসছে। এ অবস্থায় মেঘনাদ সরিতের কাছে বাধ্য হয়ে তার ও মনোরমার সম্পর্কের কথা বলেছে কেননা পূর্ব অভিজ্ঞতায় মেঘনাদ বুঝতে পেরেছিল যে 'পাপীকে বাস্তবিক বেশীর ভাগ লোক খুব বেশী ঘৃণা করে না।' [পৃঃ ১৭৬] কিন্তু সরিৎ স্ত্রী হয়ে স্বাভাবিকভাবেই তার স্বামীর উপর অন্য নারীর এই প্রভাবকে সহ্য করতে পারে নি এবং মেঘনাদকেই এজন্য দায়ী করেছে। সে বুঝতে পেরেছে যে তাকে 'মেঘনাদ যতই শ্রদ্ধা বা আদর করুক না কেন, তার অন্তরটা—তার রক্তমাংস শুদ্ধ

তার সত্তাটার উপর জন্মের শোধ একটা স্থায়ী ছাপ মারিয়া দিয়াছে মনোরমা।' [পৃঃ ২১৮] তাই সরিৎ মনে মনে ভেবেছে যে তাকে বিয়ে করাটা মেঘনাদের পক্ষে ঠিক হয় নি এবং মেঘনাদের কথার উত্তরে বলেছে—

'...কিন্তু তা জেনেশুনেই তো তুমি তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলে—ধর্মের চক্ষে সে তোমার স্ত্রী, তাকে ত্যাগ করলে তোমার অধর্ম হবে।' [পৃঃ ২২০]। এরপর সরিৎ গৃহত্যাগ করেছে আর মনোরমা পেয়েছে মণি মিঞার আশ্রয়।

সরিতের গৃহত্যাগের পরবর্তী ঘটনাগুলি অতি দ্রুত সংঘটিত হয়েছে কিন্তু মেঘনাদের চিন্তাভাবনা ও যন্ত্রণা তখন অনেক স্তিমিত হয়ে পড়েছে। যদিও কর্তব্যের খাতিরে মেঘনাদ মনোরমাকে তার গৃহে স্থান দিয়েছে কিন্তু আর মোহাবিষ্ট হয় নি, এমন কি যে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আসামী মনোরমার সাথে শেষ সাক্ষাৎও করেনি।

এই উপন্যাসে বাস্তবধর্মী লেখক নরেশচন্দ্র প্রতিটি কার্যকারণের বিশ্লেষণ করলেও সব ব্যাপারের কারণ যেন নিয়তির অমোঘ অভিশাপেই ঘটেছে এবং এই অভিশাপের বলি হয়েছে মেঘনাদ, মনোরমা, সুনীতি, সরিৎ এমনকি শ্যালক অজিত পর্যন্ত।

তাই কাহিনীর শেষ পর্যায়ে এসে দেখতে পাওয়া যায় যে লেখকের বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের পরিসমাপ্তি ঘটেছে নিয়তির বিধানে। হতে পারে নিয়তির এই অমোঘ অভিশাপের অঙ্কুর নিহিত আছে সামাজিক সমস্যার গভীরে। বস্তুতঃ কাহিনীর সবাই নষ্ট সমাজ ব্যবস্থার ফসল। যেখানে আদর্শ টিকে থাকতে পারে না। ন্যায় নীতি বিনষ্ট হয় পারিপার্শ্বিকতার কলুষ স্পর্শে।

'পরিণাম'[৭১] উপন্যাসের মুখবন্ধে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত নিজেই এই গ্রন্থরচনার প্রাথমিক উদ্দেশ্য আলোচনা করেছেন। এই কাহিনীর ঘটনাস্থল ঢাকা এবং পাত্রপাত্রী সবাই ঢাকা জেলার লোক। এই উপন্যাসে লেখক দেখাতে চেয়েছেন যে শ্রমিক শ্রেণী, —যারা উৎপাদনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত তারা তাদের জাত ব্যবসা ছেড়ে 'ভদ্র' জীবনযাপনের মোহে শ্রমজীবনকে অস্বীকার করে শিক্ষিতভদ্র জীবন বেছে নিয়েছে। কিন্তু অন্তিমে এসে নিজের জীবন দিয়ে বুঝতে পেরেছে যে মিথ্যার মোহে পড়ে তাদের এই অপরিচিত কষ্টস্বীকার সম্পূর্ণ বিফলতার মধ্যে শেষ হয়েছে। যে সমাজে শ্রম মর্যাদাহীন সেখানে এই 'ভদ্র' হওয়ার মোহ সৃষ্টি হতে বাধ্য।

'পরিণাম' উপন্যাসটির মুখবন্ধে লেখক লিখেছেন—

'বাঙ্গালাদেশের আপামর সাধারণের মধ্যে তথাকথিত 'ভদ্র' উপজীবিকার মোহ যে সমাজে কতটা অনিষ্টের সৃষ্টি করিতেছে তাহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা। 'এ বই লেখার একটা লক্ষ্য ছিল—'। তাই আলোচ্য উপন্যাসটি যে উদ্দেশ্যমূলক একথা নতুন করে বলার নেই তবু কৃষ্ণধন বা নবনীধর, বলাই, ললিতা, নন্দরানী বা গোপাল কেহই আমাদের কাছে অপরিচিত থাকে নি। এই উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্রই স্ব স্ব ভূমিকায় নিজেদের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করতে পেরেছে তবে কৃষ্ণধনের চরিত্র অতিমাত্রায় নির্মল করে দেখান হয়েছে, যদিও তা বাস্তবতার পরিপন্থী মনে হয় না।

এখানে লেখক অতি সহজে ঢাকা শহরের সংলগ্ন গ্রামের সমাজ ও ঢাকা শহরের সমাজের যে বর্ণনা করেছেন তার মধ্যে বাস্তবতার অভাব নেই। তাছাড়া ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা, জমিদারদের পুরুষানুক্রমিক বিচার করার পদ্ধতি, আদালতে ঘুষ দেওয়া নেওয়ার সাধারণ নিয়ম, অনগ্রসর জাতিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ব্যবস্থা এবং বাড়ীর বউকে বৈর নির্যাতন দেওয়া ইত্যাদি সবই কখনো আভাসে কখনো বিস্তারিত ভাবে তিনি বর্ণনা করেছেন।

এই উপন্যাসে লেখক যে সমস্যা তুলে ধরেছেন তার সমাধান দেখান নি সত্য কিন্তু মুখবন্ধে দুঃসাহসিক ভাবে বলেছেন—'আমরা ভদ্রলোকেরা হাতে খাটিয়া সম্পদ সৃজন করাটাকে ছোট কাজ মনে করি। যারা সম্পদ সৃষ্টি করে তাদের শোষণ করাকে, exploitationকে বড় বলিয়া জানি।' আর উপায় সম্বন্ধে বলেছেন—'শিক্ষার ধারার পরিবর্তন, সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তির সংস্কার', ইত্যাদি। তাই দেখা যাচ্ছে যে নরেশচন্দ্র এখানেও নিজের আদর্শ বিস্মৃত হন নি।

'টিকি বনাম টাক' [১৯৩৩] নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের একটি নতুন ধরনের উপন্যাস। এই উপন্যাসের অন্যতম দুটি চরিত্র টিকি এবং টাক উভয়ই প্রবীণ এবং পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। এই উপন্যাসে তিনি জমিদার ও উচ্চবিত্তের সমাজ ও তাদের রীতিনীতির কথা তুলে ধরেছেন। প্রসঙ্গত তিনি জমিদারদের অন্নপুষ্ট পরগাছা মোসাহেবদের চরিত্রও বর্ণনা করেছেন যারা জমিদারদের আত্মীয়তার সুযোগ নিয়ে শুধুমাত্র লাম্পট্য করেই জীবন অতিবাহিত করে।

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত তাঁর 'বিয়ের খাতা' [১৯৩০] উপন্যাসটিতে সমাজের একটি প্রচলিত সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন। এই উপন্যাসের চরিত্রগুলি উচ্চবিত্ত না হলেও সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত। অথচ এই শিক্ষিত উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেও মেয়েদের বিবাহ সমস্যাটি যে পুরোমাত্রায় বজায় ছিল বাস্তব সচেতন লেখক তা অস্বীকার না করে অতি সুন্দরভাবে তা তুলে ধরেছেন। প্রসঙ্গত তিনি বাংলাদেশের বিবাহেচ্ছু যুবকদের মানসিক অবস্থা বোঝানোর জন্য মনস্তত্ত্বের এমন একটি সূত্রের ব্যবহার করেছেন যার ফলে তাদের চরিত্রের একটি বিশেষ দুর্বলতার কারণ আমাদের সামনে উদ্ঘাটিত হয়েছে। তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে বিবাহ ব্যাপারে অর্থনৈতিক অবস্থা যেমন ক্রিয়াশীল ঠিক তেমনি আবার মানসিক দুর্বলতাও এই ব্যাপারে অন্তরায় হয়ে দেখা দিতে পারে। এই উপন্যাসের নায়ক সুশিক্ষিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হলেও ভীরু কাপুরুষ এবং পিতার উপর একান্ত নির্ভরশীল তাই সে নিজের বাঞ্ছিত বিবাহের দায়িত্ব নিতেও পারে নি, প্রতি পদক্ষেপে সংশয় অনুভব করেছে। বলাবাহুল্য এই উপন্যাসের নায়ক বাংলাদেশের অগণিত প্রতিষ্ঠিত পাত্রদের প্রতিনিধি।

'পরিণাম' [১৯৩০] উপন্যাসে নরেশচন্দ্র দেখিয়েছেন যে তাঁর গোয়ালা নায়ক লেখাপড়া শিখে হাকিম হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিল। সে স্বপ্ন তার সফল হয় নি—হতে পারে না, এই সমাজ ব্যবস্থায়। তাই তাকে করতে হয়েছে তার সেই অবজ্ঞাত

গোয়ালাগিরিই—বি. এ. পাশ করার পরও। লেখক নিজের কৌশলে তাকে সম্পন্ন 'হঠাৎ বাবু' করে তোলেন নি তার বাস্তব পরিণতিই দেখিয়েছেন। কিন্তু তিনি কখনোই একথা বলতে চান নি যে গোয়ালার ছেলের ভদ্রজীবিকা সম্ভবপর নয় কেননা ভদ্রজীবিকা কথাটার মধ্যেই তিনি অন্তঃসারশূন্যতা লক্ষ্য করেছেন। আলোচ্য উপন্যাস 'শেষপথ' [১৯৩৪] অনেকটা 'পরিণাম' উপন্যাসের মতই। এই উপন্যাসের ভৃত্য পুত্র গোপাল লেখাপড়া শিখে ভদ্রলোক হয়ে উঠেছিল কিন্তু সমাজ অর্থাৎ ভদ্রজন ভৃত্যপুত্রের এই ভদ্রলোক হওয়াটা কিছুতেই মেনে নিতে পারে নি, আর গোপালও তার ভদ্রলোক হওয়ার মর্যাদা রক্ষা করতে পারে নি। 'বাসনমাজা' দাসী-কন্যা শারদার হাত ধরে বৈষ্ণব ধর্মে উত্তরণ খুঁজেছে।

'শেষ পথ' নরেশচন্দ্রের একটি করুণ রসঘন উপন্যাস। সুদূর অতীতে যে দুটি বালক বালিকা আনন্দে হাত ধরে নদীর ধার দিয়ে হাঁটছিল আজও তারা তেমনি হাঁটছে, কিন্তু তারা এখন জীবনপথের পরিশ্রান্ত দুটি যাত্রী, ধরছে তাদের শেষ পথ, মাঝে শুধু যৌবনে সমাজের চাপে তারা হয়ে পড়েছিল বিচ্ছিন্ন। এখন পরিণত বয়সে তারা সমাজের সব বাধা অতিক্রম করে আবার মিলিত হতে পেরেছে। কিন্তু এই মিলনের মধ্যে পরিপূর্ণ শান্তি নেই তাই এই নিপীড়িত দুটি মানুষ ধর্মকে আশ্রয় করেছে, সমাজকে প্রতিবাদ করে আশ্রয় নিয়েছে পথে।

এই কাহিনীর নায়ক খানসামার ছেলে গোপাল বাঁচতে চেয়েছিল ভদ্রলোক হয়ে কিন্তু প্রতিবেশ তার এই ভদ্রবেশ ছিঁড়ে কেড়ে নিয়েছিল। সে রক্তমাংসের মানুষ তাই তার প্রেম ছিল দেহভিত্তিক তবু শারদা তাকে ভালবাসে শারদার মুখে এই কথাটুকু শুনে সে ফিরে গেছে। আর শারদা গোপালকে কামনা করলেও সমাজ ও ধর্মকে সে ভয় করেছে অথচ ধর্মের বাহকদের কাছেই তাকে লাঞ্ছিত হতে হয়েছে। দুটি প্রায় অশিক্ষিত গ্রাম্য চরিত্রের মধ্য দিয়ে লেখক দেখাতে চেয়েছেন যে এই সমাজে তাদের ভালভাবে বেঁচে থাকার উপায় নেই।

লেখক তাঁর এই উপন্যাসের মুখবন্ধে চাকর গোপালের উন্নতির জন্য ভদ্রলোকদের প্রতিক্রিয়া, ধর্মীয় আচারের মিথ্যাচার এবং কাহিনীতে বারবার স্বপ্ন অবতারণার কারণ বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে—'এই উপন্যাস বাস্তব জীবনের একটা চিত্র ও বাস্তব চিত্তের বিশ্লেষণ।' এই উপন্যাস পাঠে আমরা লেখকের সঙ্গে একমত না হয়ে পারি না, কেননা উপন্যাসটির কোথাও অবাস্তবতার স্পর্শ নেই।

'বেতারে বর' [১৯৩৪] উপন্যাসটির নামটি যেমন একটু অভিনব তেমনি উপন্যাসটির প্রধান চরিত্র দুটিও বিস্ময়কর। মানুষের জটিল রহস্যাবৃত অবচেতন মন সচেতন চিন্তাভাবনার গ্রহণ বর্জন করার কাজটিকে নিয়ন্ত্রণ করে যে বার বার তার রূপান্তর ঘটাতে পারে নায়িকার আচরণের মধ্যে নরেশচন্দ্র তা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন এবং উপন্যাসটির লঘু তরল বর্ণনা ভঙ্গীর মধ্যে বার বার দেখা দিয়েছে তাঁর সমাজ

সচেতন চিন্তা ভাবনা। আর্থিক বৈষম্য নরনারীর প্রেম ও বিবাহকেও যে কতটা নিয়ন্ত্রিত ও সীমিত করে তোলে এ সম্পর্কেও লেখকের মতামতটি অস্পষ্ট নয়।

আলোচ্য উপন্যাসে তিনি প্রেমের যে স্বরূপ দেখিয়েছেন তা সম্পূর্ণ দেহনির্ভর। এখানে নায়িকা নায়কের দেহ সৌষ্ঠব ও রূপ দেখেই তাকে কামনা করেছে এবং তার বিত্ত ও মনের পরিচয় পেয়েছে অনেক পরে। অবশ্য এই শেষোক্ত পরিচয় দুটি পেয়ে সে তার প্রেম সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়েছে। এবং তাদের মিলনও সম্ভব হয়েছে।

নরেশচন্দ্র তাঁর এক প্রবন্ধে লিখেছেন যে নবযুগের কথাসাহিত্যের চরিত্রগুলি প্রচলিত চরিত্র নয় আবার তারা 'টাইপ' চরিত্রও নয়। তারা প্রত্যেকেই এক একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী।[৭২] আলোচ্য উপন্যাসের চরিত্রগুলিও অনেকটা সেরকম। নারীর সংস্কারবশতঃ সতীত্বের যে বিধি এখানে নায়িকা লাবণ্য মেনে নিতে চেয়েছে তাও চিরচলিত প্রথানুসারে ঘটে নি, ঘটেছে তার আত্মস্বাতন্ত্র্যবোধ থেকে। এই উপন্যাসে ধর্মের প্রতি নায়িকার একান্ত অনুগতভাব আসলে ধর্ম ও সংস্কারের 'ট্যাবু'। নায়িকার সতী-সাবিত্রী-কমপ্লেক্স এর মূল কারণ তার সঞ্চিত সংস্কার যা 'সাইকো সাজেশনের' মত কাজ করেছে শচীনের চিঠিতে, কথায় এবং সতীত্বের প্রশংসায়।

এই উপন্যাসটির প্রধান ক্রটি ঘটনার আধিক্য ও নায়কের বিভিন্ন ছদ্মবেশ কল্পনা। এ দুটি ব্যাপারে সংযম রক্ষিত হলে উপন্যাসটি নিঃসন্দেহে আরও সুখপাঠ্য হত।

'নিষ্কণ্টক' [১৯৩৪] উপন্যাসটির কাহিনীতে লেখক মূলত নরনারীর মনস্তত্ত্ব নিয়েই আলোচনা করেছেন, যদিও তারা সমাজ দেশ কাল নিরপেক্ষ নরনারী নয়। জমিদারী শাসন পদ্ধতি ও শোষণ নীতির কথা এখানে তিনি তুলে না ধরলেও জমিদারী মেজাজ, চরিত্র ও আচরণ বর্ণনা করতে নরেশচন্দ্র কার্পণ্য করেন নি। কাহিনীর আখ্যান অংশ হচ্ছে পড়ন্ত জমিদারীর পটভূমিকায় দাম্পত্য সম্পর্ক ও সংঘর্ষ।

'নিষ্কণ্টক' উপন্যাস সম্পর্কে অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—'নিষ্কণ্টকে অলক ও অঞ্জলির দাম্পত্য বিরোধের কাহিনী মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের দিক দিয়া উল্লেখযোগ্য হইলেও উপন্যাসিক রসের দিক দিয়া ব্যর্থ হইয়াছে।

অঞ্জলির বালিকা-সুলভ সারল্য পরিজনের স্বার্থকতায় বিকৃত হইয়া কিরূপে কঠিন ঔদাসীন্যে রূপান্তরিত হইয়াছে, অলকের নির্দোষ প্রেম দীর্ঘ প্রতিকূলতায় ও প্রতিদানের অভাবে কিরূপ কলুষিত হইয়াছে—ইহার মনস্তত্ত্বমূলক পরিকল্পনা সুদক্ষ, কিন্তু রসসৃষ্টির দিক দিয়া চিত্রটি অক্ষমতার পরিচয় দেয়। কুন্তলার সহিত অলকের সম্পর্কটি সম্পূর্ণরূপেই অস্পষ্ট ও অস্বাভাবিক হইয়াছে।'[৭৩]

'বংশধর' [১৯৩৫] উপন্যাসটি অনেকটা আত্মজীবনীর ঢঙে বিবৃত। এই একই কৌশলে নরেশচন্দ্র একাধিক উপন্যাস রচনা করেছেন।[৭৪] আলোচ্য উপন্যাসের প্রধান পুরুষ মহেন্দ্রবাবুর জবানীতে উপন্যাসটি রচিত এবং তার স্মৃতিচারণার পথ ধরেই উপন্যাসটি এগিয়েছে তাই কাহিনীতে অনেক সময় পারম্পর্য রক্ষিত হয় নি।

এখানে মহেন্দ্রবাবু নিজেই প্রতিটি চরিত্রের কার্যকারণ ও মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেছেন এবং প্রসঙ্গত ঘটনার বর্ণনায় তাদের চরিত্রের বাস্তব রূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন।

এই উপন্যাসের মধ্য দিয়ে লেখক যে প্রশ্ন তুলে ধরেছেন তা হচ্ছে, বংশানুক্রম ও পরিবেশ এ দুটির মধ্যে কোনটি মানবচরিত্র গঠনের পক্ষে অধিক ক্রিয়াশীল। আর এই উপন্যাসে তিনি যে দ্বন্দ্ব দেখিয়েছেন তা হচ্ছে স্পর্দ্ধিত যৌবনের সঙ্গে প্রয়োজনের সীমাতিক্রান্ত বার্দ্ধক্যের সংঘাত।

মহেন্দ্রবাবু প্রায় চল্লিশ বছর ওকালতি করার পর অবসর নিয়েছিলেন প্রায় দশ বারো বছর কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে তিনি কেন আবার ওকালতি জীবনে ফিরে এলেন এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি যে আত্মজীবনী বলেছেন, সেই আত্মজীবনীই এই উপন্যাসের কাহিনী।

মহেন্দ্রবাবুর বাবা ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি ছেলেকে ডেপুটির চাকুরীতে বহাল করতে চেয়েছিলেন কিন্তু উদ্ধত যৌবনের দর্পে মহেন্দ্রবাবু এ চাকরী করতে অস্বীকার করে বলেছিলেন যে তিনি ইংরাজের গোলামি করবেন না। তিনি ওকালতি করতে শুরু করেন। এই ওকালতি ব্যবসায় দিনে দিনে মহেন্দ্রবাবুর যতই উন্নতি হতে থাকে ততই পিতার সঙ্গে পরোক্ষ প্রতিযোগিতায় জয় হচ্ছে ভেবে গর্বিত হতে থাকেন। তাঁর পিতা পুত্রের ব্যবহারে দুঃখ পেয়েছিলেন। ফলে বয়স ও দুঃখের মিলিত চাপে তাঁর সংযমের শক্তি ক্ষীণ ও বলহীন হয়ে পড়ে এবং নারীর আসঙ্গ লিপ্সায় তিনি মেতে ওঠেন। যার পরিণাম তাঁর উন্মাদ অবস্থায় মৃত্যু।

মহেন্দ্রবাবুর ধারণা ছিল যে তার স্ত্রী হবে a perfect woman nobly planned কিন্তু তার স্ত্রী সে আশা অপূর্ণ রাখেন। তার কাজে কর্মে এমন একটা সৌষ্ঠবের অভাব ছিল যে মহেন্দ্রবাবুকে সেটা সব সময় পীড়া দিত। আর মহেন্দ্রবাবু তার সেই আকাঙ্ক্ষিত সৌষ্ঠব খুঁজে পেলেন তাদের আশ্রিতা বিধবা প্রমীলার মধ্যে। মহেন্দ্রবাবুর স্ত্রীর চেষ্টায় প্রমীলা দূর হল কিন্তু মহেন্দ্রবাবুর মত্ত লালসা আশ্রয় করলো এক বাঈজীকে। চরিত্রের এই শিথিলতা তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন। আর সব চাইতে বাস্তব মহেন্দ্রবাবুর বড় ছেলের চরিত্রেও দেখা দিল এই একই ব্যাধি। কিন্তু মহেন্দ্রবাবু সেজন্য ছেলেকে শাসন করতে পারলেন না। আর একের পর এক চারিটি ছেলের কাছ থেকে আঘাত পেয়ে তিনি আশা করা ছেড়ে দিলেন। তাঁর মনে হল সংসারে তিনি সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। কিন্তু এসময় তাঁর বড় ছেলের বউ তার সাহায্য প্রার্থনা করে, ফলে তাকে আবার ফিরে আসতে হয়েছে তাঁর ছেড়ে যাওয়া ওকালতি জীবনে।

দুঃখের সঙ্গে আনন্দও মহেন্দ্রবাবু পেয়েছেন। তার মেজ পুত্রবধুর প্রতি তিনি কোন দিনই সন্তুষ্ট ছিলেন না। কলকাতায় আলাদা সংসার করেছিল তারা। মহেন্দ্রবাবুর মেজ ছেলে স্টেট স্কলারশিপ নিয়ে বিলাতে গিয়েছিল পড়তে, সেখানে পড়াশুনার সঙ্গে শিখে এসেছিল অত্যধিক মদ্যপান করতে। তারই ফলে অকালে সে যখন মারা যায় তখন বিধবা পুত্রবধূ মাধুরীর কোলে তিনটি সন্তান। মহেন্দ্রবাবুর তখন সুপ্রচুর আয়। তিনি এগিয়ে গিয়েছিলেন তাদের কাছে কিন্তু মাধুরী তার সেই স্নেহের দান নিতে

অস্বীকার করেছিল। পুত্রবধূর উপর অসন্তুষ্ট হয়ে মহেন্দ্রবাবু আর খোঁজ খবর নেন নি তাদের, কিন্তু পরে জানতে পেরেছেন যে তাঁর সেই নাতি নাতনীরা সত্যিই মানুষ হয়েছে। মহেন্দ্রবাবুর ধারণা হয়েছিল যে তিনি আর আশা করেন না কিন্তু তাঁর এই নাতিটি যখন বিজ্ঞানে এক নতুন আবিষ্কার করে বিশ্বজোড়া নাম করে মহেন্দ্রবাবুকে এই সুখবর জানায়, তখন সত্যিই তিনি অনুভব করেন যে আশা করা তিনি ছাড়তে পারেন নি তাই এই সংবাদে তাঁর এত আনন্দ।

আলোচ্য উপন্যাসের রচনা রীতির নতুনত্ব অস্বীকার করা যায় না। যদিও প্রতিটি চরিত্র আমরা লেখকের ইচ্ছানুসারে অনুধাবন করতে বাধ্য হই কিন্তু তবুও কোন চরিত্রই আমাদের অবাস্তব মনে হয় না।

'ভুলের ফসল' [১৯৩৬] উপন্যাসটির মধ্যে নরেশচন্দ্র প্রেম, প্রতিহিংসা ও ঈর্ষা মানুষকে কিভাবে বিপর্যস্ত করে তার জীবনকে অসার্থক ও অশান্তিময় করে তোলে মূলত সেই চিত্রই এঁকেছেন। তাঁর অন্যান্য উপন্যাসের মত উক্ত উপন্যাসেও সমাজ, মনস্তত্ত্ব ও মানসিক ব্যাধি, ব্যবসা ইত্যাদি বহু ঘটনা ও বিষয় উপন্যাসটির কাহিনীকে অহেতুক দীর্ঘ করে তুলেছে। কিন্তু ঈর্ষা সঞ্জাত সন্দেহ যে মানুষের মন থেকে কখনোই পুরোপুরি বিলুপ্ত হতে পারে না এই তথ্যটি তিনি অতি সুন্দরভাবে এই উপন্যাসে ব্যবহার করেছেন এবং এই তথ্যটিকে সত্য প্রতিপন্ন করার জন্যই চরিত্রগুলিকে বারবার মিথ্যা সন্দেহের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছেন।

'ভুলের ফসল' উপন্যাসটি ঘটনার আকস্মিকতার ভীড়ে রসোত্তীর্ণ হতে পারে নি। এই উপন্যাসের প্রায় প্রতিটি চরিত্রই অস্পষ্ট ও অবাস্তব। ইভার বাবা বৈজ্ঞানিক সুবিমল বাবুর মানসিক ব্যাধি, ইভার আত্মসমর্পণ, পাটনার পথে পালানো, পুলিশের গ্রেপ্তার এসব ঘটনাই যেন ঠিক উপন্যাসটির সঙ্গে খাপ খায় নি। তবু এ কাহিনীতে অশেষ, তার মামা ও উষার চরিত্রের মধ্যেই কিছুটা বাস্তবতার স্পর্শ আছে।

'রবীন মাস্টার' [১৯৩৬] নরেশচন্দ্রের একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। এই উপন্যাসে যদিও তিনি এক দরিদ্র গ্রাম্য স্কুল মাস্টারের জীবন আলেখ্য বর্ণনা করেছেন তবু এই উপন্যাসের মধ্যে তিনি এমন কতগুলি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়েছেন এবং সমস্যা তুলে ধরেছেন যার প্রয়োজন সম্পর্কে বর্তমান সমাজও উদাসীন থাকতে পারছে না। স্কুল শিক্ষক ও শিক্ষা সমস্যা, জমিদার ও প্রজা সমস্যা ও জমি বিলি বণ্টন ব্যবস্থা সম্পর্কে উপন্যাসে বর্ণিত সমস্যা আজও আমাদের সমস্যা। তাই উপন্যাসটির বর্ণিত কালের সঙ্গে আজকের দিনের বহু দিকে পার্থক্য থাকলেও তা পুরোপুরি কালের সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকে নি। আমাদের দেশে এমন অনেক 'রবীন মাস্টার' ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন, কিন্তু বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় ও শিক্ষা-ব্যবস্থায় তার মূল্য কতটুকু? তাই গ্রন্থের শেষে লেখকের একটা করুণাঘন দুঃখবোধ পাঠকের মনকে ভারাক্রান্ত করে তোলে সত্য কিন্তু ভাবপ্রবণ আবিলতার মধ্যে হারিয়ে যায় না, বরঞ্চ এই সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করে তোলে।

নরেশচন্দ্রের এই উপন্যাস সৃষ্টির উদ্দেশ্য কেবলমাত্র রস সৃষ্টি নয় তার চেয়ে অনেক গভীরে তাই এই উপন্যাসের উৎসর্গ পত্রে তিনি সে আভাস দিয়েছেন, তিনি লিখেছেন—

'প্রবক্তার তীব্র সত্যদৃষ্টি লাভ করিয়া যাঁহারা সত্য জানিবার ও বলিবার স্পর্দ্ধার জন্য অজ্ঞ স্থূলদর্শী সমাজের কাছে অবজ্ঞা অবহেলা উপহাস ও লাঞ্ছনা লাভ করিয়া অগৌরবে সমাধি লাভ করিয়াছেন সেই সকল মহাবীরের পবিত্র স্মৃতি মন্দিরে এই তুচ্ছ উপহার দিলাম।' নরেশচন্দ্র অভিজ্ঞ লেখক তিনি সহজেই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে যথার্থ সত্যের অনুসন্ধান সমাজ চায় না এবং সমাজ পরিবর্তনের কথায় তারা স্বভাবত ভীত হয়ে পরে তাই তারা সর্বশক্তি দিয়ে ব্যাপারটাকে বেঁধে রাখতে চায়, চাপা দিতে চায়, তাঁদের সম্পূর্ণ পরাস্ত করে সমাজে দৃষ্টান্ত তৈরী করে রাখতে চায়। কিন্তু সচেতন মানুষের প্রশ্নকে দূর করতে পারে না।

গ্রামের সবাই চেনে রবীন মাস্টারকে। ত্রিশ বছর আগে বি. এ. ফেল করে সে গোটাদশেক ছাত্র জুটিয়ে গড়ে ছিল একটা মাইনর স্কুল। জমিদার ভুবনবাবুর সাহায্যে আজ সেই স্কুল হয়েছে "ভুবনমোহন হাইস্কুল"। স্কুল ইন্‌স্পেক্টরের লম্বা ফর্দ অনুযায়ী একজন এম. এ পাশ হেডমাস্টার, একজন বি. এ পাশ সেকেণ্ড মাস্টার ও রবীন হল থার্ড মাস্টার এবং বেতন সেই ত্রিশ টাকা। যদিও রবীনের চেষ্টায়ই 'ভুবনমোহন স্কুলের' সব কিছু। স্কুলের খাতায় রবীন থার্ড মাস্টার হলেও সেই ছাত্র জুটিয়ে আনে, চাঁদা ভিক্ষা করে, বই জোগাড় করে, ইন্‌স্পেক্টরের কাছে দরবার করে এবং স্কুলের পর ছেলেদের বাড়িতে নিয়ে এসেও পড়ায়। এইসব করে রবীন যতটুকু সময় পায় শুধু বই পড়ে। বলতে গেলে পড়া আর পড়ানোই রবীনের কাজ।

ইতিমধ্যে রবীন বিয়ে করেছিল নিস্তারিণীকে। নিস্তারিণী অতি সাধারণ বাঙালী মেয়ে, রবীনের এই পড়াশুনার ঝোঁক ও অজস্র বই দেখে সে কিছুতেই এর প্রয়োজন বুঝতে পারে নি, বিশেষত সে যখন নিজে দেখে এসেছে যে স্বয়ং এম.এ পাশ হেডমাস্টারের বাড়ীতেও পাঁচটার বেশী বই নেই। এসব কারণে নিস্তারিণী প্রায় সব সময় রবীনকে নানারকম কথা শোনাত এবং ছেলে ধরা ইত্যাদি সংসারের বহু কাজ রবীনকে দিয়ে করিয়ে নিত। রবীন বাড়ীতেও তাই খুব একটা শান্তি পেত না। তার স্কুলেই ছিল কিছুটা শান্তি। কিন্তু ঐ শান্তিতেও ব্যাঘাত ঘটলো। স্কুলের হেডমাস্টার কিছুতেই রবীনকে সহ্য করতে পারতেন না এবং রবীনের প্রতিটি কাজ নিয়েই অভিযোগ করতেন। আসলে রবীন স্কুলের নিয়মকানুন বড় একটা মানত না। অঙ্কের ক্লাসের একটি ছাত্রকে নিয়ে হয়ত সে বসিয়ে দিত ইংরাজীর ক্লাসে, কেননা তার মত ছিল যে, যে বিষয়ে দুর্বল তাকে সেটাই বেশী করে পড়ানো উচিত। আর স্কুলের বই ও ম্যাপ সে অনায়াসে বাড়ী নিয়ে গিয়ে ছাত্রদের পড়াত। শেষ পর্যন্ত হেড মাস্টারের তর্জন-গর্জনে সুবোধ বালকের মত রবীন স্কুলের নিয়মে পড়াতে লাগলো ইতিহাস আর স্বাস্থ্যবিদ্যা।

রবীনের আর একটা বাতিক ছিল ছুটিতে কলকাতার বড় লাইব্রেরীতে গিয়ে বই পড়া অথবা কলেজ ষ্ট্রীট পাড়ার পুরোনো বইএর দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বই পড়া।

একদিন এরকম একটা দোকান থেকে সে কিনে ফেললো 'কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টো'। এই বই থেকে সে পড়ে হজম করে ফেললো মার্ক্সের মানব সমাজ ও পরিণতি সম্পর্কে লেখা ইতিহাস। সেখানে 'তিনি দেখিয়েছেন যে যুগে যুগে লোকে ক্ষুধার তাড়নায় কেমন করে দলাদলি করে লড়াই করতে করতে সমাজ গঠনের প্রণালী সৃষ্টি ও পরিবর্তন করেছে' [পৃঃ ১৯] এই বই পড়ে 'রবীন মনে মনে মার্ক্সের ধারানুসারে ভারতের ইতিহাস ও তার বিবর্তন সম্পর্কে একটা খসড়া গড়ে ফেললো এবং ক্লাসে গিয়ে ছাত্রদের বোঝাতে আরম্ভ করলো তার এই বিবর্তনবাদ।' [পৃঃ ২০] এইজন্য হেডমাস্টারের কাছে রবীনকে আবার গালমন্দ খেতে হল আর রবীন মাস্টারও এই ভাবে ইতিহাস পড়ানো বন্ধ করলো। রবীন সম্পর্কে অনেকেরই ধারণা হল যে সে পাগল এবং তাই সে ঠাকুর দেবতা মানে না আর আর্য জাতি সম্পর্কে বলে 'শশবিষাণ', 'বন্ধ্যাপুত্র'।

এর পর রবীনমাস্টার জমির বিলি ব্যবস্থা চাষবাস ইত্যাদি নিয়ে একটা স্কীম তৈরী করে কৃষক চাষী, জমিদার সবাইকে তার সেই স্কীম বোঝাতে শুরু করলো, ফলে গ্রামসুদ্ধ লোকের চোখে সে হয়ে উঠলো পুরোপুরি পাগল। শেষ পর্যন্ত স্কুলের সেক্রেটারী ভুবনবাবুর কাছে সেই স্কীম জমা রেখে সে পরিত্রাণ পেল। আর নিজস্ব পদ্ধতিতে চাষবাস করেও তার নিজের ফলন ভাল হলনা দেখে রবীন মাস্টার চাষবাস করা থেকেও বিরত হল।

একদিন ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরীতে রবীনের দেখা হয়ে গেল তার এক পুরোনো ছাত্রী তড়িতের সঙ্গে। ঢাকায় রবীন যখন বি. এ. পড়ে তখন সে তড়িৎকে পড়াত। তড়িৎ ভালবেসেছিল রবীনকে কিন্তু সেকথা মুখে প্রকাশ করতে পারে নি। রবীন ঢাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার পর অজস্র চিঠিতে তার ভালবাসার কথা জানিয়েছে রবীনকে, তাকে একান্ত অনুরোধ করেছে বিয়ে করার জন্য কিন্তু রবীন দারিদ্র্যের বোঝা কাঁধে নিয়ে সে দায়িত্ব নিতে পারে নি, কষ্ট দিতে চায় নি তড়িৎকে তার গরীবের সংসারে নিয়ে এসে। তবু তড়িতের ভালবাসা ম্লান হয়ে যায় নি, রবীনের অনুমতি নিয়েই সে সুকেশকে বিয়ে করেছে। তারপর দীর্ঘদিন ঠিকানা অভাবে রবীনের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল না। তড়িৎ জোর করে রবীনকে নিয়ে যায় তার বাড়ী এবং জানায় যে ছুটিতে তারা কলকাতায় এসেছে, বর্তমানে সে ও সুকেশ দিল্লীর একটা কলেজে পড়ায়। তড়িতের তত্ত্বাবধানে রবীনকে চুলদাড়ি কেটে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠতে হয় এবং এই পরিচ্ছন্ন পোষাকেই সে গ্রামে ফিরে আসে তড়িতের দুদিনের স্নেহ ভালবাসায় ধন্য হয়ে।

রবীনের এই বেশ দেখে নিস্তারিণী সহজেই বুঝতে পেরেছে যে রবীনের সঙ্গে তড়িতের দেখা হয়েছে এবং এই দেখা সাক্ষাৎ করার জন্যই রবীন প্রতি ছুটিতে কলকাতায় যায়। ফলে নিস্তারিণী রবীনকে তড়িতের ঘটনা নিয়ে যাচ্ছেতাই বলতে থাকে এবং রবীনকে সব অভিযোগ চুপ করে শুনতে হয়। তড়িৎকে নিস্তারিণী দেখে নি। তাদের বিয়ের পর নিজের আদর্শের বশবর্তী হয়ে রবীনই নিস্তারিণীকে বলেছিল তড়িতের গল্প।

এবার রবীন মার্ক্সের আদর্শে লিখতে শুরু করে 'বাংলাদেশের অর্থনীতির গোড়াপত্তন পুনর্বিন্যাস'। আর তার এই বই লেখার ঘটনা নিয়ে শিক্ষক মহলে চলে হাসি ঠাট্টা।

একদা ক্লাসে সে চেষ্টা করেছিল ভারতের ইতিহাসের বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা করতে, স্কুল কর্তৃপক্ষের চাপে তার সে চেষ্টা সফল হয় নি। তারপর মার্ক্সের 'ক্যাপিটাল' পড়ে সে চেষ্টা করেছিল সেই আদর্শে একটা স্কীম তৈরী করে গ্রামে তা প্রয়োগ করতে, ফলে সে গ্রামের সবার কাছেই পেয়েছিল অবজ্ঞা আর অবহেলা। লোকে ভেবেছিল তাকে পাগল। তাই তার এই বই এর সংক্ষিপ্তসার ও একটা পরিচ্ছেদ শেষ হলে সে ভেবেছিল কোন সমঝদার লোককে পড়িয়ে নেবে।

এই সময় স্কুলের সেক্রেটারি জমিদার ভুবনবাবু হঠাৎ মারা গেলেন। ভুবনবাবু মারা যাওয়ায় রবীন কেমন জানি আনমনা ও বিমর্ষ হয়ে পড়ে। এই গ্রামে ভদ্রসমাজে একমাত্র ভুবনবাবুই রবীনকে বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি জানতেন যে রবীন না থাকলে এখানে কোনদিনই হাইস্কুল করা সম্ভব হত না। তাই হেডমাস্টার যখন রবীনকে পাগল আখ্যা দিয়ে স্কুল থেকে বিতাড়িত করতে চেয়েছিল তখন ভুবনবাবু বলেছিলেন যে 'রবীন মাস্টারের স্কুল' থেকে রবীনকেই তাড়ানো হতে পারে না। ভুবনবাবু উইলে রবীনকে করেছিলেন স্কুল সম্পত্তির 'একসিকিউটর' এবং উইলে নির্দেশ ছিল যে রবীন জনহিতকর কাজে ব্যয় করার জন্য প্রতি তিনমাস অন্তর পাঁচশ করে টাকা পাবে আর তাঁর সম্পত্তির অর্দ্ধেক পাবে তাঁর বড়ছেলে যোগেশ। ভুবনবাবু রবীনকে তাঁর এই উইলের কথা বলেছিলেন। ভুবনবাবুর মৃত্যুর পর রবীনের কথাবার্তা নিস্তারিণীর আরও অসংলগ্ন মনে হলো। গ্রামের কবিরাজ মশাই রবীনের কুপিত বায়ু রোগের চিকিৎসা শুরু করলেন এবং নিস্তারিণীকে পরামর্শ দিলেন রবীনকে বেশী করে আদর যত্ন করার।

একদিন স্কুলে রবীন সুরেশের টেলিগ্রামে সংবাদ পায় যে 'তড়িৎ মৃত্যু শয্যায়, রবীনকে একবার দেখতে চায়।' রবীন সংবাদ পেয়েই ছুটে গেল দিল্লীতে, স্কুল বা নিস্তারিণীকে জানিয়ে যাওয়ার সময় তার ছিল না। সেখানে রবীন দেখতে পেল তড়িৎ শুয়ে আছে চিরনিদ্রায়। তড়িতের শেষ কাজ সেরে উদাস হতাশ হৃদয়ে রবীনমাস্টার বাড়ী ফিরে এল…'মনের ভিতর আগুন জ্বলছিল তার, চোখ দুটি হয়েছিল মরুভূমির মত শুকনো জ্বালাময়।' [পৃঃ ১৮১]

এদিকে রবীনমাস্টার স্কুলে না জানিয়ে চলে যাওয়াতে, হেডমাস্টার নোটিশ দিলেন যে রবীন যদি পরের দিন স্কুলে যোগ না দেয় তবে তাকে ডিস্‌মিস্‌ করা হবে। নিস্তারিণী এই নোটিসের মর্ম বুঝতে পেরে হেড মাস্টারের সঙ্গে তুমুল ঝগড়া করে কিন্তু, কোন ফল হয় না। বাধ্য হয়ে সে রবীনমাস্টারের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। স্কুলের হেডমাস্টার রবীনকে কিছুতেই সহ্য করতে পারতেন না, তাই এ সুযোগে তিনি রবীনকে তাড়াতে চেয়েছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন যে ভুবনবাবু জীবিত নেই এবং যোগেশ নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে তাকে সমর্থন করবে। কিন্তু যোগেশ হেড মাস্টারের সঙ্গে একমত হতে পারে না কেননা মুখে সে যাই বলুক না কেন মনে মনে সে রবীন মাস্টারকে শ্রদ্ধা না করে পারে নি। তার বাবার উইল অনুসারে রবীন স্কুল সম্পত্তির একসিকিউটর এবং সে খবর রবীন জেনেও

কোন দিন এই বিষয় সংক্রান্ত ব্যাপারে নিজের আইনানুগ ক্ষমতা প্রয়োগ করে নি। দ্বিতীয়ত সে নিজে রবীনের ছাত্র এবং শিক্ষক হিসাবে রবীনের যে আদর্শের পরিচয় সে পেয়েছে তা সে ভুলতে পারে নি। এই সব কারণে সে হেড মাস্টারের সঙ্গে একমত হতে পারে নি এবং রবীনের চাকরীও যায় নি। যদিও নিস্তারিণী তা জানতে পারে নি।

নিস্তারিণীর মুখে রবীন যখন শুনলো যে হেড মাস্টার তাকে স্কুল থেকে ডিসমিস করেছে সে তখন শুধু নির্লিপ্ত ভাবে বললো 'যাক'।

'যাক মানে?' নিস্তারিণী অবাক হয়ে গেল। তারপর এই চাকরী যাওয়ার কারণ তড়িৎ ভেবে তড়িৎকে গালাগালি দিতে শুরু করলো—'সে হারামজাদী কি তোমায় বসিয়ে খাওয়াবে? ডাইনির চোখ পড়েছে বুড়ো বয়সে। পোড়ারমুখি মরে না, যম কি তাকে ভুলে রয়েছে?' নিস্তারিণীর মুখে এসব গালাগালি শুনে রবীন শান্ত কণ্ঠে বলেছে—'না ভোলেনি। সে মরেছে, তোমার কথা শুনেছে যম।' [পৃঃ ১৮৫] রবীনের মুখে তড়িতের নিদারুণ সত্য মৃত্যুর খবর পেয়ে থমকে যায় নিস্তারিণী আর লজ্জায় অভিভূত হয়ে যখন শুনতে পায় যে মৃত্যুর পূর্বক্ষণে রবীন তাকে দেখতে পায় নি তখন 'চোখ দিয়ে তার জল গড়িয়ে পড়লো, আঁচল দিয়ে সে চোখ মুছতে লাগলো।' [পৃঃ ১৮৭] তড়িতের মৃত্যুর পর এসে রবীন আর স্কুলে যেতে চায় নি কিন্তু যোগেশের অনুরোধে বাধ্য হয়ে 'প্রাণহীন শবের মত রবীন তার ভাঙা দেহ টেনে স্কুলে যাওয়া আসা করতে লাগলো।' [পৃঃ ১৮৯]

তড়িৎ মৃত্যুর আগে রবীনকে দিয়ে যেতে চেয়েছিল তার একরাশ বই। রবীন সুকেশকে চিঠিতে লিখেছিল আমাকে আর ওসব পাঠিয়ে ব্যথা দেবেন না কিন্তু সেই চিঠি পৌঁছানোর আগেই রবীনদের জাহাজ ঘাটায় এসে পড়ে সুকেশের পাঠানো বই ও আলমারী। ব্যস্ত হয়ে রবীন যত্ন করে সেসব বই গুছিয়ে রেখে দিল বাড়ীতে। এরপর রবীন যোগেশের কাছ থেকে জোগাড় করলো পাঠাগার করার জন্য কিছুটা জমি এবং যোগেশ সেই সঙ্গে রবীনকে প্রতিশ্রুতি দিল বছরে চারশ টাকা অনুদান দেবার। ধীরে ধীরে লাইব্রেরীর জন্য বাড়ী উঠতে লাগল সুকেশের পাঠানো তড়িতের কম্পানির কাগজের টাকায়।

এসময় রবীনদের গ্রামে এক সমস্যা দেখা দিল। কয়েক বছর ফলন ভাল না হওয়াতে চাষীরা ক্ষেপে উঠেছিল, তার মধ্যে এক মৌলবী এসে তাদের বোঝাল ফসলের দাম যখন কমে গেছে, তখন জমিদার মহাজন দাবী করতে পারে না তাদের সাবেক টাকা। 'চাষীরা যদি দল বেঁধে বলে, পাবে না তোমরা খাজনা পাবে না তোমাদের কর্জা টাকা সাধ্য কি জমিদার মহাজনেরা যে টাকা আদায় করেন? তার সঙ্গে কৃষকরাও সুর মিলিয়ে বললো ভগবানের জমি চাষ করি আমরা তার জন্য খাজনা দেব কাকে? তারপর খবর এলো যে, ছোকরা চাষীদের মধ্যে জটলা হচ্ছে, তারা মহাজনের বাড়ি চড়াও করে সব তমসুক লুটে নেবে। জমিদার মহাজনেরা এবং হিন্দুরা সবাই চঞ্চল হয়ে উঠলো।' [পৃঃ ২০৬]

এই ব্যাপারে গ্রামের সবার ধারণা হল যে রবীন মাস্টারই চাষীদের বুদ্ধিদাতা যদিও রবীন তখন তার পরিকল্পিত লাইব্রেরী নিয়ে ব্যস্ত ছিল। সবাই ছুটে এল রবীন মাস্টারের কাছে। রবীন সব কথা শুনে বলল যে 'এজন্য আপনারা মিছিমিছি আমার কাছে এসেছেন, আমি আপনাদের কোন কাজেই লাগবো না।' যতীশ চৌধুরী রবীনকে বললেন 'কিন্তু বলতে গেলে আপনিই তো ওদের শিখিয়েছেন যে জমিদার মহাজনরা যে টাকা নেয়, সেটা অন্যায়।' রবীন উত্তর করে যে 'আমি যদিও ওদের সেকথা বলি নি তবু বলে থাকলে সত্য কথাই বলেছি। কেননা এটা তো সহজ, সাদা কথা যে মাটি অমনি জন্মায়—জমিদার তাকে তৈরী করে না, সেই মাটিতে কাজ করে চাষী যে ধন উৎপন্ন করে, তাতে ভাগ বসাবার আপনারা কে? সমাজের একটা প্রাচীন সংস্কার ছাড়া আপনাদের অধিকার সম্বন্ধে বলবার তো কোন কথাই নেই।' [পৃঃ ২১০] রবীন তাদের আরও বুঝিয়ে দিলে যে সঞ্চয় করাটা অন্যায় কেননা অপরকে খাটিয়ে তা অর্জন করা। তারা চলে গেলে চাষীরা এল দল বেঁধে রবীনের কাছে, রবীন বড় বড় মহাজনদের জোটের বিরুদ্ধে তাদের কোন উপকারই করতে পারলো না। অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হয়ে উঠলো। এই ব্যাপারকে মোকাবেলা করতে মহকুমা থেকে এল সাবডিভিসন্যাল অফিসার। তিনি এসে সর্বত্র শুনতে পেলেন এই রবীন মাস্টারের নাম। তার নামে অভিযোগ, সেইই নাকি এসব বাজে খেয়াল ঢুকিয়েছে চাষীদের মাথায়। এই অফিসার রবীন মাস্টারকে ডেকে পাঠালেন। রবীনের সঙ্গে আলাপ করে কিন্তু তার ধারণা পালটে গেল। অফিসার শেষ পর্যন্ত রবীনকেই অনুরোধ করলেন এ সমস্যা সমাধানের যোগ্য একটা স্কীম করে দেওয়ার জন্য আর রবীনও উৎসাহিত হয়ে তাঁকে সে প্রতিশ্রুতি দেয়। এসময় রবীন স্কুল ইন্‌স্পেক্টর ব্ল্যাক সাহেবের সুপারিশে ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরীতে দুশো টাকা বেতনের এক চাকরীর নিয়োগ-পত্র পেল। এতখানি সফলতা জীবনে সে কোন দিন আশা করে নি। আনন্দের সঙ্গে সে অনুভব করলো এক গাঢ় বেদনা, তড়িতের জন্য। তারপর তার সেই পরিকল্পিত লাইব্রেরী, তড়িতের স্মৃতি মন্দিরের অসমাপ্ত ছাদে ঘুরতে ঘুরতে চাঁদের আবছা আলোয় ভুল করে রবীন পা ফেললো সিড়ির জন্য যেখানে ফাঁক রাখা ছিল তার মধ্যে। পরের দিন পাওয়া গেল রবীন মাস্টারের প্রাণহীন দেহ।

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের উপন্যাস সম্পর্কে একটা সাধারণ মন্তব্য আছে যে তাঁর উপন্যাস তথ্য ও তত্ত্বের ভারে ভারাক্রান্ত থাকায় পাঠকের মনে রস সঞ্চারে বিঘ্ন ঘটায়। আলোচ্য উপন্যাস 'রবীনমাস্টার' কিন্তু এই মন্তব্যের সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। এই উপন্যাসে যদিও লেখক বার বার ব্যবহার করেছেন কার্ল মার্কসের আদর্শ, তাঁর অর্থনীতি, সমাজ ও জমি সংক্রান্ত চিন্তা ভাবনা কিন্তু তা কখনো গল্পের গতিকে শ্লথ করে নি বরঞ্চ রবীন মাস্টারের চরিত্রকে আমাদের কাছে আরও জীবন্ত করে তুলেছে।

বাস্তবধর্মী লেখক রবীনকে টাইপ চরিত্র হিসাবে দেখিয়েছেন অর্থাৎ সে একটি আদর্শের বাহক, কিন্তু তিনি এই সঙ্গে দেখিয়েছেন যে মূলত রবীন মাস্টার তাত্ত্বিক তাই

তত্ত্বকে প্রয়োগ করতে গিয়ে সে বার বার বিফল হয়েছে আর সমাজ ব্যবস্থার মূল কাঠামোর পরিবর্তন ছাড়া তা সম্ভবও না। আর আমাদের এই সমাজ ব্যবস্থায় কোন সমস্যারই সহজ মুশকিল আসান সমাধান নেই। তাই রবীন মাস্টারও বেঁচে থাকতে পারে না কিন্তু বাঁচিয়ে রাখতে পারে তার আদর্শকে, সৎ প্রচেষ্টাকে, আপোষহীন সংগ্রামের মধ্যে।

'পিছল পথের শেষে' [১৯৩৭] উপন্যাসটিতে নরেশচন্দ্র আধুনিক পটভূমিতে নারী সম্পর্কে মনুর মতামতকে অস্বীকার করেছেন। উপন্যাসটির পাণ্ডুলিপি অবস্থায় নাম ছিল 'মনুর বিচার'। এই কাহিনীকালে আমাদের নারী সমাজ যথেষ্ট শিক্ষা ও স্বাধীনতা লাভ করেছে এবং অনেকে সম্মানজনক বৃত্তিতে যোগ দিয়েছে। কিন্তু তবু আমাদের সংস্কার আচ্ছন্ন ক্ষুদ্র সমাজ ও সংসারের কাছে তারা যোগ্য মূল্য পায় নি।

আলোচ্য কাহিনীর শিক্ষয়িত্রী নায়িকা নিজের দায় দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিতে সমর্থ হলেও, ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে বন্দী নারীর চেয়ে সমাজ তাকে অধিক সম্মান দিতে পারে নি। প্রতিটি পদক্ষেপেই তাকে নানা কুটিল প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে তার হৃত সম্মান ফিরে পেয়েছে স্ত্রীর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে। কেননা আমাদের সমাজে এখনও নারী তার পূর্ণ মর্যাদা পায় বিবাহে। যদিও এখানে নায়িকা তার আত্মসম্মান বজায় রেখেই বিয়ে করেছে।

এই উপন্যাসে লেখক মেয়েদের বিয়ের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেই বক্তব্য রেখেছেন। তবে সে বিয়ে, মনুর অনুশাসন অনুযায়ী নয়, নারীর আত্মসম্মান ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে। সুজাতা রক্ত মাংসের যুবতী, ছাত্রী পড়ানো ও সংসারের কাজের মধ্যে কর্তব্য পালনের তুষ্টি ছাড়া অন্য কোন আনন্দের সন্ধান পায় নি। তাই যখনই সে চিন্তা ভাবনার সময় পেয়েছে তখনই সে এই মুক্তিবিহীন, আশাশূন্য, আনন্দহীন দীর্ঘ জীবন অতিক্রম করার পথ শ্রান্তির কথা অনুমান করে ব্যথিত হয়েছে, মা ভাই বোনের সেবার আদর্শ নিয়ে নিজের সুখ আকাঙ্ক্ষাকে চিরতরে রুদ্ধ করতে পারে নি। মনে মনে সে বারবার কামনা করেছে প্রেম, কামনা করেছে সংসার। এই সমস্ত চিন্তা-ভাবনার বশবর্তী হয়েই সে তার রূপমুগ্ধ যুবকদের সখ্য ও সান্নিধ্য সহ্য করেছে কিন্তু এর অস্বাভাবিকতার কথা ভেবে তার মনে জেগেছে অপরাধবোধ। সে অনায়াসে সেজন্য দায়ী করেছে তার মা সাবিত্রীকে ও তাদের দারিদ্র্যের সংসারকে। যদিও এই অপরাধবোধই তাকে ফিরিয়ে এনেছে পিছল পথের গহ্বর থেকে।

'খেয়ালের খেসারত' [১৯৩৭] উপন্যাসে লেখক এক অতিমাত্রায় রোমান্টিক যুবকের কাহিনী উপস্থাপিত করেছেন। সমাজের বিধি ও নিষেধ যদিও কতগুলি প্রাচীন সংস্কার তবুও মানুষ সেই সংস্কারের হাত থেকে মুক্তি পেতে পারে না। যেহেতু সমাজকে বেঁধে রেখেছে অসম অর্থনৈতিক অবস্থা। প্রসঙ্গত তিনি এই কাহিনীতে দেখিয়েছেন ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলন, মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক, কারখানার দুর্নীতি, স্বজনপোষণ এবং কর্মদক্ষতার মূল্যহীনতা।

ধনী যুবক মণিলাল ভালবেসে বিয়ে করতে চেয়েছিল পাশের বাড়ীর ভিন্ন জাতের মেয়ে আশাকে। কিন্তু মণিলালের পিতা এ ব্যাপারে আপত্তি করে মণিলালকে জানিয়ে দেন যে এ বিয়ে করলে তিনি তাকে ত্যাগ করবেন আর মণিলালও তার ভালবাসার বিনিময়ে পিতার বিরাট সম্পত্তির মায়া ছেড়ে গৃহত্যাগ করে এবং ছাত্র পড়িয়ে মেসের খরচ চালাতে থাকে। কিছুদিন পর মণিলাল যখন আশার পিতার কাছে আশাকে বিয়ে করার প্রস্তাব নিয়ে যায় তখন সে দেখতে পায় যে আশা অন্যত্র বিয়ে করে শ্বশুর বাড়ী চলেছে। দুঃখিত ক্ষুব্ধ মণিলাল জেদের বশবর্তী হয়ে দুদিনের মধ্যেই বিয়ে করে ফেলে এক বিধবা যুবতীকে আর অতি অল্প বেতনে এক সদাগরী অফিসে কেরানীর চাকরী নিয়ে দিন কাটাতে থাকে। কিন্তু চিরকাল ধনী গৃহে প্রাচুর্য ও বিলাসিতার মধ্যে মানুষ মণিলালের প্রতিটি পদক্ষেপেই জীবনকে দুর্বিষহ মনে হয়। তার মনে হয় যে এই যন্ত্রণার মূর্তিমতী প্রতীক হচ্ছে তার স্ত্রী অন্নপূর্ণা, তাই সে কখনোই অন্নপূর্ণাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিতে পারেনি।

অন্নপূর্ণা স্বামীর এই ব্যবহারের মধ্যে কোন দোষ দেখতে পায়নি, তার কেবলই মনে হত যে স্বামীর এই দুর্দশার জন্য সেই দায়ী আর এই অপরাধবোধ তাকে সব সময়ই সংকুচিত করে তুলেছে। যদিও সে জানত না যে মণিলাল কত ধনী পরিবারের ছেলে। তারপর একদিন যখন সে মণিলালের সঙ্গে রাস্তা থেকে মণিলালদের বাড়ী দেখে এল তখন নিশ্চিত হয়ে বুঝতে পারলো মণিলালের যন্ত্রণার কারণ। মনে মনে সে ঠিক করে যেমন করেই হোক মণিলালকে তার নিজের বাড়ীতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আর সে এও অনুভব করলো যে বর্তমানে মণিলালের বাড়ী ফিরে যাওয়ার একমাত্র অন্তরায় সে নিজে অথচ তার পক্ষে মণিলালকে চিরতরে ত্যাগ করা সম্ভব নয়। এসব সাত পাঁচ ভেবে সে একদিন গৃহত্যাগ করে ঝি-র পরিচয়ে আশ্রয় নিল মণিলালের পিতৃগৃহে।

এদিকে মণিলাল অন্যায়ের প্রতিবাদে চাকরীতে ইস্তফা দেয়, সে তখন ট্রেড-ইউনিয়নের একজন বিশিষ্ট কর্মী। ইতিমধ্যে তার পিতার মৃত্যু হয়েছে এবং মণিলাল প্রোবেট নিয়ে পিতার ব্যবসা ও সম্পত্তি দেখাশোনা করতে শুরু করে এবং শ্রমিক ইউনিয়নকে প্রচুর টাকা চাঁদা দিয়ে দেয় কিন্তু তাদের মিছিলে পা মেলাতে পারে না। এই সব কাজের মধ্যে মণিলাল নিজেকে ব্যস্ত রাখলেও সে অন্নপূর্ণাকে কিছুতেই ভুলতে পারে না। তাই সে প্রতি রাতে তাদের সেই দৈন্যভরা একতলা ভাড়াটে বাড়ীতে গিয়ে অন্নপূর্ণার ফিরে আসার জন্য প্রতীক্ষা করে এবং অন্নপূর্ণার স্মৃতি বিজড়িত ঘরে রাত কাটায়। তারপর একদিন নাটকীয়ভাবে অন্নপূর্ণার সঙ্গে মণিলালের পুনর্মিলন হয়, অন্নপূর্ণা তখন তার সন্তানের মা হতে চলেছে।

আলোচ্য উপন্যাসের চরিত্রগুলির মধ্যে বাস্তবতার অভাব দেখা যায়। মণিলালের পিতা এবং অন্নপূর্ণার চরিত্র কিছুটা বাস্তব, তবে অন্নপূর্ণার গৃহত্যাগ করে ঝি-র পরিচয়ে

শ্বশুর বাড়ী আশ্রয় নেওয়ার কার্য কারণ বিশ্লেষণ করার অবকাশ থাকলেও উপন্যাসে তা অনুপস্থিত, ফলে ঘটনাটিকে অবাস্তব ও আকস্মিক মনে হয়।

নরেশচন্দ্র শ্রেণী-সচেতন লেখক। তার রচিত 'পরিণাম' [১৯৩৩] ও 'শেষ পথ' [১৯৩৪] উপন্যাসে এই পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আলোচ্য উপন্যাসেও মণিলালের চরিত্র বর্ণনায় শ্রেণী সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। মণিলাল তার কর্মক্ষেত্রে সব সময়ই নিজেকে স্বতন্ত্র মনে করেছে, শ্রমিক আন্দোলনেও সে তার এই স্বাতন্ত্র্যবোধ বজায় রেখেছে এবং অন্নপূর্ণার সঙ্গে তার ব্যবহারও এই একই মানসিকতা থেকে উৎপন্ন, সে মানসিকতা শ্রেণীসচেতন উচ্চবিত্তের মানসিকতা।

'ললিতের ওকালতি' [১৯৩৯] উপন্যাসটির দুটি সংস্করণ হয় এবং হিন্দিতে একটি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসে লেখক দেখিয়েছেন যে মানুষের মগ্নচৈতন্য প্রতিবেশ পরিবেশের প্রভাবের ফলে কিভাবে সচেতন বুদ্ধিবৃত্তিকে স্তব্ধ করে ক্রমশঃ পরিবর্তিত হয় এবং জীবন ও সংসারকে অশান্তিময় করে তোলে। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত অন্যত্র মন্তব্য করেছেন যে 'মানুষের স্বাভাবিক ঝোঁক অন্যায়ের দিকে।' আলোচ্য উপন্যাসের মধ্যেও এই বিষয়টি দুর্লক্ষ্য নয়। মানুষের জীবনে যেমন আদর্শ থাকে তেমনি আদর্শহীনতাও থাকে, আবার মানসিক জটিলতার বলি হয়ে মানুষ এমন অনেক কাজ করে যার পেছনে আদর্শের দোহাই থাকলেও বস্তুতঃ তা আদর্শের ছদ্মবেশ মাত্র।

এই উপন্যাসে লেখক ললিত চরিত্রের মধ্য দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন মানুষের দ্বৈতসত্তা। পিতা, স্বামী ও আদর্শবান উকিল ললিত চেয়েছিল দুর্নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে অসহায় বিধবা উত্তমাকে রক্ষা করতে কিন্তু সে তার অবচেতন মনে এই উপকার করার বিনিময়ে চেয়েছিল উত্তমার অবৈধ ভালবাসা। উত্তমা সম্পর্কিত প্রতিটি কাজে তার এই অবচেতনা কাজ করেছে এবং এই কাজ করার পেছনে সে যে আদর্শের কল্পনা করেছে, তা মূলত ভিত্তিহীন।

নরেশচন্দ্র বস্তুনিষ্ঠ লেখক হলেও আদর্শবাদী। তাই বিবাহিত সংসারী নায়ক ললিতকে তিনি প্রচণ্ড আঘাত দিয়ে সুস্থ সমাজ জীবনে ফিরিয়ে এনেছেন।

'হারজিত' [১৯৩৯] উপন্যাসের রচনাকাল ও কাহিনীকালের মধ্যে সুপ্রচুর ব্যবধান। কাহিনীকালের সময় কলকাতায় ঘোড়ায় টানা ট্রামগাড়ী চলত। কিন্তু উপন্যাসের চরিত্রগুলির ব্যবহার ও আলোচনা যুগোপযুক্ত না হয়ে অনেক বেশী আধুনিক মনে হয়, বিশেষত ছাত্রদের রাজনীতির আলোচনায়।

আলোচ্য উপন্যাসটিতে দুটি যুবকের প্রণয়, পরিণয় ও পরিণাম দেখানো হয়েছে এবং প্রসঙ্গত এই কাহিনীর মধ্যে এসে পড়েছে প্রতিযোগিতা, ঈর্ষা, বিশ্বাস, বিশ্বাসঘাতকতা এবং সন্দেহ। এই কাহিনীর হারজিতের ফলাফল লেখক দেখাননি, পাঠকদের হাতেই সেই দায়িত্ব তুলে দিয়েছেন। আর নরেশচন্দ্রের অন্যান্য উপন্যাসের মত এই উপন্যাসটিতে তথ্য ও তত্ত্বের প্রয়োগ নেই।

'হারজিত' উপন্যাসের চরিত্রগুলি জীবন্ত ও বাস্তব হয়ে উঠলেও, মূল কাহিনীর দুর্বলতায় তা চাপা পড়ে গেছে। দুটি নারী চরিত্রের বিশ্লেষণ এই কাহিনীর অন্যতম সৌন্দর্য, যদিও তাদের মধ্যে সন্দেহের প্রাবল্য কিছুটা অস্বাভাবিক। নিম্নবিত্তের মানসিকতা, দারিদ্র্যের বর্ণনা ইত্যাদি এই কাহিনীতে চমৎকার ভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে কিন্তু সব মিলিয়েও কাহিনীটি সুখপাঠ্য হয়নি এবং রস সঞ্চারেও ব্যর্থ বলা চলে।

'প্রহেলিকা' [১৯৪১] উপন্যাসটি নরেশচন্দ্রের উপন্যাসগুলির মধ্যে একটি সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। উপন্যাসটির বিষয়বস্তু প্রেম ও বিবাহ। কিন্তু সেই প্রেম ও বিবাহ মোটেই বাস্তবানুগ নয়, অতিমাত্রায় কল্পনাশ্রিত। এই উপন্যাসে তিনি দেখিয়েছেন যে নারী মাত্রই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য উদগ্রীব এবং পুরুষ শুধুমাত্র নারী প্রেমের কাঙ্গাল। যদিও এই দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ অসত্য নয়, কিন্তু এই উপন্যাসের চরিত্রগুলি যেন খুবই নির্লজ্জভাবে এই তথ্যকে সমর্থন করেছে। এই কাহিনীর রচনাকাল ও প্রকাশ-কাল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কাল এবং লেখক এই উপন্যাসের সময়সীমা ও এই বিশ্বযুদ্ধ কালের মধ্যেই আবদ্ধ রেখেছেন। ফলে তিনি কাহিনীর মধ্যে বিভিন্ন আলোচনায় গান্ধীজীর যুদ্ধ সম্পর্কে বক্তব্য, ইংরাজ ও জার্মানদের মধ্যে কোন পক্ষের যুদ্ধ জয়ের সম্ভাবনা বেশী বা এই যুদ্ধের সঙ্গে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের সুযোগ ইত্যাদিও আলোচনা করেছেন। যদিও এই কারণে আমরা কাহিনীকাল অনুধাবন করতে পারি, কিন্তু উপন্যাসের কাহিনীর প্রয়োজনে তা সম্পূর্ণ অবান্তর।

'মর্মও কর্ম' [১৯৪৫] উপন্যাসটি নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের শেষের দিকের রচনা। উপন্যাসটির প্রকাশকালে লেখকের বয়স ষাটের ঘরে। এই উপন্যাসে এসে আমরা তাঁর রচনায় একটি স্পষ্ট পরিবর্তন দেখতে পাই। যে রূঢ় বাস্তবের তীব্রতা, অপ্রিয় সত্যের অকুণ্ঠিত প্রকাশ, তথ্য ও তত্ত্বের বিন্যাস এবং নানা চরিত্রের দুরূহ মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ আমরা তাঁর প্রথম দিক-এর রচনার মধ্যে লক্ষ্য করেছি এ পর্যায়ে এসে তা অনেকখানি স্তিমিত হয়ে পড়েছে। 'হারজিৎ' [১৯৩৯] ও প্রহেলিকা [১৯৪১] উপন্যাস দুটিতে নরেশচন্দ্রের সাহিত্যের সেই তীব্রতা নেই।

আলোচ্য উপন্যাসের কাহিনীর মধ্যে কোন নতুনত্ব নেই। বিশেষত লেখক নরেশচন্দ্র তাঁর বহু উপন্যাসেই এই একই ধরনের কাহিনী ব্যবহার করেছেন। এই উপন্যাসে বিকাশের চরিত্রের পরিবর্তনকে তার চরিত্রের ঠিক উত্তরণ বলা যায় না, কলেজের হোস্টেলে যে বিকাশকে সম্ভাবনাময় মনে হয়েছে তার পরিণত জীবনে যেন তা হারিয়ে যায়, বৃহৎ সমাজ ছেড়ে সে যেন আশ্রয় নেয় ক্ষুদ্র সংসারে। অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে রাঁচির বাড়ীর বড়দা অনন্তর চরিত্র এবং চালের গুদাম লুঠ করার জন্য পুলিস অফিসার সুবোধের উৎসাহ দান ইত্যাদি চমৎকারভাবে লেখক উপন্যাসে প্রয়োগ করেছেন।

'কণ্ঠাভরণ' [১৯৪৮] উপন্যাসটি নরেশচন্দ্র উৎসর্গ করেন স্বর্গতা লাবণ্যপ্রভা দেবীর উদ্দেশ্যে। 'পিছল পথের শেষে' [১৯৩৭] উপন্যাসের মত এই উপন্যাসেও তিনি নারীদের

বিবাহের প্রয়োজনীয়তার কথা আলোচনা করেছেন। বিবাহ একটি অতি প্রাচীন সামাজিক সংস্কার হলেও আধুনিক যুগের সমাজও তাকে উপেক্ষা করতে পারে না এবং খুব সৎ এবং মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে বিয়ে না করে থাকলেও, অবিবাহিতা নারীকে মূল্য দেওয়ার মত মানসিকতা আমাদের সমাজে এখনো অনুপস্থিত। তাই অনেক প্রতিষ্ঠিত নারী সামাজিক সংস্কারকে মেনে নিয়ে প্রেমহীন ভালবাসাহীন বিয়ে করতে বাধ্য হয় এবং পরিণতিতে লাভ করে এক দুঃসহ অশান্তিময় জীবন। যদিও এ কাহিনীতে লেখকের কৌশলে সে রকম বিয়োগান্তক সমাপ্তি ঘটেনি।

আলোচ্য উপন্যাসের চরিত্র চিত্রণ এবং কাহিনী উচ্চাঙ্গের না হলেও গল্প বলার রীতিটির মধ্যে নতুনত্ব আছে। কাহিনীর শেষ অংশ অতিমাত্রায় আকস্মিক ও রূপকথার ইচ্ছাপূরণের মত বাস্তবতার পরিপন্থী। যদিও লেখক আইনের শাসনে সামাজিক বিবাহের নিয়মকে নিয়ন্ত্রিত করে একটা স্বাভাবিক পরিবেশ রচনা করতে সমর্থ হয়েছেন।

'স্ত্রী-ভাগ্যে' [১৯৪৯] উপন্যাসটিও নরেশচন্দ্র তাঁর স্বর্গতা স্ত্রী লাবণ্যপ্রভা দেবীর নামে উৎসর্গ করেন। এই উপন্যাসটির সঙ্গে প্রথম দিকের উপন্যাস 'অগ্নি সংস্কারের' [১৯২০] প্রচণ্ড সাদৃশ্য বর্তমান। এই উপন্যাসে মূলত লেখক দেখিয়েছেন, বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ একটি ধনী পরিবার ও একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের মধ্যে সম্পর্ক ও সংঘর্ষ। প্রসঙ্গত তিনি রচনা করেছেন কয়েকটি বিপরীত ধর্মী চরিত্র যারা ঠিক আমাদের পরিচিত না হলেও ঠিক অবাস্তব বলা চলে না।

'আমি ছিলাম' [১৯৫১] নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের উপন্যাস। এই উপন্যাসে বর্ণিত কাল ও রচনাকাল প্রায় সমসাময়িক। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর এদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে যে মতভেদ দেখা গিয়েছিল এবং তার ফলে যে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছিল, কাহিনীর মূল অংশ তার উপর ভিত্তি করেই রচিত।

এই কাহিনী উত্তমপুরুষের জবানীতে লেখা এক বিরাশি বছরের বৃদ্ধের অতীতের স্মৃতি চারণা ও তার বর্তমান কালের কিছু জিজ্ঞাসা নিয়ে রচিত। এই উপন্যাসেও লেখকের কৌতূহল স্পষ্ট। তা হচ্ছে অতীতের মানসিকতায় বর্তমানকে বিশ্লেষণ করার কৌতূহল। কাহিনী রচনা করতে করতে লেখক নিজেই নায়কের সঙ্গে বড় বেশী রকমের একাত্ম হয়ে পড়েছেন, যার পরিচয় পাওয়া যায় উপন্যাসটির উৎসর্গ পত্রে। তিনি লিখেছেন—

'যাঁরা ছিলেন। যাঁরা আছেন। যাঁরা হবেন। তাদের হাতে সমর্পণ করলাম এই বই এই আশায় যে তাঁরা স্মরণ করবেন যে আমিও ছিলাম'—তাই একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে আলোচ্য কাহিনীটি আত্মজীবনী না হলেও নিঃসন্দেহে আত্ম-জীবনীমূলক।

কাহিনীর শুরু সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে, সেই সন্ধ্যায় বৃদ্ধ শশাঙ্কবাবুর ঘরে কেউ

আলো জেলে দিয়ে যায়নি, ডেকে ডেকেও সাড়া পাওয়া যায়নি কারো। কেই বা আসবে এই বৃদ্ধের কাছে অতীতের রোমন্থন শুনতে। শশাঙ্কবাবু জানেন যে এসময় মেয়েরাও বাড়ীতে থাকে না আজকাল। প্রতিদিনের কেনাকাটা করার জন্য তাদের বাইরে যেতে হয়। বাড়ীর স্থবির বৃদ্ধকে এক গ্লাস জল গড়িয়ে দেওয়ার জন্য চাকরই যথেষ্ট।

এ বাড়ীতে আছে দুটি যুবক, সম্পর্কে তারা বৃদ্ধের নাতি। এই যুবক দুটির চলাফেরার মধ্যে বৃদ্ধ শশাঙ্কবাবু যেন তার যৌবনের আভাস পান। এই যুবকদ্বয়—সুকুমার ও অভিজিৎ রাজনীতি করে আর তাদের এই রাজনীতির চর্চাটা বৃদ্ধের কৌতুক জাগায়। ওরা মিটিং করে, বক্তৃতা করে, আবার মিটিং ভাঙেও। স্বাধীনতা লাভের পরেও ওরা দেশের মানুষের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করে।

শশাঙ্ক বাবুর কাছে আসেন বৃদ্ধ সুধাকান্ত, বর্তমান আর অতীত আলোচনায় কিছুটা সময় কাটিয়ে যান। তার সমস্যা বেশ কিছুটা আধুনিক। তাঁর দুটি মেয়েই বাড়ী ছেড়ে চলে গেছে—একজন নিপীড়িত জনগণের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করতে আর অন্যজন সিনেমার নায়িকা হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে। প্রসঙ্গত দুই বৃদ্ধের আলোচনা হয় সিনেমা থিয়েটারের। গিরিশ, বিনোদিনী আর অর্দ্ধেন্দু মুস্তাফীর অভিনয়ের কাছে সিনেমার অভিনয় দুজনেরই ভাল লাগে না, আর আন্দোলনের কথা উঠলেই তাঁদের মনে পড়ে বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনের কথা।

শশাঙ্ক বাবুর বড় মেয়ে সুচরিতা মাঝে মধ্যে এসে বৃদ্ধ পিতার সেবাযত্ন করে যায়। তার স্বামী অমিতাভ পাটনায় ডাক্তারী করেন। পুত্রবধূ অনসূয়া এ সংসারের সর্বময়ী কর্ত্রী কিন্তু সে সর্বদাই ব্যস্ত, তাই তারও সময় হয় না বৃদ্ধের সঙ্গে কথা বলার। তাঁর একমাত্র কথা বলার সাথী হচ্ছে সুকুমার। এই সুকুমারকে শশাঙ্কবাবু একটু স্নেহ করেন, বেশী বিশ্বাস করেন আবার সুকুমারের গতিবিধিতে দুশ্চিন্তাও করেন মনে মনে। সুকুমারের কাছে পার্টির কাজে কয়েকটি মেয়ে যাতায়াত করে কিন্তু এ ব্যাপারে বৃদ্ধের মনে কোন ভাবনার উদয় হয় না।

একদিন সুকুমার কয়েকজন পার্টির ছেলের সাথে মাথা ফাটিয়ে বাড়ী এল। তাদের মিটিং-এ পুলিশ লাঠি চার্জ করেছে। কিন্তু বাড়ী এসেই তাকে আবার পালাতে হল সুচরিতা পিসির বাড়ী পাটনায়। তার সঙ্গে গেল তাদের পার্টির মেয়ে মণিকা। পরদিন শশাঙ্কবাবুর বাড়ী পুলিশ এল সুকুমারকে ধরার জন্য সার্চ ওয়ারেন্ট নিয়ে। পুলিশের কাছে অপমানিত হলেন বৃদ্ধ শশাঙ্কবাবু, তিনি বুঝতে পারলেন যে তার অতীতের পদমর্যাদার আজ আর কোন মূল্য নেই। পাটনায় এসে মণিকা ও সুচরিতার যত্নে ধীরে ধীরে সুকুমার সুস্থ হয়ে উঠতে লাগল এবং সেই সঙ্গে নিবিড় প্রেমের মাধুর্যে ভরে উঠলো মণিকা ও সুকুমারের মন। তারা তখন আবিষ্কার করলো যে তারা দুজনেই দুজনকে ভালবাসে। ব্যাপারটা অমিতাভ মেনে নিতে পারেনি তাই বাধ্য হয়ে আবার তাদের পথে নামতে হল, চললো মণিকা সুকুমারের উদ্দেশ্যহীন গন্তব্যহীন পথ চলা।

দীর্ঘদিন পথ চলার পর অবশেষে তারা আশ্রয় পায় এক ভদ্রলোকের খামার-বাড়ীতে। এই ভদ্রলোকের সঙ্গে সুকুমারের আলাপ হয়েছিল কলকাতায়। ভদ্রলোক একদা বিপ্লবী ছিলেন, এখন এই জনহীন প্রান্তরে ক্ষেতখামার নিয়ে আছেন। এখানে সুকুমার ও মণিকা নিজেদের পরিচয় দিল স্বামী-স্ত্রী হিসাবে, শুরু হল তাদের নতুন জীবন।

এই খামারে একটা জিনিস দেখে সুকুমারের খুব অবাক লাগে যে এখানে কেউই প্রভু নয়। গৃহস্বামী ও ভৃত্যদের মধ্যে সম্পর্ক যেন বৃহৎ পরিবারের স্নেহের শ্রদ্ধার সম্পর্ক। এখানে জমিতে ফসল ফলানোর শ্রমটুকু সবাই করে, যেন নিজেদের মমতায়। সুকুমার ও মণিকাও এই খামারের কাজ-কর্মের মধ্যে নিজেদের সম্পূর্ণ মিশিয়ে দেয়।

সুকুমার মাঝে মাঝে কলকাতার খবর পায়। পার্টির খবরও আসে, কিন্তু এখন সে আর পার্টির নির্দেশ, পার্টির সব মত দ্বিধাহীন ভাবে গ্রহণ করতে পারে না। জীবনের অর্জিত নানা অভিজ্ঞতায় পার্টির ভুল ত্রুটি সে এখন আর মেনে নিতে পারেনা, পার্টির তাত্ত্বিক আদর্শ ও ব্যবহারিক প্রয়োগের তারতম্য এখন তার কাছে অনেক স্পষ্ট। সে নতুন পথ খুঁজে বেড়ায়, চারিদিকে তার চোখে পড়ে শুধুই অবক্ষয়, এতদিনের আদর্শ ও বিশ্বাসকে ভুল মনে হয়।

এই সব খবরই বৃদ্ধ শশাঙ্কবাবু জানতে পারেন মণিকার চিঠিতে। সুকুমারের সাথী এই মেয়েটির উপর এখন আর তার কোন বিদ্বেষ নেই। কিন্তু সুকুমারের মনের সব খবর তিনি তখনও জানতে পারেননি। জানতে পারেননি মণিকার খবরও।

দীর্ঘদিন এই অজ্ঞাতবাসে সুকুমারের বার বার নিজেকে মনে হয়েছে অলস, স্বার্থপর—তার একথাও মনে হয়েছে সে দুর্বল ও ভীরু। সে রূঢ় বাস্তবের কাছ থেকে পালিয়ে এসে নিরুদ্বেগ জীবন কাটাচ্ছে আর অনায়াসে গ্রহণ করছে মণিকার সেবা। সে শুধু নিশ্চিন্ত নিরাপদ আশ্রয়ের মধ্যে আত্মসুখের মধ্যে বাঁধা পড়ে আছে। সে দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে ঠিক করেছে যে এই বাস ছেড়ে তাকে কলকাতায় যেতে হবে। যদিও সে জানে কলকাতায় ফিরলেই তাকে গ্রেপ্তার করা হবে কিন্তু সেজন্য তার কোন ভয় নেই, তার ভয় মণিকাকে নিয়ে কেননা মণিকা মা হতে চলেছে। শেষ পর্যন্ত সুকুমার মণিকাকে কলকাতার হাসপাতালে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে চলে যায় বরিশালে। বরিশালে তখন দাঙ্গার আগুন জ্বলছে, সুকুমার সেই দাঙ্গার আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে, দাঙ্গা বন্ধ করার সংকল্প নিয়ে।

মণিকা কিন্তু কলকাতার হাসপাতালে না গিয়ে বৃদ্ধ শশাঙ্কবাবুর সামনে এসে দাঁড়ায়। বিরাশি বছরের বৃদ্ধ শশাঙ্কবাবু, সুকুমারের বউকে, তার নাতবউকে ক্ষমা না করে পারেন না। সুধাকান্তের হারিয়ে যাওয়া মেয়ে মণিকা, ফিরে এল শশাঙ্কবাবুর বাড়ীতে বউ হয়ে। তখন বৃদ্ধ শশাঙ্কবাবু অসহায় মণিকাকে নিয়ে নতুন করে জীবনের পথ পরিক্রমায় সাহসী হয়েছেন, বাঁচতে চেয়েছেন আগামী দিনের নবজাতকের মধ্যে।

আলোচ্য কাহিনী ঠিক স্মৃতিচারণা নয়। বৃদ্ধ শশাঙ্কবাবু এ কাহিনীর সূত্রধার,

তাঁর সংলগ্ন অসংলগ্ন চিন্তাভাবনা, বিন্যাস ও বর্ণনার মধ্য দিয়েই কাহিনী এগিয়েছে। এই কাহিনীর কেন্দ্রচরিত্র সুকুমার কমিউনিস্ট। একটা দৃঢ় আদর্শে সে বিশ্বাসী হলেও শুধুমাত্র আদর্শের প্রতীক নয়, বরঞ্চ সাধারণ মানুষের মতই সে রক্ত মাংসে গঠিত। মণিকার সঙ্গে তার সম্পর্ক তাই দেহাতীত নয়। একদা বিপ্লবী ধীরাজবাবুর খামারবাড়ী, শ্রমিকদের সঙ্গে তার সম্পর্ক ইত্যাদি দেখে সুকুমার নতুন করে তার পঠিত তত্ত্বের ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছে এবং তার দলগত আদর্শকে আর পূর্বের মত দ্বিধাহীন ভাবে মেনে নিতে পারেনি। শুধুমাত্র তত্ত্ব নির্ভর বক্তব্য প্রয়োগ না করে কাজের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। নিজের বক্তব্য রাখার সাহস নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে।

মণিকার আচরণে 'রাজনীতি করা মেয়ের' দৃঢ়তা নেই। তার চলাফেরা সাধারণ বাঙালী মেয়ের মতই। আর সেজন্যই সে হাসপাতালে না গিয়ে আশ্রয় দাবী করেছে বৃদ্ধ শশাঙ্কবাবুর কাছে।

শশাঙ্কবাবুর চরিত্র অতিমাত্রায় স্নেহপ্রবণ ও ভাবালুতায় ভরা। হয়ত লেখক শশাঙ্কবাবুর সুখ-দুঃখে একাত্ম হয়ে পড়েছিলেন এবং সেজন্যই তাঁর পূর্বরচনার মত এ উপন্যাস ভয়লেশহীন নয়, স্তিমিত ও উত্তেজনাবিহীন। তবু এই উপন্যাসের একটা ভিন্ন স্বাদ পাঠকদের তৃপ্ত করে এবং সেই সঙ্গে অনতিদূর অতীতের ইতিহাসকে স্মরণ করায়।

'স্বপ্নসৌধ' [১৯৬১] নরেশচন্দ্রের শেষ উপন্যাস। এই উপন্যাসটি প্রকাশ লাভ করে 'গল্পভারতীর' দীপালী সংখ্যায় [১৩৬৬]। আয়তন ও বিষয়বস্তুর বিচারে 'স্বপ্নসৌধকে' বড় গল্প বলা চলে, যদিও নায়কের জীবনের বৃহৎ অংশ বর্ণিত হওয়ায় কাহিনীটিকে উপন্যাস বলাও অসঙ্গত মনে হয় না। এই কাহিনীর প্রেক্ষাপট উনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকে প্রথম মহাযুদ্ধের অবসান পর্যন্ত বিস্তৃত।

এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র শরৎ প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম হওয়ার পর থেকেই জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে চেয়েছিল। কিন্তু সংসারের দায়িত্ব মাথায় থাকায় তার সেই ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি। তারপর ছোট ছোট ভাইদের মানুষ করে সে গড়ে তুলতে চেয়েছিল এক শান্তির সংসার। প্রাচুর্য্য, প্রতিপত্তি, সম্মানের এক স্বপ্নসৌধ। তার সে চেষ্টার কিছুটা সফলতা এসেছিল, তার প্রতিটি ভাই বিদ্যায় বিত্তে সম্মানের উচ্চশিখরে উঠেছিল ঠিকই কিন্তু তার স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে গেছে। মানসিক যন্ত্রণায় ক্লান্ত বিধ্বস্ত শরৎ তার নষ্ট স্বপ্নসৌধ থেকে বেরিয়ে এসে আত্মহত্যা করতে যায় কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে ধরা দিতে হয় পুত্রের আলিঙ্গনে। সে বুঝতে পারে সংসারে তার প্রয়োজন এখনও আছে, এই প্রয়োজনটুকুই তার বিফল জীবনের একমাত্র সুখ-সান্ত্বনা।

শরৎ ছিল আশাবাদী। সে নিজে যা হতে পারেনি ভাইদের তা অনায়াসে লাভ করার সুযোগ করে দিয়েছিল, কিন্তু তারা যখন সমাজ সংসারের কাছে সম্মান ও স্বীকৃতি পেল তখন শরতের মন তৃপ্তি পায়নি বরং একটা বেদনাবোধ তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ভাইদের উন্নতিতে সে সান্ত্বনা পেয়েছে কিন্তু সান্ত্বনা সফলতা নয়, আর তার এই আত্মতৃপ্তি আত্ম প্রবঞ্চনার নামান্তরমাত্র। পূর্ণশশী বাড়ীর বড়বৌ। সংসারের

শান্তির জন্য সে সব সময়ই চেষ্টা করেছে। শরতের মুখ চেয়ে সে সবকিছু মুখ বুজে সহ্য করেছে। সমীরের বিয়ের জন্য সে নিজে মৃণালদের বাড়ী গিয়ে সবকিছু ঠিক করে এসেছে আর শরৎকেও বাধ্য করেছে এই বিয়ের ব্যবস্থা করতে। ভাইদের সম্পর্কের মধ্যে যাতে কোন রকম ফাটল না ধরে সেজন্য সে সুধীরের বাড়ীতে উঠে যেতে চেয়েছে। শরতের স্বপ্নসৌধকে সে চেয়েছে বাস্তবে রূপ দিতে আর শরতের ভারাক্রান্ত মনকে চেয়েছে ভারমুক্ত করতে।

যতীন শরতের মেজ ভাই। তার আচরণ খুবই সংযত, দাদা শরতের প্রতি তার শ্রদ্ধা ও ভালবাসাও পরিমিত। তার নিজের উন্নতির মূলে শরতের প্রাণপণ চেষ্টাকে সে কখনোই অস্বীকার করেনি। দাদার কাঁধ থেকে কিছুটা বোঝা কমানোর জন্যই সে সমীরের মেডিক্যাল কলেজে পড়ার খরচ দিয়েছে। কিন্তু সব করলেও সংসার থেকে সে যেন কিছুটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

ইঙ্গবঙ্গ সমাজের আদর্শে পালিতা তার স্ত্রী সুরমা চরিত্রটি বাস্তবতায় সজীব। সমীরকে ইংলিশ-ম্যানারস শেখানোর মধ্যে তার আন্তরিকতা ও সরলতাই প্রকাশ পেয়েছে।

আলোচ্য কাহিনীতে সমীর, মৃণাল ও অলোকের চরিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠার সুযোগ পায়নি কিন্তু যুদ্ধের কারণে হঠাৎ বড়লোক হয়ে ওঠা সমাজের একটা বাস্তব প্রতিচ্ছবি আমরা দেখতে পাই সমীরের আচরণের মধ্যে।

'স্বপ্নসৌধ' এক যৌথ পরিবারের ভাঙনের কাহিনী। কিন্তু এই ভাঙনের পিছনে কোন বাহ্যিক কারণই পুরোপুরি দায়ী নয়। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনেরও পরিবর্তন হয়। আর কাহিনীর নায়ক শরৎও মানসিক কারণেই আহত হয়ে এই সুন্দর সংসারে থেকেও আত্মপীড়ন করতে চেয়েছে, কামনা করেছে মৃত্যু।

৪

প্রবন্ধ

নরেশচন্দ্র ঔপন্যাসিক হিসাবেই অধিক পরিচিত কিন্তু তিনি একজন উঁচু দরের প্রবন্ধকারও। তিনি প্রথম বাংলা সাহিত্য আসরে পদার্পণ করেন ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে 'দাসী' পত্রিকায় এক প্রতিবাদ প্রবন্ধ প্রকাশ করে। তাঁর বয়স তখন চৌদ্দ বছর মাত্র। আর যৌবনের সীমা অতিক্রম করে মধ্যবয়সে 'বিচিত্রা' পত্রিকায় এক প্রবন্ধে তিনি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে আহ্বান করেছেন সাহিত্য ধর্মের সীমানা নির্দেশ করে দেওয়ার জন্য। বাংলা সাহিত্য পাঠকদের কাছে সে তথ্য অপরিচিত নয়। তারপর জীবনের সায়াহ্নে শারদীয় অমৃত পত্রিকায় প্রকাশ করলেন তাঁর শেষ প্রবন্ধ 'আত্মস্মৃতির হীরক জয়ন্তী'। সম্ভবত তাঁর শেষ রচনা। আর আমরা আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলাম যে ঔপন্যাসিক নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের প্রথম ও শেষ প্রকাশিত রচনা 'প্রবন্ধ'।

নরেশচন্দ্রের প্রবন্ধের সংখ্যা পঞ্চাশের উর্ধ্বে। ১৮৯৬ থেকে ১৯৬৩ পর্যন্ত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়। বিষয় ও প্রশ্নানুসারে তাঁর প্রবন্ধগুলিকে মোটামুটি আটটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন :

১। আত্মস্মৃতিমূলক।

২। সভাসমিতির অভিভাষণ ও ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ।

৩। ধর্ম ও দর্শন।
৪। সমাজনীতি ও ইতিহাস।
৫। রাষ্ট্রনীতি।
৬। প্রকৃতি।
৭। স্মারণী।
৮। সাহিত্য।

নরেশচন্দ্রের আত্মস্মৃতিমূলক প্রথম রচনা প্রকাশিত হয় ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দে জ্যোতিপ্রসাদ বসু সম্পাদিত 'গল্প লেখার গল্প' সংকলনে। অবশ্য এই প্রবন্ধটি প্রথম প্রচারিত হয় 'আকাশবাণী' থেকে (৭ই এপ্রিল, ১৯৪৫)। এই রচনাটি আকাশবাণীর কর্তৃপক্ষের অনুরোধে রেডিও শ্রোতাদের জন্য রচিত। এই ধরনের প্রবন্ধ প্রসঙ্গে নরেশচন্দ্র লিখেছেন —'লোকোত্তর প্রতিভার ছটায় যাঁরা জগতকে বিস্মিত করে দেন, তাঁদের জীবনের খুঁটিনাটি, তাঁদের প্রতিভার বিবর্তন সম্বন্ধে কৌতূহলও হয়, তা জেনে উপকারও হয়। আবার তেমন প্রতিভার অধিকারী না হয়েও যাঁরা ভাগ্যবলে বিপুল জনগণের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হন,—তাঁদের সে সকল জীবনের আদি কথা শোনবার আগ্রহ ভক্তদের হয়ে থাকে। আমার না আছে প্রতিভা, না আছে সে সৌভাগ্য বা প্রতিষ্ঠা। তাই আমার সাহিত্য জীবনের আদি কাহিনী শোনবার কৌতূহল কারো হওয়া উচিত নয়।'—কিন্তু এই উচিত অনুচিতের প্রশ্ন ছেড়ে দিয়ে তাঁর এই প্রবন্ধটির মধ্যে আমরা তাঁর প্রথম দিকের কথা সাহিত্য রচনার প্রেরণা ও উৎসের সন্ধান পেয়েছি আর একথাও জানতে পেরেছি যে প্রবন্ধ লিখেই তিনি সাহিত্য আসরে প্রথম পরিচিতি লাভ করেন।

বৈশাখ, ১৩৬১ বঙ্গাব্দে 'মধ্যবিত্ত' পত্রিকার সম্পাদকের প্রশ্নোত্তরে নরেশচন্দ্র 'আত্মকথা' নামে তাঁর দ্বিতীয় আত্মস্মৃতিমূলক প্রবন্ধটি প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধে তাঁর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিরোধের প্রশ্নে তিনি লিখেছেন—'তাঁর সঙ্গে বিরোধ আমার কখনও হয়নি। আমি শুধু তাঁর সাহিত্য ধর্ম সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধের আলোচনায় ভিন্ন মত প্রকাশ করেছিলাম।······আমি চিরদিনই তাঁর ভক্ত এবং আমার যা কিছু সাহিত্য চেষ্টা তার প্রধান উৎস যে তাঁর সাহিত্য এ কথা আমি চিরদিনই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় রবীন্দ্রনাথ শেষ বয়সে এক নিবিড় স্তাবক দলের দ্বারা বেষ্টিত থাকতেন। তাঁরা সবাই আমার বন্ধু ছিলেন না। তাঁদের উত্তেজনায় তাঁর মনে একটা বিরুদ্ধতা এসেছিল। কিন্তু আমাকে যে শেষ পত্র লিখেছিলেন তাতে স্পষ্ট দেখা যায় যে তিনি মনে কোন ক্ষোভ রাখেননি।' রবীন্দ্রনাথের প্রতি নরেশচন্দ্রের অবিচল শ্রদ্ধা সম্পর্কে বাংলা সাহিত্য পাঠকদের মনে যে সংশয় ছিল উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে সে সংশয় দূর হওয়া স্বাভাবিক।

এই প্রবন্ধে নরেশচন্দ্র এ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি, বঙ্গভঙ্গ ও বয়কট আন্দোলন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি সম্বন্ধে আমাদের বহু তথ্য পরিবেশন করেছেন। প্রগতিশীল সাহিত্য আন্দোলন বা কৃষক শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কেও তিনি এই প্রবন্ধে দু-একটি

মূল্যবান তথ্য দিয়েছেন। ব্যক্তিগত জীবনের কথা ছাড়াও এই তথ্যগুলির জন্য এ পর্যায়ের প্রবন্ধগুলির একটা স্বতন্ত্র মূল্য আছে।

১৩৭০ বঙ্গাব্দের 'শারদীয় অমৃত' পত্রিকায় নরেশচন্দ্র লিখেছেন এ পর্যায়ের শেষ প্রবন্ধটি—'আত্মস্মৃতির হীরক জয়ন্তী'। এই প্রবন্ধে লেখকের ব্যক্তিগত খবরাখবর অনেক কম। মূলত এই প্রবন্ধে তিনি আলোচনা করেছেন প্রায় সত্তর বছরের শিল্প ও সাহিত্যের ইতিহাস। এই প্রবন্ধে তিনি বহু তথ্য পরিবেশন করেছেন যেমন—

১। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে রবীন্দ্রনাথের জনপ্রিয়তা ছিল তাঁর গানের জন্য—'তাঁর কতগুলি গান ব্রাহ্মসমাজ গ্রহণ করেছিল। আর তাঁর প্রেমের গান বেশীর ভাগই যুবকদের কণ্ঠে ধ্বনিত হতো। তাঁর কবিতার বই কয়েকখানা ছাপা হয়েছিল, কিন্তু তার প্রচার খুব বেশী ছিল না।'

২। বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত বইয়ের কপিরাইট মাত্র পাঁচ হাজার টাকায় কিনেছিলেন 'বসুমতী' কাগজের প্রতিষ্ঠাতা ও মালিক উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

৩। 'ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ' প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য 'বঙ্গবাসী' কাগজ পিনাল কোডের ধারায় অভিযুক্ত হয়েছিল।

৪। 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রথম নিয়মিত চিত্রাবলী প্রকাশিত হত ও কলকাতায় ভারতীয় আদর্শে শিল্পচর্চার সে সময়ই সূত্রপাত হয়। লর্ড কার্জন ও আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ হ্যাভেল সাহেব ভারতীয় ও প্রাচ্যদেশীয় চিত্রশিল্পের প্রতি উৎসাহী ছিলেন। প্রসঙ্গত তিনি লিখেছেন—'হ্যাভেল এবং অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয় চিত্রকলা প্রসারের জন্য যে চেষ্টা করেছিলেন তার পাশে 'প্রবাসী' পত্রের এই প্রচেষ্টা বিশেষভাবে ফলবতী হয়েছিল। প্রবাসীর সঙ্গে সঙ্গে রামানন্দবাবু সম্পাদিত মডার্ণ রিভিয়্যুতেও এ-সব চিত্র ছাপা হত। এর ফলে তখন লোক সমাজে ভারতীয় ও পূর্বাঞ্চলের চিত্রকলার প্রতি অনুরাগ বিপুল পরিমাণে বেড়ে গিয়েছিল।'

নরেশচন্দ্র তাঁর এই নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধটির মধ্যে অতীতকালের শিল্প সাহিত্য চর্চা, সংবাদপত্র ও বিভিন্ন পত্রিকা এবং সাধারণ পাঠক ও শিল্প রসিকদের যে বর্ণনা দিয়েছেন তার ঐতিহাসিক মূল অনস্বীকার্য।

নরেশচন্দ্র বহুদিন শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত থাকায় একটা শিক্ষকসুলভ অভিব্যক্তি তাঁর জীবনের সঙ্গে ছিল ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ছাত্রদের সঙ্গে, তাঁর ছিল নিবিড় স্নেহের সম্পর্ক। ছাত্রদের-প্রতি তিনি তিনটি প্রবন্ধ লিখেছেন, 'সত্যনিষ্ঠা', 'দেশের সেবা', এবং 'আহ্বান'। এই তিনটি প্রবন্ধেই তিনি ছাত্রদের চরিত্র গঠন ও দেশের সেবা করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

'সত্যনিষ্ঠা' প্রবন্ধটি 'সবুজপত্রে' প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধের আরম্ভে তিনি লিখেছেন যে 'সত্য কহিও মিথ্যা কহিও না' উপদেশটি বহু ব্যবহারের ফলে জীর্ণ। তাই এই কথার পুনরাবৃত্তি অরুচিকর মনে হয়। সত্য কথা বলা মানেই কিন্তু সত্যনিষ্ঠা নয়। সত্যনিষ্ঠার ধর্ম জড়তা নয় তা হচ্ছে প্রকাশ ও প্রবৃত্তি। আবার শুধুমাত্র মিথ্যাকে

মনের মধ্যে প্রবেশ করতে না দিলেই যথেষ্ট সত্যনিষ্ঠা হয় না বরং সত্যকেও দেশান্তরে পাঠান হয়। কেননা ষোল আনা সত্য সংসারে মেনে চলা সম্ভব নয়—সত্যের নির্ভেজাল প্রকাশ সংসারে অচল যেহেতু সত্যের সঙ্গে ধর্মের সঙ্গে জীবনের ঠিক খাপ খায় না, আর সত্যের ধর্ম বিদ্রোহ, মাথা পেতে মেনে নেওয়া নয়। প্রচলিত বিশ্বাস ও ধর্মনীতির লুকোচুরি যে অসত্য সেটা প্রকাশ করার সাহসই সত্যনিষ্ঠা। বার্নার্ড শর কনভেনশনাল মর‍্যালিটির নীতি মেনে চলার মধ্যে যে ফাঁকি আছে বা পিতার আদেশে ব্রজেশ্বরের পত্নী ত্যাগের মধ্যে যে 'কপি বুক' নীতি মেনে পিতার প্রতি এব্‌সলিউট্‌ ডিউটি পালন করার দৃষ্টান্ত আছে তা মোটেই সত্যনিষ্ঠা নয়। তাই উপসংহারে লেখক বলেছেন যে—'অপ্রমত্ত চিত্তে মার্জিত বুদ্ধি ও ঐকান্তিক সত্যনিষ্ঠা লইয়া সত্যের অনুসন্ধান করিতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে এই কথাও মনে রাখিতে হইবে যে তোমার সত্যই অভ্রান্ত এবং শেষ সত্য নয়।'

'দেশের সেবা' ও 'আহ্বান' প্রবন্ধে লেখক ছাত্র ও যুবসমাজকে সমাজের কল্যাণের জন্য নিজেদের আত্মোন্নতির উপদেশ দিয়েছেন। কেননা তিনি মনে করেন যে সেলফ্‌ কালচারও দেশ সেবার একটি প্রকৃষ্ট পন্থা। প্রসঙ্গত তিনি লিখেছেন যে—'মানুষ যে বাঁচিয়া আছে সে হিংসার জোরে নহে। প্রেমের জোরে।……জীবন সংগ্রাম নয় পরস্পরের সাহায্যই সমাজ উন্নতির মূল নিয়ামক।' তিনি বিশ্বাস করেন যে সমগ্র মানবপ্রীতি ভৌগোলিক সীমা মেনে চলে না, মহাসমাজের উন্নতিই মানব সমাজের কাম্য হওয়া উচিত।

ক্ষুদ্র কাজকর্ম ও কর্তব্য অনুষ্ঠানে যারা বিমুখ ও অলস তারাই বাক্যবিলাস ও বৃহৎ কর্মানুষ্ঠানের উত্তেজনায় মত্ত হয়ে ওঠে। দেশের জন্য যুদ্ধ করা দেশ সেবার একটা প্রশস্ত পথ কিন্তু একমাত্র পথ নয়। কেননা দেশের সেবার জন্য পন্থার অভাব নেই। এই প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন—'সর্বত্র দেখিতে পাইতেছি দরিদ্রকে নিপীড়ন করিয়া ধনী, ছোটলোককে পীড়িত করিয়া ভদ্রলোক সমৃদ্ধ হইতেছে। দরিদ্রের বন্ধু হইয়া তাহাদের সহায়তা কর।' দেশের কয়েকটি লোক ধনী হলেই কিছু এসে যায় না। আমরা চাই সমগ্র দেশের সমৃদ্ধি। আমাদের দেশ ধনে ও জ্ঞানে দরিদ্র। যুবকদের শতকরা একশ ভাগ পুরুষ হতে হবে এবং সেই দারিদ্র্য দূর করতে হবে—জগতে প্রথম শ্রেণীর আসন লাভের প্রতিজ্ঞা নিয়ে পরিশ্রম করতে হবে।

ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কিত তাঁর প্রবন্ধে তিনি আমাদের সমাজের প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণাগুলি তুলে ধরে যথার্থ সত্যের সন্ধান করার চেষ্টা করেছেন। সাংখ্য দর্শন সম্পর্কে আমাদের একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে যে সাংখ্য দর্শন বস্তুত ভাববাদী দর্শন। কিন্তু এই ধারণা পোষণ করার যথাযোগ্য কারণ সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। 'সাংখ্যদর্শনের মূল কথা' আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—'ইহার লক্ষ্য প্র্যাক্টিকেল—তাহা জীবনের নিয়ম নিরূপণ ও মোক্ষের উপায় নির্ধারণ।' যদিও লেখকের বিবেচনায় 'সাংখ্যকারের দৃষ্টি অতীন্দ্রিয় বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়াছিল এই অন্তর্জগতের বিস্ময়কর রহস্যের কথা চিন্তা করিয়া।'

'শ্রেয়ঃ ও প্রেয়' প্রবন্ধে তিনি মানুষের চাওয়া ও পাওয়ার দার্শনিক আলোচনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে আমরা শুধুমাত্র সুখই চাই না, দুঃখ পেতেও চাই। নীতি শাস্ত্রের নৈতিক শ্রেয়ঃই একমাত্র শ্রেয়ঃ নয়। 'শ্রেয়ঃ নির্ণয় করিতে গিয়া আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে আমাদের শ্রেয়ঃই চরম নহে। ইহা ব্যবহারিক জীবনের নিয়ামক মাত্র, ইহার কোন একটা চরম সত্যতা নাই।'

শাস্ত্র ও হিন্দুধর্মের দোহাই দিয়ে সমাজ জীবনে আমরা এমন সব বিধিনিষেধ পালন করে থাকি বস্তুত যা শাস্ত্র ও ধর্ম কোনটিরই অভিপ্রেত নয়। অথচ এই সব ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে আমরা তর্ক পর্যন্ত করে থাকি। লেখক 'শাস্ত্রের দোহাই' ও 'হিন্দুর ধর্মশিক্ষা' প্রবন্ধে এই মনোভাবের বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং ইতিহাস ও প্রাচীন গ্রন্থাবলী থেকে উদাহরণ দিয়ে এই উপসংহারে এসেছেন যে, কাল ও সমাজ পরিবর্তনের সাথে সাথে ধর্মীয় আচার আচরণেরও পরিবর্তন ঘটে। আজ যা আমরা শাস্ত্র বা ধর্মের দোহাই দিয়ে একান্ত নিন্দনীয় মনে করি একসময় হয়ত সেটাই ছিল আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ করণীয় আচার। তাই মানবকল্যাণে বিভিন্ন যুগ কাল বা দেশের বিধি নিষেধ ও রীতিনীতির পরিবর্তন সমাজকে গ্রহণ করতে হয়। 'সমাজ সঙ্গতি' ও 'যৌথ পরিবার' প্রবন্ধেও তিনি পরিবর্তনশীল সমাজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার সপক্ষে বক্তব্য রেখেছেন।

নরেশচন্দ্রের সমাজনীতি ও ইতিহাস বিষয়ক প্রবন্ধের সংখ্যা সর্বাধিক। 'নারীর সম্মান' ও 'নারীর শিক্ষা ও অধিকার' প্রবন্ধ দুটির মধ্যে তিনি একদিকে যেমন বর্তমান সমাজে নারীর স্থান নিয়ে আলোচনা করেছেন তেমনি আবার নারীদের ভবিষ্যৎ সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের কিছু কিছু উপায়ও নির্দেশ করেছেন। 'নারীর সম্মান' প্রবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন যে নারীর প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য যে নীতিশাস্ত্রের ফরমূলা আছে— 'মাতৃবৎ পরদারেষু' সেটা মানা খুব বেশী সম্ভব নয়। নারীর প্রতি শ্রদ্ধাটাই আসল কথা কোন নির্দেশ বা ফরমূলায় খুব বেশী আসে যায় না। মধ্যযুগে ইউরোপে নারীর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের কারণ ছিল নারীকে মাতা ভাবে ভাবা নয় প্রিয়া ভাবেই দেখা। তাই 'মাতৃবৎ পরদারেষু' মনে না রেখেও যদি নারীর প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করা হয় তবে সেজন্য চিন্তিত হওয়ার কোন কারণ নেই। 'নারীর শিক্ষা ও অধিকার' প্রবন্ধে 'নারীর প্রকৃত কর্মের ক্ষেত্র গৃহ, এবং নারীর শ্রেষ্ঠত্ব মাতারূপে, পত্নীরূপে, কন্যারূপে' এই তথ্য পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারেননি। যেহেতু নারীমাত্রই সুগৃহিণী হতে হবে বর্তমান কালে একথা ঠিক গ্রহণ করা যায় না। তাই নারীর শুধু সুগৃহিণী হওয়ার শিক্ষার ব্যবস্থা করলে নারীদের প্রতি অবিচারই করা হবে। নারীর কর্মক্ষেত্র আজ অনেক বড়। নারী আজ শিক্ষয়িত্রীর বৃত্তি নিয়ে শত শত শিশুর সুশিক্ষার ভার নিতে পারে, আদর্শ সেবিকা হয়ে সেবা ও শুশ্রূষাকে জীবনের ব্রত করে মৃত্যু ও যন্ত্রণা থেকে মানুষকে বাঁচিয়ে তুলতে পারে। তাই নারীর আজ আর গৃহকর্মনিপুণা হলে চলে না এবং সে শিক্ষাও তার পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা নয়। নারীকে যত বেশী শিক্ষিত করে তোলা যায় সমাজের পক্ষে ততই মঙ্গল।

'রাষ্ট্রনীতি'র আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি আলোচনা করেছেন জীবনধারণের অপরিহার্য দুটি জিনিস নিয়ে। এক-'ভাত কাপড়ের কথা' এবং দুই-'দাস্য ও স্বাধীনতা'। 'ভাত কাপড়ের কথা'য় নরেশচন্দ্র মূলত আলোচনা করেছেন পাট চাষীদের নিয়ে আর 'দাস্য ও স্বাধীনতায়' ইতিহাসের দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন মানুষ বিবর্তনের ফলে কতটা পরাধীন বা অপরের ওপর নির্ভরশীল, অপরপক্ষে আত্মিক কারণে কতটা স্বাধীনচেতা। এই স্বাধীনতার আলোচনায় তিনি লিখেছেন—'আমরা পরিপূর্ণ স্বাধীনতা চাই, যে স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্র্য ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।' কিন্তু স্বাধীনতা লাভ করলেই যথার্থ অনধীনতা আসে না—'আজ আমরা কেবল ইংরাজের কাছে এই দাস্য সম্পর্কে আবদ্ধ তাহা নহে, আমাদের দেশেরই ভিতর আমরা, জমীদারের কাছে, মহাজনের কাছে, জাতির কাছে, আভিজাত্যের কাছে, এবং সত্য ও কল্পিত শাস্ত্রের কাছে দাসত্ব স্বীকার করিয়া বসিয়া আছি।'

'নিখিল বঙ্গ প্রজা সম্মিলনী', 'ভাত কাপড়ের কথা', 'জমিদারী বন্দোবস্ত' ও 'কর্ণওয়ালিসি বেদ' এই সব প্রবন্ধগুলির মধ্যে নরেশচন্দ্র কৃষক জমিদার সম্পর্ক, চাষী ও মহাজনদের সম্পর্ক ও চাষের ব্যাপারে সরকারী নীতি ইত্যাদির আলোচনা করেছেন। এবং বলা-বাহুল্য তিনি তাঁর এই সব প্রবন্ধে প্রজা কৃষকদের মূল সমস্যার কথা আলোচনা করে দেখিয়েছেন সমাজে তারা কতটা শোষিত নিপীড়িত এবং তিনি বিচার করে দেখিয়েছেন যে, জমিদারী বন্দোবস্তের ফলে এই কৃষক সম্প্রদায়ের কোন অতিরিক্ত সুবিধা হয়নি। কেননা তা প্রতি বছরের উৎপাদন, বাজারে চাহিদা ইত্যাদির উপর কোন রকম দৃষ্টি না দিয়েই খাজনা নির্দ্ধারণ করার চেষ্টা করেছে। অর্থাৎ কৃষকদের আয় উপায় ও সঙ্গতির সঙ্গে খাজনার কোন সম্পর্ক নেই। এই সব অবিচার লক্ষ্য করেই নরেশচন্দ্র তাঁর উপন্যাসের চরিত্রকে দিয়ে বলিয়েছেন— 'খোদার জমি চাষ করি তার জন্য খাজনা দেব কাকে ?'

'দলের কথা' প্রবন্ধে নরেশচন্দ্র দলাদলি ব্যাপারটার ভালমন্দ আলোচনা করতে গিয়ে ইতিহাস, ধর্ম ও সাহিত্য থেকে বহু দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করেছেন এবং প্রসঙ্গত বড় বড় মনীষীদের প্রচারিত নীতির ব্যর্থতার কারণ হিসাবে দলের অসহযোগিতার কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন শঙ্করের বেদান্ত এবং প্লেটোর তত্ত্ব।

প্রবন্ধের আরম্ভে তিনি লিখেছেন—"দলাদলি জিনিষটা যে ভাল নয় সে কথা কে না জানে। অথচ কাজ হাসিল করিতে হইলে দলটা একটা ভয়ানক কাজের জিনিষ। যে পারে না তার ব্যক্তিগত মাহাত্ম্য যতই থাকুক, তার দ্বারা কার্য্যোদ্ধার হয় না।" বৌদ্ধধর্মের সঙ্ঘের জন্যই তারা এশিয়ায় এত বড় প্রকাণ্ড শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু আজকে দলগুলির মধ্যে নীতি বা মতবাদের কোন স্থিরতা নেই। দলের প্রয়োজনীয়তা লেখক অস্বীকার করেননি কিন্তু তিনি নির্দেশ করেছেন যে দেশের উন্নতিসাধন করতে হলে এমন দলগঠন করতে হবে যার নীতি হবে সুদৃঢ় এবং জনসাধারণের হিতসাধনই হবে তাদের লক্ষ্য।

প্রকৃতি সম্পর্কিত প্রবন্ধ রচনায় নরেশচন্দ্রের বিশেষ আগ্রহ ছিল না মনে হয়। তাঁর পঞ্চাশ উর্ধ্বে প্রবন্ধের মধ্যে কেবল একটি প্রকৃতি সম্পর্কিত প্রবন্ধ পাওয়া যায়। প্রবন্ধটির নাম শরতের ডাক। এই প্রবন্ধটি ১৩৩১ সালে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

স্মারণী পর্যায়ে নরেশচন্দ্রের আটটি প্রবন্ধ পাওয়া যায়। এই প্রবন্ধগুলিতে তিনি রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, জগদিন্দ্রনাথ, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশচন্দ্র বসু ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সত্তর বছরের জন্মদিন উপলক্ষ্যে নরেশচন্দ্র একটি প্রবন্ধ রচনা করেন এবং মজঃফরপুর রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসবে সভাপতির ভাষণে প্রবন্ধটি পাঠ করেন এবং পরবর্তী কালে প্রবন্ধটি 'ভারতবর্ষ' [১৩৩৮] পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য প্রতিভার বিভিন্ন দিক আলোচনা করে উপসংহারে এসে নরেশচন্দ্র লিখেছেন—'সত্তর বছর বয়সে আজ তাঁর কবি-জীবন, সাহিত্যিক জীবন, ভাবুক জীবন, ভক্ত জীবন সকলই সমৃদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, নতুনভাবে সঞ্জীবিত হইয়া রহিয়াছে নূতন জীবন প্রেরণায়।······কালের গতি তাঁর দেহের শক্তি হয়তো খর্ব্ব করিয়াছে, কিন্তু তাঁর চিত্তের শক্তি গৌরব ও সঞ্জীবতা উত্তরোত্তর সমৃদ্ধই করিয়াছে। বার্দ্ধক্য তাঁর দেহের সিংহদ্বারে আঘাত করিয়া জর্জ্জরিত করিতে পারে, কিন্তু অন্তরের মণিকোঠায় তাঁর জীবন শোষক বিষ এক ফোঁটাও প্রবেশ করাইতে পারে নাই। বাংলার পক্ষে, ভারতের পক্ষে, জগতের পক্ষে এটা মহা সৌভাগ্যের কথা। তাই আমরা তাঁর সপ্ততিবর্ষোৎসবে অপরিমিত আনন্দের সহিত যোগদান করিয়া এই সৌভাগ্যের সুদীর্ঘ বিস্তার কায়মনোবাক্যে কামনা করিতেছি।'

'কথা-সাহিত্যে শরৎচন্দ্র' প্রবন্ধে নরেশচন্দ্র শরৎ-সাহিত্যের তিনটি দিক আলোচনা করেছেন। প্রবন্ধের প্রথমাংশে বর্তমান বাংলা সাহিত্যের পরিচয় দিয়ে তার মধ্যে শরৎচন্দ্রকে নিয়ে এসে তাঁর যথাযোগ্য আসনটিতে বসিয়েছেন। তারপর তিনি অতীত ও বর্তমানের বিদেশী সাহিত্যের প্রভাব বাংলা সাহিত্যিকদের উপর কি ভাবে এসেছে বর্তমান উপন্যাসের শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য আলোচনায় তা স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। কিন্তু এসব অভিঘাত ও চিহ্ন থাকা সত্ত্বেও শরৎচন্দ্র ছিলেন খাঁটি বাঙালী এবং তাঁর সৃষ্ট প্রতিটি চরিত্রও বাঙালী। এই চরিত্রগুলি সাধারণ পরিচিত সমাজ সংসারের মধ্যে থেকেও অসাধারণ চরিত্র হয়ে উঠেছে। আর এই নতুনত্বের জন্যই শরৎ-সাহিত্যকে তিনি বর্তমান যুগের সাহিত্য বলে অভিনন্দিত করেছেন।

'রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়' প্রবন্ধে নরেশচন্দ্র রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত জীবন, তাঁর ঐতিহাসিক আবিষ্কার এবং তাঁর সাহিত্য জীবন নিয়ে আলোচনা করেছেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে লেখক নরেশচন্দ্রের ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল। খুব বিচ্ছিন্নভাবে হলেও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের শৈশব থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক দুজনার মধ্যেই ছিল। শুধু কয়েকটি প্রবন্ধে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নরেশচন্দ্রের

সাহিত্যের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে এই সাহিত্যিক বিতর্ক দেখা দিলেও ব্যক্তিগত সম্পর্ক ম্লান হয়নি। এই প্রবন্ধে নরেশচন্দ্র লিখেছেন—'আমার এই পরলোকগত বন্ধুর বিদ্যার পরিমাণ ও কীর্তির প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারণ করিবার শক্তি আমার নাই—কেননা, প্রত্নতত্ত্বে আমি বিশেষজ্ঞ নই। কিন্তু তিনি আমার পরমবন্ধু ছিলেন। অনেকদিন তাঁহার সঙ্গে থাকিয়াছি, হাসিয়াছি, কাঁদিয়াছি।'

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাস আলোচনা প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন যে প্রাচীনকাল থেকে যে সব ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখা হয়েছে তার মধ্যে ইতিহাসের কিছু কাল্পনিক বিবরণই স্থান পেয়েছে কেননা তাঁদের লক্ষ্য ছিল রসসৃষ্টি। আর রাখালদাস তাঁর উপন্যাসের প্রতিটি ঐতিহাসিক তথ্য বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বিচার করে পুঞ্জীভূত প্রমাণের সঙ্গে উপস্থাপিত করেছেন। তাই তাঁর রচিত ঐতিহাসিক উপন্যাসের ঐতিহাসিক ক্রটি-বিচ্যুতি নিয়ে কোন অনুযোগ হয়নি।—'রাখালদাসের লক্ষ্য ছিল উপন্যাসের ভিতর দিয়া অতীতের বাংলার একটা সত্য চিত্র সৃষ্টি করা।'

'আশুতোষ' প্রবন্ধটির মধ্যে নরেশচন্দ্র স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উপর তাঁর অসীম শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন। লেখকের সঙ্গে স্যার আশুতোষের ছিল এক নিবিড় স্নেহশ্রদ্ধার সম্পর্ক। আশুতোষের মৃত্যু সংবাদে দেশবাসী মনের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে নরেশচন্দ্র লিখেছেন—'স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু সংবাদ একটা আকস্মিক অশনিসম্পাতের মতো সমস্ত বঙ্গবাসীকে স্তব্ধ, আড়ষ্ট ও চমকিত করিয়া দিয়াছিল······ শত সহস্র বাঙালীর, শুধু তাহাদের নয় যাহাদিগকে এই মহাপুরুষ স্থির আশ্রয়ে বঞ্চিত করিয়া অকূল সাগরে ভাসাইয়া গিয়াছেন, তাদেরও নয় যারা চিরদিন তাঁহাকে ছায়ার মত অনুগমন করিয়াই আনন্দ ও গৌরব অনুভব করিয়াছে···যাহারা কোন দিনই স্যার আশুতোষকে সকল ব্যাপারে নির্বিচারে মানিয়া চলিতে পারে নাই, যাহারা তাঁর জীবিতকালে তাঁর সঙ্গে তর্ক ও বিতণ্ডা করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই' সকলেরই মন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল এই মৃত্যু সংবাদে।

নরেশচন্দ্র এই প্রবন্ধে স্যার আশুতোষের ছাত্রাবস্থা, রাজনীতি, শিক্ষকতা, বিচারপতিত্ব, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার-ভূমিকা সমস্তই আলোচনা করেছেন এবং সর্বোপরি মানুষ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমাদের পরিচিত করিয়েছেন।

প্রবন্ধের শেষে নরেশচন্দ্র লিখেছেন—'স্যার আশুতোষ সমগ্র বাংলা দেশকে কাঁদাইয়া গিয়াছেন, অনেককে নিরাশ্রয় নিরবলম্বন করিয়া গিয়াছেন। সমগ্র দেশ তাঁহার অভাবে আজ দরিদ্র। আমার ক্ষুদ্র ক্ষতি এ দারুণ শোকসাগরের পাশে উল্লেখযোগ্য নয়। তবু তাঁর স্মৃতির আলোচনা করিতে গিয়া এ কথা আমি কিছুতেই চাপিয়া রাখিতে পারিব না যে তাঁহাকে হারাইয়া আমি আমার নিজের জীবনের একটা প্রধান আশ্রয় হারাইয়াছি। উচ্চ আদর্শের অনুশীলনের উৎসাহের এক চিরন্তন উৎস হইতে বঞ্চিত হইয়াছি······ জীবনের একটি প্রকাণ্ড অংশ আমার শূন্য হইয়া গিয়াছে।'

'সাহিত্য' নরেশচন্দ্রের প্রিয় বিষয়। তাই তাঁর রচিত সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধের সংখ্যাও প্রচুর। এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে তিনি সাধারণত আলোচনা করেছেন সাহিত্যের বিষয়, ভাষা এবং রস নিয়ে। সাহিত্যের বিষয় নিয়ে তিনি তাঁর 'সাহিত্য ধর্মের সীমানা' প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি স্বীকার করেছেন যে সাহিত্যের প্রধান লক্ষ্য রসসৃষ্টি, কিন্তু রস বিষয় নির্ভর কখনোই নয় বরঞ্চ বিষয়কে অতিক্রম করেই রসের সৃষ্টি। 'রসসৃষ্টির মধ্যে কোন্‌টা নিত্য কোন্‌টা অনিত্য তাহা তার বিষয় লইয়া বা অন্য কোন উপায়েই অভ্রান্তভাবে নির্দ্দেশ করা যায় না। ঈশ্বর গুপ্তের 'পাঁটা' বা 'তপ্‌সী মাছের' কবিতা আজ আর চলে না, বিদ্যাসুন্দরের অশ্লীল স্থানগুলিও অচল হইয়াছে,—সে যে তাদের বিষয় নির্বাচনের দোষে এ কথা বলিলে অন্যায় হইবে।......একটা জিনিষ যে চলে নাই, মরিয়া গিয়াছে তাহাতেই তার বিষয়বস্তুর অসার্থকতা নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হয় না। রবীন্দ্রনাথের যৌবনের অনেক কবিতাই এখন চলতির বাহিরে চলিয়া গিয়াছে, যদিও আমাদের যৌবনকালে সেইগুলির চল্‌তি সবচেয়ে বেশী ছিল। তাহা হইতে এ সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, তার বিষয়বস্তু রস-হিসাবে অচল—ইহাও বলা যায় না যে, সে কবিতা বা গানগুলিও সত্য সত্যই সার্থক রস রচনা নয়।'

'নবযুগের কথাসাহিত্য' প্রবন্ধে লেখক নবযুগের কথা-সাহিত্যের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ উঠেছিল তা খণ্ডন করে এই কথা-সাহিত্যের পক্ষে রায় দিয়েছেন। এই প্রবন্ধটি 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় ১৩৩১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।

এই নতুন ধরনের কথাসাহিত্য সম্পর্কে অভিযোগের অন্ত ছিল না। কিন্তু প্রধান অভিযোগ ছিল দুটি। প্রথম অভিযোগ 'এ সাহিত্য সম্পূর্ণ বিলাতী', দ্বিতীয় অভিযোগ এই সাহিত্যের 'মালমশলার ভিতর এমন সব কদর্য জিনিষ আছে যাহা নীতি ও ধর্ম বিগর্হিত ও সুরুচির পরিপন্থী।'

নবযুগের সাহিত্যের মধ্যে যে কিছু কিছু নিন্দনীয় কুরুচিপূর্ণ সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে তার অস্থায়ী বুদ্‌বুদ নিয়ে সমগ্র নবযুগের সাহিত্যকে বিচার করা চলে না।

প্রথম অভিযোগের উত্তরে প্রবন্ধকার বলেছেন যে—'বাঙালীর প্রাণ শত বর্ষ পূর্ব্বে যাহা ছিল আজ তাই নাই। শাড়ী পরা মেমসাহেব এক হিসাবে আজ বাঙালীর ঘরে ঘরে। আমাদের আজকালকার মনের কথা, আজকালকার আশা আকাঙ্ক্ষা, আজকালকার কর্মপ্রেরণা যে একশো বা দেড়শো বছর পূর্ব্বেকার চেয়ে অনেকটা ভিন্ন এবং সে বিভিন্নতার ভিতর যে বিলাতী সাহিত্য সমাজ প্রভাব খুব বেশী পরিমাণে আছে সে কথা অস্বীকার করিলে চলে না।' আমাদের সমাজেরও পরিবর্তন এসেছে কিন্তু এই পরিবর্তনটা এত ধীরে ধীরে হয়েছে যে আমরা টের পাইনি। তাই 'ঠিক সেকালের যাত্রা বা পাঁচালী সহিষ্ণুতার সহিত শ্রবণ করিতে আজকালকার খুব অল্প লোকই পারেন।...... আজকালকার বঙ্গনারী বেশভূষা করেন নূতন রকমের, স্বামীর সহিত পত্র ব্যবহারে শিশু-বোধকের আদর্শ ব্যবহার করেন না, দাশরথী রায়ের পাঁচালীর চেয়ে বঙ্কিমবাবুর উপন্যাস আগ্রহের সহিত পড়েন এবং পাল্কীর দরজা বন্ধ করিয়া পুঁটুলির মত বাহির হন না।

রেল ষ্টীমারে মানুষের মত হাঁটিয়া বসিয়া যাতায়াত করেন।' নব্যযুগের সাহিত্যেও তাই এই পরিবর্তন স্বাভাবিক।

দ্বিতীয় অভিযোগের বিরুদ্ধে লেখক বলেছেন—'কোনও কথার অংশ বিশেষে নীতি বিরুদ্ধ কথা থাকিলেই তাহা দুর্নীতির পোষক হয় না,......দেখিতে হইবে বই খানায় পাপকে লোভনীয় ও অনিন্দনীয় বলা হইয়াছে কিনা,...হিতোপদেশের নিয়ম মেনে পাপের পরাভব এবং পুণ্যের জয় দেখাতে হবে, কথাসাহিত্যে এ নিয়ম সবসময় চলে না। প্রকৃত কুশলী শিল্পী কথারচনায় পাপকে এমনভাবে ব্যবহার করিতে পারেন যে, পাপের ঠিক রূপকথার রাক্ষসের মত পরাভব না হইলেও পাপের প্রতি বিরাগ পরিপূর্ণরূপে পাঠকের মনে ফুটিয়া ওঠে।' লেখক আরো বলেছেন যে সমাজ বিবর্তনের সাথে সাথে প্রচলিত নীতি ও দুর্নীতিরও পরিবর্তন হয়। জীবনের মূল্যবোধের পরিবর্তন হয়। আর তাছাড়া সমাজের ত্রুটি, সমাজের ব্যথার কথা তুলে ধরা এবং সত্য জীবন চিত্রিত করা সাহিত্যের প্রধান কর্ত্তব্য।

'ভাষার আকার ও বিকার' প্রবন্ধে নরেশচন্দ্র দেখিয়েছেন সাধু ও চলতি ভাষা সাহিত্যে ব্যবহারের প্রয়োজন। 'বাংলা কথার আভিজাত্য' প্রবন্ধটির বিষয়বস্তুও মূলত ভাষা নিয়ে। প্রসঙ্গত তিনি লিখেছেন যে সাহিত্যের ভাষা কি হবে সেটা নির্ভর করে বিষয় ও বিশেষত্বকে ফুটিয়ে তোলার জন্য। তাই প্রয়োজন হলে সাহিত্যে উপভাষা প্রয়োগ করাও সাহিত্যে দূষণীয় নয় এবং ক্ষেত্র বিশেষে এ ধরনের প্রয়োগ রসসৃষ্টি করতে সাহায্যই করে।

ভাষা সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যম। চিত্রশিল্পের মাধ্যম রং, তুলি, কালি কলম ইত্যাদি। চিত্রশিল্পীও চিত্রের মেজাজ, বিষয় ও বিশেষত্ব ফুটিয়ে তোলার জন্য কখনো রং তুলি বা কখনো কালি কলম ব্যবহার করেন। উদাহরণ হিসাবে প্রবন্ধকার বলেছেন যে কালি কলমের সাহায্যে ব্যঙ্গচিত্র যত ফোটে তৈলচিত্রে তা সম্ভব নয়। প্রসঙ্গত তিনি আর একটি কথা বলেছেন তা হচ্ছে রীতি। রীতি মৌলিক জিনিস সেটা নকল করা সম্ভব নয়। রেমব্রাণ্ট যদি র‍্যাফেলের রীতি অনুকরণ করতেন তবে তিনি তাঁর নিজস্ব রীতিতে যে ছবি এঁকেছেন তার চেয়ে ভাল হত একথা বলা যায় না।

সাহিত্যের মূল লক্ষ্য রসসঞ্চার। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে চল্‌তি ভাষা ব্যবহার করেও রসসঞ্চারে কোন বিঘ্ন ঘটাননি এবং তাতে বাংলা ভাষার কৌলিন্যও ম্লান হয়নি বরঞ্চ উজ্জ্বলতর হয়েছে। রবীন্দ্রসাহিত্য থেকে চল্‌তি ভাষার এরকম শত শত দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। আলোচ্য প্রবন্ধে নরেশচন্দ্র লিখেছেন—'আমরা দেখিতে পাইতেছি, যে, চল্‌তি ভাষার এমন অনেক কথার ভঙ্গী আছে যার পুরা জোরটুকু সাধু ভাষায় তরজমা করাই চলে না। সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলিতে আমি আর ফিরছিনে—এ কথাটা সাধুভাষায় ঠিক এই ফোর্স রক্ষা করে বলা যায় কিনা জানিনা। এখানে 'ফিরছিনে' কথাটার ভিতর এমন একটা ঝোঁক আসিয়া পড়ে যার সম্পূর্ণ অর্থ 'ফিরিতেছি না 'ফিরিব না' 'কদাপি ফিরিব না' প্রভৃতি কোনও কথায় প্রকাশ হয় না।'

'কাব্যের মালমশলা' প্রবন্ধটি একটি রস-রচনা। এই প্রবন্ধে নরেশচন্দ্র রহস্যছলে কাব্যের বিষয় সম্পর্কে প্রচলিত অভিযোগগুলিকে নিয়ে এক রসজ্ঞ আলোচনা করেছেন। কবিদের তিনি তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন ব্যক্ত, অব্যক্ত এবং জ্ঞ। আর কাব্যের বিষয় হচ্ছে ফুল, চাঁদ, নদী, বর্ষা এবং কিছু মিথ্যার সমষ্টি, যার নাম রস। বাকি আরও দুটি জিনিস নিয়ে কবিরা কাব্য চর্চা করেন তা হচ্ছে প্রেম এবং সংগ্রাম। এই প্রবন্ধের আরম্ভে তিনি কবিদের সম্পর্কে বলেছেন, 'আমি তাহাদের প্রশংসা করিতে আসি নাই, সমাধি দিতে আসিয়াছি।' এবং পরিশেষে বলেছেন 'আপনারা অবশ্যই বুঝিতেছেন যে কবিতার রস হইতেছে মিথ্যা, ইহার লক্ষ্য দুঃখ! মিথ্যা, প্রবঞ্চনা ও ভণ্ডামির উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত, সত্য ও সুখ ইহার চিরশত্রু। সত্য ও সুখ যদি জীবনে চাহিবার মত একটা কিছু হয় তবে কবিতাকে সংসার হইতে ফুলের বাতাস দিয়া তাড়াইতে হয়।'

নবযুগের সাহিত্যের বিরোধিতা করে সে যুগে [১৩৩১-১৩৩৫] যে সব সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল সেই সব সমালোচনার বক্তব্যের সঙ্গে নরেশচন্দ্র একমত হতে পারেননি। নরেশচন্দ্রের মতে 'সমালোচকদের······গুরুতর দায়িত্ব আজকালকার সমালোচনায় সম্যকরূপে দেখা যায় না···রসের দিক হইতে কথা-সাহিত্যের মোটেই আলোচনা হইতেছে না, আলোচনা হইতেছে অবান্তর বিষয় লইয়া। রস হিসাবে মুড়ি মিছরীর একদর হইয়া গিয়াছে।······পাঠকসাধারণও উভয়ের ভিতর প্রভেদ ধরিতে শিখিতে পারে না। এইরূপ সমালোচনা বাংলা সাহিত্যের যত বড় অনিষ্টের জন্য দায়ী, তথাকথিত কু-সাহিত্যের দায়িত্ব তত বেশী নয়। অপ্রবুদ্ধ সমালোচনা অসাহিত্য ও কু-সাহিত্য সৃষ্টি করে ও তাহার প্রসারে সহায়তা করে।'

নবযুগের সাহিত্যিকদের সম্পর্কে নরেশচন্দ্র লিখেছেন—'বর্তমান যুগের কথা-সাহিত্যিক সম্ভব জগতের ভিতর অসাধারণ ও অলৌকিককে যথাসম্ভব ফুটাইয়া তুলিতে চান, সহজ জীবনের ভিতর রোমান্সের রোমাঞ্চ ঘটাইতে চান, সাধারণ জীবনে অসাধারণের উপাদান আহরণ করিয়া। তার জন্য তাঁরা নিত্য নৈমিত্তিক জীবনকে গভীর ও নিবিড়ভাবে আলোচনা করিয়াছেন, জীবনের ক্ষেত্র তাঁরা অনুবীক্ষণের দ্বারা পরীক্ষা করিয়াছেন। অন্তরের গভীর তলদেশে তাঁহারা ডুবুরী নামাইয়া দিয়াছেন, অন্ধকার মণিকোঠায় আলো জ্বালাইয়া দিয়াছেন।

আলোকে যারা অনভ্যস্ত, তন্দ্রার ঘোরে যারা মশগুল হইয়া আছে, অন্ধকারে যারা বাণিজ্য করে, সবার মধ্যে চেঁচামেচির সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।'

তরুণ সাহিত্যিকদের সম্পর্কে প্রথম অভিযোগ যে তারা সাহিত্যে শুধুমাত্র মিথ্যা, নীতিহীন কুরুচির আস্ফালন করছে। কিন্তু নরেশচন্দ্র সে অভিযোগ স্বীকার করেননি তাই তিনি লিখেছেন। 'এই তরুণদলে যদি শক্তিমান লেখক না থাকিত, তবে তাদের আস্ফালনে বিচলিত হইয়া মহারথী হইতে পদাতিক পর্যন্ত ব্যূহবদ্ধ হইতেন না।'

'সাহিত্য-সংগ্রাম' প্রবন্ধে নরেশচন্দ্র এ বক্তব্যই রেখেছেন। যে প্রবীণ, যে জ্ঞানী

সে, তরুণরা ভুল করলে তা শুদ্ধ করে দেন সঙ্গে সঙ্গে সস্নেহে তরুণদের গুণের প্রশংসাও করেন। তিনি প্রশ্ন রেখেছেন যে প্রবীণদের সেই সাহিত্য সমালোচনা কোথায় ?

'সাহিত্যে জাতীয়তা' প্রবন্ধেও তিনি রায় বাহাদুর যতীন্দ্রমোহন সিংহকে দৃষ্টান্ত উদ্ধার করে সমালোচনা করার অনুরোধ করেছেন, কেননা 'কলমের আগায় কালি ছিটাইয়া লোককে কলঙ্কিত করিবার চেষ্টা সহজ, কিন্তু তা সমালোচনা নয়।'

নরেশচন্দ্রের প্রবন্ধগুলি বিষয় প্রধান। এমন কি তার দুটি রসরচনা 'কাব্যের মালমশলা' ও 'বানরের পত্র'ও বিষয় প্রধান। আমরা জানি যে প্রবন্ধের মূল বক্তব্য যেমন কোন একটি বিষয়কে আশ্রয় করে লেখা হয় তেমনি আবার এ কথাও অনস্বীকার্য যে প্রবন্ধ চিহ্নিত হয় তার প্রকাশভঙ্গীতে। নরেশচন্দ্রের প্রবন্ধে কিন্তু প্রকাশভঙ্গীর চেয়ে বিষয়ের গুরুত্ব বেশী।

নরেশচন্দ্রের প্রবন্ধগুলি বিষয়বস্তু প্রধান হলেও তাঁর প্রবন্ধ রচনার দুটি রীতি লক্ষ্য করা যায়। যেমন তিনি তাঁর প্রবন্ধ শুরু করেন একটি গল্পের বা ঘটনার অবতারণা করে এবং ক্রমশ ও প্রসঙ্গত সেই গল্প বা ঘটনার সঙ্গে নিজের প্রবন্ধের বক্তব্যকে মিলিয়ে মিশিয়ে অভেদ করে তোলেন। প্রাচীন সমাজে প্রচলিত এবং অভিনন্দিত রীতিনীতি বর্তমান সমাজে যে একান্ত নিন্দনীয় ও অচল বহু প্রবন্ধে তিনি বিভিন্নভাবে এই উদাহরণটি ব্যবহার করেছেন। দ্বিতীয়ত তাঁর প্রবন্ধে মনে হয় যেন তিনি সামনে বসিয়ে প্রতিপক্ষের সঙ্গে যুক্তিতর্কের বিনিময় করছেন এবং বিভিন্ন দিক থেকে প্রশ্ন রেখে তা খণ্ডন করছেন। কিন্তু 'সাহিত্য ধর্মের সীমানা' প্রবন্ধ প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচির উক্ত অভিযোগে আমরা একমত নই।

নরেশচন্দ্রের প্রবন্ধের আকার দীর্ঘ। উদাহরণ প্রয়োগ ও ব্যাখ্যা অনেক স্থানেই পুনরাবৃত্তি মনে হয়। হতে পারে কর্মব্যস্ত লেখক দ্বিতীয় বার তাঁর লেখা ঘষামাজা করেননি। কিন্তু যুক্তির বিস্তার ও বিপক্ষের যুক্তি খণ্ডনে তাঁর সুস্পষ্ট ব্যক্তিত্বকে অস্বীকার করার উপায় নেই এবং যতীন্দ্র মোহন সিংহ, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীতি চট্টোপাধ্যায় এবং রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের উত্তরে লেখা তাঁর প্রবন্ধগুলিকে কখনো শিথিলবদ্ধ মনে হয় না।

৫

নাটক

নাটক যদিও সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মধ্যে 'ফর্ম' হিসাবে প্রাচীনতম তবু আলোচ্য কালসীমায় কবিতা ও কথা-সাহিত্যের তুলনায়, এই প্রাচীন সাহিত্য ফর্মটি যে অধিক জনপ্রিয় নয় একথা সর্বজনস্বীকৃত। বিংশ শতাব্দীর প্রথম কুড়ি বছরে গল্প-উপন্যাস রচনায় যে পরিমাণে বৈচিত্র্য এসেছে নাটকে তা আসেনি। ফলে এ সময় গল্প-উপন্যাসের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেলেও নাটকের ক্ষেত্রে এই জনপ্রিয়তা অনেকটাই অবিচল রয়েছে। আলোচ্য শতাব্দীর প্রথম দশকে গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাটকই প্রচুর জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। এর কিছু পরবর্তী সময়ে অধ্যাপক শিশির কুমার ভাদুড়ির বাংলা রঙ্গমঞ্চে যোগদানের ফলে শিক্ষিত সমাজে নাটক সম্পর্কে নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা দেয়। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের "আলমগীর" নাটকের অতিরিক্ত জনপ্রিয়তা অনেকটাই শিশির ভাদুড়ির নাম ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য, তাছাড়া নাট্যকার এই নাটকটিকে যুগোচিত রুচির উপযোগী করে রচনা করতে সচেষ্ট ছিলেন। অবশ্য ইতিপূর্বেই পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও দেশপ্রেমমূলক নাটকের পৌনঃপুনিকতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের 'মালঞ্চ' অভিনীত হয়েছিল আর—"সেই অভিনয় আমাদের রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে যুগান্তকারী ঘটনা ...।"[১]

আলোচ্য সময়েই নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত 'আনন্দমন্দির' [১৯২৩], 'ঠকের মেলা' [১৯২৫], 'ঋষির মেয়ে' এবং 'নারায়ণী' [১৯২৯] এই চারটি নাটক প্রকাশ করেন।

'আনন্দমন্দির' নাটকের পটভূমি এক কল্পিত রাজ্য। এ রাজ্য শাসন করেন কুমারী রাণী শান্তা। এ রাজ্যের অন্যান্য কাজ পরিচালনার ভারও নারীদের হাতে। রাণী শান্তার ধারণা ছিল যে শক্তি প্রয়োগ করে সবকিছু অধিকার করা যায় আর তার স্বপ্ন ছিল দেশে এক আনন্দমন্দির গড়ে তোলার। শান্তার রাজ্য বিজ্ঞানের চরম শিখরে পৌঁছে প্রাকৃতিক সব সম্পদকে কাজে লাগিয়েছে কিন্তু তার দেশে একান্ত অভাব ছিল ক্ষমা ও ভালবাসার।

এই রাজ্য সংলগ্ন বনভূমিতে শিকার করতে গিয়ে রাণী শান্তা হঠাৎ দেখতে পায় প্রকৃতির আশ্রয়ে বেড়ে ওঠা বন্য নারী-পুরুষ জঙ্গলা ও জিউকে। নারী শান্তার অতৃপ্ত বাসনা প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে এই বন্য পুরুষ জঙ্গলাকে দেখে। সে জঙ্গলাকে অধিকার করতে চায়, দখল করতে চায় তার ভালবাসা। তাই রাত্রির অন্ধকারে শান্তা বৈদ্যুতিক মশালের আলোতে মোহগ্রস্ত করে জঙ্গলাকে নিয়ে আসে তার প্রাসাদে আর রাজ্যের সমস্ত বিলাস সামগ্রী জঙ্গলার হাতে তুলে দেয় পরিপূর্ণ ভালবাসা পাওয়ার জন্য। কিন্তু বনের মানুষ জঙ্গলার মনের পরিবর্তন হয় না, এমন কি শান্তা তাকে বিয়ে করে দেশের রাজা করে দিয়েও, তাকে বাঁধতে পারে না, বন্য নারী জিউর জন্য সে তখনও ব্যাকুল আর বনের স্বাধীন জীবন তাকে হাতছানি দেয়।

জঙ্গলার আংশিক ভালবাসায় রাণী শান্তা তৃপ্ত হতে পারেনি। সে বুঝতে পেরেছিল যে জঙ্গলার মনে এখনো জিউর জন্য সঞ্চিত রয়েছে ভালবাসা। শান্তা জিউকে ঈর্ষা করে এবং মনে মনে জিউকে হত্যা করার সংকল্প করে কেননা জিউই তার ভালবাসার একমাত্র অন্তরায়। কিন্তু রাণীর সখী প্রীতি তাকে বাধা দেয়—হিংসার বদলে ভালবাসা দিয়ে জয় করে নিতে বলে জিউর মন, আর জিউকে জয় করতে পারলে সহজেই সে জয় করতে পারবে জঙ্গলার মন। প্রীতির কথায় শান্তার ভাবনার পরিবর্তন আসে।

এদিকে জঙ্গলাকে হারিয়ে জিউ হয়ে উঠেছে হিংস্র। বিপদ জনক এবং বিদ্রোহী। শান্তার রাজ্য বিনাশ করার জন্য সে তখন দৃঢ়সঙ্কল্প। আর জঙ্গলা তখন শান্তার রাজ্যের এই সম্পদের মধ্যে খুঁজে বার করতে চাইছে কোন একটা অসঙ্গতি যার জন্য এ রাজ্যে গড়ে উঠতে পারছে না আনন্দমন্দির। এ সময় সাধারণ মানুষের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় জঙ্গলা জানতে পারে যে প্রজাদের মনে সুখ নেই, শান্তি নেই। জমিদার তাদের নিয়মিত শোষণ করছে আর সুদখোর মহাজনদের কাছে তারা ঋণের দায়ে আবদ্ধ। শ্রমিকরা সারা দিন রাত পরিশ্রম করেও পেটভরে খেতে পায় না—আর তাই এ বিষাদ-পুরীতে আনন্দমন্দির গড়ে তোলা সম্ভব নয়। জঙ্গলা এই সব শ্রমিক কৃষক সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষকে মুক্তি দেওয়ার জন্য শান্তার কাছে আবেদন করেছে কিন্তু শান্তা তা শোনেনি—দেশে তখন জ্বলে উঠেছে বিদ্রোহের আগুন। আর এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিচ্ছে জঙ্গলার বনের সাথী জিউ। জঙ্গলা এই বিদ্রোহ থামাতে এগিয়ে গিয়েছে, কিন্তু

কোন ফল হয়নি, জঙ্গলা আহত হয়ে ফিরে এসেছে শাস্তার কাছে। শাস্তা শক্তি প্রয়োগ করে বিদ্রোহ দমন করতে পারেনি এবং শেষ পর্যন্ত শাস্তার সম্মোহন অস্ত্রে ও ক্ষমার মূল্যে রাজ্যের বিদ্রোহ থেমেছে। আর জঙ্গলা, জিউ ও শাস্তার মিলনের মধ্যে এ কাহিনী যখন শেষ হয়েছে তখন এ রাজ্যে আনন্দমন্দির গড়ে তোলার আর কোন অন্তরায় ছিল না।

'আনন্দ মন্দির' নাটকটি নরেশচন্দ্র উৎসর্গ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। নাটকটির ভূমিকায় উল্লেখ আছে যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'জগন্নাথ হলের' ছাত্রেরা এই নাটকটি অভিনয় করেছিল এবং তাদের উৎসাহে নাটকটি সম্পূর্ণ হয়েছে।

'আনন্দ মন্দির' তিন অঙ্কের নাটক। এই নাটকের প্রথম অঙ্কে সাতটি, দ্বিতীয় অঙ্কে পাঁচটি এবং তৃতীয় অঙ্কে এগারটি দৃশ্যের মধ্য দিয়ে কাহিনী ব্যক্ত হয়েছে। এই তেইশটি দৃশ্যের বহু অংশই নাটকের মূল বক্তব্য ও চরিত্র চিত্রণের পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক এবং দীর্ঘ। তাই নাটকের গতি প্রায়ই শ্লথ হয়ে পড়েছে এবং নাটকীয় দ্বন্দ্বটি পরিস্ফুট হতে পারেনি। আবার 'আনন্দ মন্দির' নাটকটিকে কিছুটা রূপকধর্মীও মনে হয়। এখানে রূপকের আড়ালে যেন হিংসা ও অহিংসার সংঘাত দেখিয়ে অহিংসার জয় এবং হিংসার পরাজয় দেখানো হয়েছে সেই সঙ্গে দেখানো হয়েছে ক্ষমার মহত্ত্ব। কিন্তু এই নাটকের মধ্যেই প্রজা-শোষণ অত্যাচার এবং পরিণামে বিদ্রোহ দেখিয়ে নাট্যকার নাটকের প্রত্যাশিত ধারাবাহিকতাটি বজায় রাখতে পারেননি, তাই মনে হয় এই ঘটনাগুলি যেন জোর করে নাটকে নিয়ে আসা হয়েছে। চরিত্র চিত্রণ, কাহিনী বিন্যাস এবং নাটকীয় দ্বন্দ্বের দুর্বলতার জন্য নাটক হিসাবে 'আনন্দমন্দির' উচ্চ প্রশংসার দাবী করতে পারে না। কল্পিত রাজ্যের কবিত্বহীন কাল্পনিক চরিত্রের অবাস্তবতা আমাদের পীড়া দেয়। এই নাটকে শ্রমিক কৃষকদের সমস্যাই একমাত্র কিছুটা বাস্তব বলা যায় এবং নরেশচন্দ্রের প্রথম নাট্য প্রচেষ্টা হিসাবে এর কিছুটা মূল্য অস্বীকার করা যায় না।

'ঠকের মেলা' [১৯২৫] নাটকটি আধুনিক শহরে পটভূমিতে রচিত। এই নাটকটি আপাতদৃষ্টিতে লঘু হাস্যরস পরিবেশিত রহস্যতরল প্রহসন মনে হলেও বস্তুত: নাটকটি সমাজ জীবনের রূঢ় বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি। এই নাটকে নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের চরিত্রের যে বিচিত্র অপরাধপ্রবণতার দিকটি দেখানো হয়েছে তা নিহিত রয়েছে আমাদের সমাজব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক অসাম্যের ভিতরে।

দরিদ্র পিতা নিরুপায় হয়ে তার কন্যাকে বিয়ে দিয়েছিল প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে, ভাড়া করা দানসামগ্রীতে ঘর ভরিয়ে দিয়েছিল আত্মপরিচয় গোপন রেখে। আর দরিদ্র বেকার যুবক নিজেকে ধনী পরিচয় দিয়ে চেয়েছিল ধনী শ্বশুরের সম্পত্তি অধিকার করে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে, কিন্তু পরে তারা বুঝতে পারে যে তারা দুজনই প্রবঞ্চক। শেষ পর্যন্ত অবশ্য নানা জটিলতার পর যুবকটি এই প্রবঞ্চক পিতার কন্যার সঙ্গেই প্রণয়াবদ্ধ হয়ে ঘর বেঁধেছে।

নরেশচন্দ্রের 'ঋষির মেয়ে' [১৯২৬] নাটকটি বৈদিক যুগের পটভূমিতে রচিত।

প্রাচীনকালের ঋষিদের ব্যবহার, অধ্যয়ন অধ্যাপনা, পূজাঅর্চনার রীতি, যাগযজ্ঞ পদ্ধতি এবং তাঁদের পরিবার সম্পর্কে একটা সামগ্রিক চিত্র লেখক এই নাটকের মধ্যে বর্ণনা করেছেন। আলোচ্য নাটকের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন যে 'ঋষির মেয়ে' নাটক, ইতিহাস নয়। কিন্তু তবু তিনি এই নাটকে যে আবেষ্টনী ও চরিত্রের চালচলন বর্ণনা করেছেন তার ঐতিহাসিক সত্যতা প্রমাণের জন্যও তাঁর তথ্য সংগ্রহের প্রমাণ হিসাবে বিভিন্ন গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন।

নরেশচন্দ্র তাঁর 'যৌথ পরিবার' প্রবন্ধে প্রাচীন ভারতের পরিবারের গঠন সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন।[২] সেখানে আমরা দেখতে পেয়েছি যে প্রাচীনকালে যৌথ পরিবার ছিল না, প্রাচীনকালে উপযুক্ত পুত্র বিবাহ করে নতুন অগ্নি প্রজ্বলিত করে নতুন গৃহে স্বতন্ত্র বসবাস করত। আলোচ্য নাটকেও ঋষি আপস্তম্বের গৃহে পত্নী ও কন্যা ব্যতীত অন্য কোন আত্মীয় পরিজনের সাক্ষাৎ আমরা পাই না। তবে গুরুগৃহে বাস করে শিষ্যদের অধ্যয়ন করার নিয়মটি এখানেও দেখা যায়।

ঋষি আপস্তম্বের প্রিয় শিষ্য চারুদত্তের সঙ্গে তাঁর কন্যা সুদত্তার প্রণয়, গোপন বিবাহ ও গৃহত্যাগ এবং আপস্তম্বের বিলম্বিত অনুমোদন ও দক্ষিণাপথে যাত্রা, আলোচ্য নাটকের মূল আখ্যানাংশ। নাটকটির চারটি অঙ্ক। প্রথম অঙ্কে আমরা ঋষি আপস্তম্ব ও ঋষি উগ্রশ্রবার মধ্যে বিরোধ দেখতে পাই। এই বিবাদের কারণ এই যে, আপস্তম্ব মনে করেন 'অথর্ব' বেদ নয় কিন্তু উগ্রশ্রবা মনে করেন যে অথর্ব, বেদ। আপস্তম্বের শিষ্য চারুদত্ত স্নাতক উপাধিলাভের যোগ্যতা অর্জন করার পর, তার সমাবর্তন উৎসবের ঠিক আগে আপস্তম্ব জানতে পারেন যে জিজ্ঞাসু চারুদত্ত ঋষি উগ্রশ্রবার কাছে অথর্বকে বেদ বিবেচনা করে অধ্যয়ন করতে গিয়েছিল। এর ফলে রুদ্রমূর্তি হয়ে আপস্তম্ব চারুদত্তকে আশ্রম থেকে বিতাড়িত করে দেন। যদিও তিনি ঋষি পত্নী শাশ্বতীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে চারুদত্তের সঙ্গেই তিনি কন্যা সুদত্তার বিবাহ দেবেন।

চারুদত্ত আপস্তম্বের আশ্রয় থেকে বিতাড়িত হয়ে বাধ্য হয়ে আশ্রয় নেয় ঋষি উগ্রশ্রবার আশ্রমে। উগ্রশ্রবার আশ্রমে এসে চারুদত্ত কিছুতেই সুদত্তাকে ভুলতে পারে না। তারপর এক চারণীর দৌত্যে চারুদত্ত গোপনে আপস্তম্বের আশ্রমে গিয়ে সুদত্তার সঙ্গে দেখা করে এবং গোপনে যজ্ঞাগারে প্রবেশ করে অগ্নি সাক্ষী রেখে সুদত্তাকে বিবাহ করে কিন্তু আপস্তম্বের কাছে ধরা পড়ে যায়। আর আপস্তম্ব তাকে চোর অপবাদ দিয়ে রাজার বিচারালয়ে পাঠিয়ে দেন।

দ্বিতীয় অঙ্কে এসে আমরা জানতে পারি যে রাজবিচারে চারুদত্ত চোর সাব্যস্ত হয়েছে এবং তাকে চৌর্যবৃত্তির জন্য কপালে শাপদচিহ্ন এঁকে দিয়ে রাজ্য থেকে নির্বাসিত করা হচ্ছে। চারুদত্তের জন্য এ সময় যদিও আপস্তম্ব ও শাশ্বতী মর্মাহত হয়েছে কিন্তু ঋষি আপস্তম্ব কিছুতেই তাকে ক্ষমা করতে পারেনি।

এদিকে সুদত্তা চারুদত্তের জন্য বিচারালয়ে যায় ও সেখানে শুনতে পায় যে রাজ-আদেশে চারুদত্তকে নির্বাসন দেওয়া হয়েছে। সুদত্তা ছুটে গিয়ে বনের সীমায় চারুদত্তের

সাক্ষাৎ পায় এবং দুজনে তখন নদী পার হয়ে অন্য রাজ্যের এক বনে আশ্রয় নেয়। সেখানে গভীর রাত্রে সুদত্তা ও চারুদত্ত আক্রান্ত হয় একদল চণ্ডাল দস্যুর হাতে কিন্তু ভাগ্যক্রমে রাজপুরুষ অগ্নিবর্ণের সাহায্যে তারা রক্ষা পায়।

তৃতীয় অঙ্কে এসে জানা যায় যে চারুদত্ত, অগ্নিবর্ণ ও সুদত্তার মধ্যে এক সুদৃঢ় বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে এবং অগ্নিবর্ণের সহায়তায় চারুদত্ত রাজসভায় অমাত্য পদ লাভ করেছে।

এসময় অগ্নিবর্ণ একদিন সুদত্তার প্রেমভিক্ষা করে সুদত্তার কাছে তিরস্কৃত হয় কিন্তু এই ঘটনায় চারুদত্তের মনে সন্দেহ দেখা দেয় এবং সে সুদত্তাকে তার সতীত্বের পরীক্ষা দিতে বলে। পরীক্ষায় সুদত্তা যদিও নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করে কিন্তু এ সময়ে হঠাৎ রাজার কাছে চারুদত্তের কপালে অঙ্কিত চৌর্যবৃত্তির শ্বাপদ চিহ্নের কথা প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং প্রবঞ্চনার অভিযোগে চারুদত্ত কারাগারে প্রেরিত হয়।

এদিকে দীর্ঘপথ অতিক্রমের পর আপস্তম্ব ও শাশ্বতী সেই রাজ্যে এসে উপস্থিত হয়। দীর্ঘদিন প্রিয় কন্যার অদর্শনে তখন তাদের মনের অনেক পরিবর্তন হয়েছে, তাই কন্যার এই বিপদে আপস্তম্ব স্থির থাকতে পারেননি কেননা ইতিমধ্যে আপস্তম্ব জেনেছেন যে চারুদত্ত তাঁর যজ্ঞাগারে চুরি করতে প্রবেশ করেনি, সে অগ্নি সাক্ষী রেখে তাঁর কন্যার পাণিগ্রহণ করে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিল মাত্র। এবার ঋষি আপস্তম্ব রাজার কাছে নির্দ্বিধায় প্রকাশ করে যে তাঁরই অভিযোগে বিনা অপরাধে চারুদত্ত দণ্ডিত হয়েছিল। চারুদত্ত মুক্তি পায় আর আপস্তম্ব ও অনুতপ্ত অগ্নিবর্ণ দক্ষিণাপথে যাত্রা করে। এই ধর্ম-প্রচার যাত্রায় ঋষির মেয়ে সুদত্তা বাধা দেয় না।

'ঋষির মেয়ে' নাটকটি নরেশচন্দ্রের অন্যান্য নাটকের তুলনায় সুখপাঠ্য। বিভিন্ন চমকপ্রদ নাটকীয় ঘটনার সমন্বয় থাকতে নাটকটি কখনো তার গতি হারায়নি এবং নাটকীয় কৌতূহলটি শেষ পর্যন্ত বজায় থেকেছে। চরিত্র চিত্রণের দিকেও নাটকটিকে সার্থক বলা যায়। নরেশচন্দ্র এই নাটকের 'উপোদ্ঘাতে' লিখেছেন—"সুদত্তার সহিত চারুদত্তের প্রণয় সম্ভাবনার ভিত্তি কচ ও দেবযানীর উপাখ্যান।" তাই নাটকের এই মূল ঘটনাটি পাঠকের অপরিচিত মনে হয় না।

আলোচ্য নাটকটি ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে কলকাতার 'স্টার' থিয়েটারে অভিনীত হয়েছিল। অতীতের বহু বিখ্যাত অভিনেতা ও অভিনেত্রী এই নাটকে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।[৩]

'নারায়ণী' (১৯২৯) যদিও নরেশচন্দ্রের 'পাগল' গল্পের নাট্যরূপ তবু মূল গল্পের তুলনায় নাটকটি অনেকাংশে উৎকর্ষের দাবী করতে পারে।

কাহিনীতে নারায়ণী জমিদার যোগেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র পাগল সত্যেনের স্ত্রী। নারায়ণীর আন্তরিক চেষ্টায়, কর্মে ও সেবায় জমিদার বাড়ীর সকলেই সন্তুষ্ট ছিল। নারায়ণীর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে জমিদার যোগেন্দ্রবাবু চেয়েছিলেন পাগল ছেলে

সত্যেনের অংশ নারায়ণীর নামে উইল করে দিয়ে যেতে কিন্তু তাঁর সে ইচ্ছে পূর্ণ হয় না। এই উইল রেজিস্ট্রেশন্ হওয়ার আগেই যোগেন্দ্রবাবুর মৃত্যু হয়। যোগেন্দ্রবাবুর মৃত্যুর পরেই কিন্তু এই পরিবারে এক বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। সত্যেনের ছোটভাই সুরেন সমস্ত সম্পত্তির লোভে নানা রকম অন্যায় আচরণ করতে থাকে এবং বিভিন্ন মামলা মোকদ্দমা করে সম্পূর্ণ সম্পত্তি অধিকার করতে চায়। এই অবস্থায় বাধ্য হয়ে নারায়ণী আলাদা হয়ে সত্যেনকে নিয়ে বাস করতে থাকে আর সুরেনও উন্মত্ত হয়ে নারায়ণীকে নানা রকম অত্যাচার করতে থাকে। মামলায় নারায়ণীর জয় হয়, কিন্তু সত্যেন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং মারা যায়। অসহায় নারায়ণী তখন তার সকল অহংকার ও বিদ্বেষ ভুলে সুরেনের কাছেই সবকিছু তুলে দেয়।

'নারায়ণী' নাটক চারটি অঙ্কে এগারটি দৃশ্যে বর্ণিত। প্রথম অঙ্কে রয়েছে—সত্যেনের সঙ্গে ছোট ভাই সুরেনের দুর্ব্যবহার। সত্যেনের চলাফেরার অসঙ্গতি, এই জড়বুদ্ধি সত্যেনকে নারায়ণীর সুস্থ করে তোলার চেষ্টা, তার সেবা শুশ্রূষা ইত্যাদি এবং জমিদার যোগেন্দ্রবাবুর নারায়ণীর নামে উইল করে দেওয়ার ইচ্ছা।

দ্বিতীয় অঙ্কে দেখানো হয়েছে উইল রেজিস্ট্রি করার পূর্বেই জমিদার যোগেন্দ্রবাবুর মৃত্যু। নারায়ণী ও সত্যেনের আলাদা হয়ে যাওয়া। সুরেনের নারায়ণীর সঙ্গে সম্পত্তির অধিকার নিয়ে বিরোধ। সুরেনের নারায়ণীকে কেশ আকর্ষণ করে অপমান করা ও পরিণামে নারায়ণীর দারোয়ানের হাতে লাঠির ঘা খাওয়া এবং সুরেনের নিজের স্ত্রীর সঙ্গেও মনোমালিন্য।

তৃতীয় ও চতুর্থ অঙ্কে আমরা দেখতে পাই সুরেনের মনে এক প্রচণ্ড অতৃপ্তি এবং ক্রমশ তার স্বভাবের পরিবর্তন। নারায়ণীর মামলায় জয়লাভ। সত্যেনের মৃত্যু এবং সুরেনের কাছে নারায়ণীর সাহায্য প্রার্থনা এবং তাদের বিরোধের সমাপ্তি। এই অংশে আমরা আর দেখতে পাই যে নারায়ণীর মনে সত্যেনের মৃত্যুতে এক দারুণ বৈরাগ্য এসেছে, সে এখন আর জমিদারীর এক কণাও চায় না। সবই সে সুরেনের হাতে তুলে দেয়, কেননা তার সম্পত্তির প্রয়োজন ছিল শুধু মাত্র জড়বুদ্ধি অবুঝ স্বামীকে রক্ষা করার জন্য। এখন সত্যেনের মৃত্যুতে এবং ইতিপূর্বে তার সন্তানের মৃত্যুতে তার সব আশা-আকাঙ্ক্ষারও সমাপ্তি হয়েছে।

'নারায়ণী' নাটকের প্রতিটি চরিত্রই জীবন্ত ও বাস্তবানুগ। তাদের চলাফেরা ও ব্যবহারের মধ্যেও কোন রকম অসঙ্গতি নেই। সত্যেনের অসংলগ্ন কথাবার্তা এবং চাল-চলনের মধ্যেই তার আধপাগলা ভাবটি প্রকাশ পায়। সুরেনের মদ্যপান ও সম্পত্তি নাশের চেষ্টার মধ্যে তার মনের অতৃপ্তি ও ক্ষোভের আভাস পাওয়া যায়। সত্যেনের তুলনায় সে সবদিক থেকেই সুস্থ অথচ জড়বুদ্ধি সত্যেনের স্ত্রী নারায়ণীর মত তার স্ত্রী হেম নয়, এই কথাটি ও তার ক্ষোভের কারণটিকে বিন্দুমাত্র অস্বাভাবিক বলা চলে না বরঞ্চ তার এই অনুভূতিটি না থাকলেই চরিত্রটিকে অবাস্তব মনে হত। কিন্তু নারায়ণীর শাশুড়ী উমার চরিত্রটি এবং তার বাবা রামগতি ভট্টাচার্যের চরিত্রটি ঠিক বাস্তব বলা চলে না। তারা

নিতান্তই গল্পের প্রয়োজনে কল্পিত। কোন মাতাই এক সন্তানের জন্য অন্য সন্তানের সর্বনাশ কামনা করে না এবং রামগতি ভট্টাচার্যের মত কোন পিতাই অর্থের বিনিময়ে নিজের কন্যাকে পাগল স্বামীর হাতে তুলে দিতে পারে না। যদিও এই ঘটনাঙ্কুর থেকেই 'নারায়ণী' নাটকের জন্ম।

শোনা যায় যে 'নারায়ণী' নাটকটি 'বড় বউ বা নারায়ণী' নামে হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের উৎসাহে 'স্টার' রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছিল এবং জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।[৪]

নরেশচন্দ্রের চারটি নাটকই ভিন্নধর্মী, একটির সঙ্গে অন্যটির সাদৃশ্য নেই। তাঁর এই চারটি নাটকের মধ্যে 'ঋষির মেয়ে' নাটকটিকেই শ্রেষ্ঠ বলা যায়। 'আনন্দ মন্দির' তাঁর প্রথম নাট্য প্রচেষ্টা হিসাবে সহানুভূতি পেলেও নাটক হিসাবে অধিক প্রশংসার দাবী করতে পারে না। 'নারায়ণী' নাটকটি আবেগ ও অনুভূতিপ্রবণ এবং সেই জন্যই জনপ্রিয়। কিন্তু এই রসোত্তীর্ণ নাটকটির মধ্যেও খুব বেশী বিশেষত্ব নেই।

বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে এই আলোচ্য কালসীমায় যাঁরা আগ্রহ দেখিয়েছিলেন তাঁদের সেই আশা কিন্তু সম্পূর্ণ হয় নি, সম্ভবত সিনেমার ব্যাপক অনুপ্রবেশের জন্য এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ গল্প উপন্যাসের আবির্ভাবে নাটক তেমন জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারে নি। নরেশচন্দ্রের নাটকও এই একই কারণে সার্থক হতে পারে নি বলেই আমাদের অনুমান।

৬

প্রকরণ প্রসঙ্গ

'সাহিত্য-প্রকরণ' একটি মিশ্র অভিধা। সাহিত্যের উপকরণ ও তার প্রয়োগ কৌশলই এর ব্যাপক অর্থ। সাহিত্যের ভাব, বিষয়বস্তু, রচনারীতি ইত্যাদি সব কটি দিকেই এর প্রসার, এমনকি এই উপকরণগুলির কার্যকারণ সম্পর্কও এই মিশ্র অভিধার দ্বারাই প্রকাশ করা চলে। ফলে সাহিত্য-প্রকরণ আলোচনা প্রসঙ্গে সাহিত্যের প্রতিটি দিকই কিছুটা বিশ্লেষণ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত কথা-সাহিত্য, প্রবন্ধ এবং নাটক এই ত্রিধারায়ই সাহিত্য রচনা করেছেন তবে কথা-সাহিত্যিক হিসাবেই তিনি পাঠক সমাজে অধিক পরিচিত।

নরেশচন্দ্র যখন পুরোপুরিভাবে সাহিত্যের আসরে প্রবেশ করেছেন [১৯১৯] তখন দেশের সমসাময়িক অবস্থা অত্যন্ত ঘটনাবহুল। সমাজ, সাহিত্য ও রাজনীতি সব দিকেই। বিদেশী সাহিত্য ও বিদেশী জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কারের খবর তখন এ দেশে পৌঁছে বেশ কিছুটা সাগ্রহ কৌতূহল জাগিয়ে তুলেছে। সর্বোপরি রুশ বিপ্লব ও মার্ক্সবাদ শিক্ষিত সমাজ জীবনে পরিচিত হয়ে উঠেছে। স্বাভাবিক কারণেই তাই সমসাময়িক ঘটনার ছায়াপাত বাস্তব দৃষ্টি সম্পন্ন নরেশচন্দ্রের রচনায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আমরা জানি যে—"প্রত্যেক সাহিত্যিক তাঁহার সমসাময়িক সমাজকেই সাহিত্যে

পরিস্ফুট করেন। তিনি সমাজ সম্বন্ধে যত বেশী বাস্তব দৃষ্টি সম্পন্ন ও বিশ্লেষণশীল হইবেন ততই সমসাময়িকতার গণ্ডীর মধ্যে তিনি আবদ্ধ হইয়া পড়িবেন।"[১] নরেশচন্দ্রও তাই সমসাময়িক গণ্ডীর বাইরে যেতে পারেন নি। সমসাময়িক সমস্যার সমাধানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রচিত সাহিত্যের মূল্য হ্রাস পেয়েছে সত্য কিন্তু সর্বশ্রেণীর মানুষের প্রতি সহানুভূতি ও ইতিহাসের ধারাবাহিকতার প্রয়োজনে তাঁর সাহিত্যমূল্য অনস্বীকার্য।

নরেশচন্দ্র তাঁর সাহিত্যে বিশেষত দুটি দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন, এক, জমিদার-কৃষকপ্রজা সম্পর্ক। দুই, সমাজজীবনে নরনারীর সম্পর্ক। আমাদের সমাজ জীবনের নানা সংস্কার ও বিশ্বাসের ফলে যে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে তার মধ্যে নারী সমস্যা অন্যতম। বিধবা, অশিক্ষিত ও আশ্রয়হীন নারীদের সমস্যা তখন নিরসন করার মতো কোন উপায় বা নির্দেশ সমাজ দিতে পারে নি। তখন এই সমাজে নারীদের সম্মানিত কোন বৃত্তি গ্রহণের প্রথা নেই, নারীদের দ্বিতীয় বিবাহ প্রায় অপ্রচলিত এবং আর্থিক কারণে নারীদের বিবাহ সমস্যাসঙ্কুল হয়ে দাঁড়িয়েছে, ফলে ক্রমশ সে সময় নরনারী সম্পর্ক জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠেছে। জমিদার ও প্রজার সম্পর্কও তখন এমন একটা পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যেখানে উভয়পক্ষই নানা প্রকার বাহ্যিক কারণে পূর্ববর্তী সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। অতএব এদুটি সামাজিক পরিস্থিতিই তাঁকে সাহিত্য উপকরণ হিসাবে গ্রহণ করতে অধিক উৎসাহী করে তোলে। 'আনন্দমন্দির' [১৯২৩], 'রাজগী' [১৯২৫], 'রূপের অভিশাপ' [১৯২৮] ও 'রবীন মাস্টার' [১৯৩৬] ইত্যাদি রচনার মধ্যে আমরা সুস্পষ্টভাবে জমিদার-প্রজাকৃষক সম্পর্ক দেখতে পেয়েছি।

'আনন্দমন্দিরে' তিনি বলতে চেয়েছেন "প্রজারা বাঁচতে চায় যথার্থ মানুষের মত।" —সেখানে শ্রমজীবী মানুষ বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে, "শ্রমিক বেতন বেশী চায়, কাজ কম করতে চায়, চাষীরা বলে জমিদারকে খাজনা দেবে না, মহাজনকে ধার শোধ দেবে না—সবাই বলছে যে আমরা খেটে মরবো আর সুখ করবে তারাই যারা এক ফোঁটা পরিশ্রম করবে না—সে হবে না।"[২] ...."প্রজারা চায় কি—তারা বাঁচতে চায়, পরিমিত পরিশ্রম করে উপযুক্ত অন্নপান পেয়ে বেঁচে থাকতে চায়—অলস অকর্মণ্য কতকগুলি লোক যে শ্রমিকদের রক্ত দিয়ে কেনা সম্পদ কেড়ে নিয়ে বিলাসে অপব্যয় করবে সেটা তারা বারণ করতে চায়......ওদের প্রাণ যে এরা রোজ রোজ শুষে নিচ্ছে।"[৩]

'রবীনমাস্টারে' প্রজারা প্রশ্ন করেছে "ভগবানের জমিন চাষ করি আমরা তার জন্য খাজনা দেব কাকে?"

আবার সমাজজীবন ও নরনারী সম্পর্ক বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা আমরা দেখতে পেয়েছি তাঁর উপন্যাস 'অগ্নিসংস্কার' [১৯২০], 'শান্তি' [১৯২৩], 'বিপর্যয়' [১৯২৪], 'মিলনপূর্ণিমা' [১৯২৬] ও 'দুষ্টগ্রহ' [১৯২৯] ইত্যাদিতে।

চরিত্র চিত্রণের দিকে নরেশচন্দ্র বেছে নিয়েছেন এমন সব শ্রেণীর মানুষদের যারা সাহিত্যে তখনও পুরোপুরিভাবে স্থায়ী আসন পায় নি। যদিও পূর্ববর্তী কোন কোন সাহিত্যিকের রচনায় শুধুমাত্র প্রবেশাধিকার পেয়েছে। তাঁর রচিত চরিত্রে এসে দেখা দিল—বাড়ীর ঝি (ঝি), ভৃত্যপুত্র (শেষপথ), মৃৎশিল্পী (সর্বহারা), নটী অভিনেত্রী (শুভা), নার্স (সর্বহারা), ইন্সিওরেন্সের মহিলা ক্যানভাসার (পিছল পথের শেষে), অবৈধ সন্তান (রক্তের ঋণ), কুমারী মাতা (অসতী), বিচারাধীন আসামী (বিচার), মুসলমান ফেরিওয়ালা (দুষ্টগ্রহ), গয়লা (পরিণাম), যাত্রাদলের অভিনেতা (গ্রামের কথা) ও পাগল (বিশ্বনাথ) ইত্যাদি। এই সব চরিত্রকে রূপদানের জন্য তিনি উদ্দেশ্যমূলকভাবেই হয়ত কাহিনী গড়ে তুলেছেন এবং নিঃসঙ্কোচে নিজস্ব বক্তব্য পরিবেশন করেছেন। আলোচনা করেছেন গান্ধীবাদ ও মার্ক্সবাদ।

কাহিনীর উপস্থাপনার মধ্যে প্রধানত দুটি রীতি দেখা যায়। এক, বর্ণনামূলক—যেখানে লেখক কিছুটা নিরপেক্ষভাবে অনর্গল কাহিনী বলে গিয়েছেন সেই কাহিনীর বর্ণনার মধ্য দিয়েই চরিত্রগুলো প্রকাশলাভ করেছে। 'বিপর্যয়' [১৯২৪], 'শেষপথ' [১৯৩৪], 'রবীনমাস্টার' [১৯৩৬] ইত্যাদি উপন্যাসে এই রীতি অনুসরণ করা হয়েছে। দুই, স্মৃতিচারণামূলক উপন্যাস—এই উপন্যাসগুলির ক্ষেত্রে প্রায় কাহিনীই উত্তম পুরুষের জবানীতে রচিত, আবার কোথাও কাহিনী আরম্ভ হবার পরই নায়ক অন্যের কাছে নিজের কাহিনী ব্যক্ত করেছে, লেখক শুধুমাত্র স্থানে স্থানে মন্তব্য রেখে সূত্রধারের কার্য নির্বাহ করেছেন। 'রাজগী' [১৯২৫], 'বংশধর' [১৯৩৫] 'আমি ছিলাম' [১৯৫১], 'স্বপ্নসৌধ' [১৯৬১] ইত্যাদি এই রচনানীতির অন্তর্গত। আবার গল্পের মধ্যে অন্য একটি গল্প পরিবেশন করার রীতিও তাঁর এই পর্যায়ের রচনায় দেখতে পাওয়া যায়। যেমন 'ঠানদিদি' [১৩২৪] ও 'বিচার' [১৩৩৪]।

নরেশচন্দ্রের গল্প পরিবেশনরীতির অন্য একটি বৈশিষ্ট্য হলো, গল্পে কোন একটি চরিত্র মূল আখ্যান অংশকে সম্পূর্ণ ও অর্থবহ করার জন্য অন্য একটি কাহিনী বা ঘটনা বিবৃত করে। যেমন 'ঝি' গল্পের কমলা এবং 'সতী' উপন্যাসের বিমলা।

আবার আরো একটি রীতি তিনি ব্যবহার করেছেন, তা হচ্ছে গল্পের চরম নাটকীয় ঘটনাটি নিয়েই কাহিনী শুরু করা। এবং এই ধরনের কাহিনীর বিস্তার ঘটেছে চরম-ঘটনার পূর্ববর্তী কার্যকারণ বিশ্লেষণে বা কাহিনীর পরবর্তী ঘটনা বিন্যাসে। 'অসতী' [১৯২৭] ও 'বিচার' [১৯২৮] গল্প এই রীতিতে রচিত।

নরেশচন্দ্রের বর্ণনামূলক রচনারীতির মধ্যে শ্রেষ্ঠতার দাবী রাখতে পারে যে স্টাইল তা হচ্ছে, নায়ক বা নায়িকার মনে একটি বাসনা বা জিজ্ঞাসার উদয় হলো, নায়ক বা নায়িকা সেই বাসনা বা জিজ্ঞাসা নিবৃত্তি করার জন্য নানা প্রতিকূল বা অনুকূল অবস্থার ভিতর দিয়ে এগিয়ে চললো এবং লেখকের কাহিনীও সেই সঙ্গে এগিয়ে চললো। এধরনের উপন্যাসের নায়ক বা নায়িকা শেষ পর্যন্ত কখনো সফল হয়েছে, কখনো হয় নি। আর লেখকও কাহিনী সমাপ্ত করেছেন। এই শ্রেণীর উপন্যাসগুলি অধিক পরিমাণে

তত্ত্বনির্ভর বা উদ্দেশ্যমূলক রচনা। 'শুভা' [১৯২০], 'ব্রতী' [১৯৩০], 'সর্বহারা' [১৯৩০], 'পরিণাম' [১৯৩৩] ইত্যাদি উপন্যাস এই শ্রেণীর। "শুভাই এই প্যাটার্নের সর্বপ্রথম সার্থক প্রয়োগ এবং নরেশচন্দ্র পথিকৃত্তির দাবী করতে পারেন।"[৪]

আমরা জানি যে বিভিন্ন রোমান্টিক লেখক তাঁদের কথাসাহিত্যে এমন পরিবেশ ব্যবহার করেন যা আমাদের সঠিক পরিচিত নয় এবং তাঁদের রচিত সেই পরিবেশের প্রভাবে অতি আশ্চর্যজনক ঘটনাও স্বাভাবিক মনে হয় বাস্তববাদী নরেশচন্দ্র কিন্তু পরিবেশ বর্ণনায় স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর কথাসাহিত্যে তিনি আমাদের পরিচিত পরিবেশই গ্রহণ করেছেন। অবশ্য এর ব্যতিক্রম তিনি তাঁর 'কাঁটার ফুল' উপন্যাসের রোমান্টিক যুবক অবনীমোহনের প্রকৃতির অভিসারের মধ্যে দেখিয়েছেন, —যেখানে দেহাতী মেয়ে 'কুন্তয়া'কে নায়কের বনদেবী মনে হয়েছে। কলকাতার মেসবাড়ী, গ্রাম বাংলা ও মধ্যবিত্ত সংসার থেকেই তিনি উপন্যাসের পরিবেশ রচনা করেছেন।

নরেশচন্দ্রের সাহিত্যে নরনারীদের মানসিক ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণের একটা ঝোঁক অতিমাত্রায় স্পষ্ট, তথাপি তাঁর রচিত অনেক চরিত্রের আচরণ যেন সহজ, সরল বা স্বাভাবিক নয়। এই অসঙ্গতি থাকাটাই যেন তাঁর রচিত চরিত্রগুলিকে বিশিষ্টতা দিয়েছে। যেমন—'পাপের ছাপ'এর [১৯২১] মেঘনাদের জন্য অপরাধী মনোরমার সংস্পর্শে বার বার আসা-যাওয়া বা মেঘনাদের আশ্রিতা মেয়ে সুনীতির মেঘনাদ সম্পর্কে পাপ চিন্তাভাবনা। 'শান্তি' [১৯২৩] উপন্যাসে গোপা ও কমলের অজ্ঞাত-বাসকালে ব্যবহার।

'বিপর্য্যয়ে' [১৯২৪] অনীতার ইন্দ্রনাথের প্রতি প্রেম-নিবেদনের রীতি। তার বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ।

'দুষ্টগ্রহ' [১৯২৯] উপন্যাসে মন্মথের অসংযত ব্যবহারের পরও করুণার তার বাড়ীতে যাওয়া। এবং একদা শিক্ষয়িত্রী করুণার মুসলমান ফেরিওয়ালা ফকীরের সাথে ঘর করা বা পরোপকারী রমেনকে সন্দেহ করা এবং পরে ভালবাসা জানিয়ে চিঠি দেওয়া।

'পিছল পথের শেষে'র [১৯৩৭] সুজাতার প্রতি বিকাশের বার বার কু-প্রস্তাবের পরও বিকাশ সম্পর্কে সুজাতার সতর্ক না হওয়া ইত্যাদি। হয়ত ফ্রয়েডীয় মগ্নচৈতন্য দিয়ে এর কারণ ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

আমরা জানি যে বস্তুর পরিবর্তনের মতই মানুষের পরিবর্তনের কারণও সম্পূর্ণ আভ্যন্তরীণ, বাহিক কারণ শুধুমাত্র তার প্রকাশ ঘটায়। লেখক মনে করতেন যে প্রতিটি মানুষই স্বতন্ত্র। ভিন্ন ভিন্ন মানুষের মনের ইচ্ছা বিভিন্ন হতে বাধ্য এবং একই পরিবেশে বেড়ে ওঠা মানুষের মধ্যেও পার্থক্য থাকবেই। এই বক্তব্য তিনি অংশত বর্ণনা করেছেন 'পিতা পুত্র' [১৯২৫], 'বংশধর' [১৯৩৫] এবং 'স্বপ্নসৌধ' [১৯৬১] উপন্যাসে। আবার আমরা তাঁর উপন্যাসে দেখতে পেয়েছি যে এক বা একাধিক বাহ্যিক কারণ

নায়ক বা নায়িকার মনের সুপ্ত বাসনাকে জাগিয়ে তুলতে সহায়তা করেছে। 'পাপের ছাপ' উপন্যাসের মেঘনাদ বা 'পিছল পথের শেষে'র নায়িকা সুজাতার সুপ্ত ইচ্ছা বাহ্যিক কারণেই প্রকট হয়ে উঠেছে। 'বিপর্য্যয়' উপন্যাসের বালবিধবা মনোরমার কঠিন ব্রহ্মচর্য ক্রমশঃ রূপান্তরিত হয়ে তাকে দ্বিতীয় বিবাহ করতে উৎসাহী করে তুলেছে।

নরেশচন্দ্র যখনই সাধারণভাবে পাত্রপাত্রীদের মানসিক অবস্থা ব্যক্ত করার সুযোগ পান নি তখনই স্বপ্নদর্শন বা পত্রের সাহায্যে নিয়েছেন। 'তৃপ্তি' [১৯২৭] উপন্যাসের মিলনটি সংঘটিত হয়েছে 'পত্রের কারণেই। 'মুগ্ধা' [১৯১২] ক্ষুদ্র উপন্যাসের মূল জটিলতার কারণও পত্র। 'শেষপথ'এর [১৯৩৪].শারদার মনের পরিবর্তনের কারণ তার স্বপ্নদর্শন। লেখক আবার কোথাও কোথাও পাত্রপাত্রীদের মানসিক অবস্থা বর্ণনার জন্য স্বগত সংলাপ ব্যবহার করেই তৃপ্ত থাকেন নি, পাঠকদের কার্যকারণ অনুধাবনের জন্য স্বয়ং বক্তব্য রেখেছেন। 'বিপর্য্যয়' [১৯২৪] গ্রন্থে মনোরমার সাজসজ্জা প্রসঙ্গে লেখকের মন্তব্য—

"আমরা তার মনের তলার খবর রাখি—সেখানে তার নিজের অজ্ঞাতসারে যে সব প্রক্রিয়া ঘটিয়া সজ্জার এই আনন্দবোধ জন্মিয়াছিল তাহা সংক্ষেপে এই—অমল তাহাকে ভালবাসে আজ সে তাহা বুঝিয়াছে—তাই নিজের কাছে আজ তার দাম বাড়িয়া গিয়াছে। যে তুচ্ছ শরীরকে সে এতদিন কেবল পীড়ন করিয়াই আসিয়াছে তাহাকে আজ অমলের খাতিরেই একটু আদর করিতে ইচ্ছা হইতেছিল। ……এ আশা সে কিছুতেই ছাড়িতে পারিতেছিল না যে অমল আবার আসিয়া তার প্রেম ভিক্ষা করিবে। তার মনের গোপনতম কন্দরে সে সেই শুভ মুহূর্তের প্রতীক্ষা করিতেছিল এবং সেই শুভ সুযোগ ঘটাইবার জন্যই নিজেকে অমলের চক্ষে সম্পূর্ণরূপে নয়নাভিরাম করিবার জন্য আকাঙ্ক্ষা করিতেছিল।"[পৃঃ ২৫১]

এই দুটি রীতির প্রবক্তা নিঃসন্দেহে বঙ্কিমচন্দ্র।

মানব চরিত্রগঠন সম্পর্কে লেখক তাঁর প্রায় প্রতিটি রচনায়ই নিজস্ব একটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। সম্ভবত তাঁর মনে জিজ্ঞাসা ছিল যে এই ব্যাপারে পরিবেশ বা বংশানুক্রম কোনটি কতবেশী ক্রিয়াশীল। 'রক্তের ঋণ' [১৯২২], 'রাজগী' [১৯২৫], 'পিতাপুত্র' [১৯২৫] ও 'বংশধর' [১৯৩৫] উপন্যাসগুলির মধ্যে লেখকের এই জিজ্ঞাসার পরিচয় পাওয়া যায়। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে লেখক দেখিয়েছেন যে মানুষের চরিত্র গড়ে ওঠে যথার্থ শিক্ষা ও পরিবেশের মধ্যে, যদিও বংশানুক্রমকে তা কখনো সম্পূর্ণ অতিক্রম করতে পারে না।

নরেশচন্দ্র সাহিত্যের উপকরণ হিসাবে বেছে নিয়েছেন মোটামুটি তিনটি বিষয়। সমসাময়িক ঘটনা, সমাজনীতি ও মানবমনের অনন্ত রহস্য কিন্তু এর কোনটিই একক বা বিচ্ছিন্ন নয়। আসলে তিনি সমাজনীতির উপর সমসাময়িক ঘটনার প্রভাব এবং সেই পটভূমিতে মানবমনের অনন্ত রহস্যের সন্ধান করেছেন।

সমসাময়িক ঘটনা প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছেন, গান্ধীজীর আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ, বিশ্বযুদ্ধ ইত্যাদি এবং সমসাময়িক সাহিত্য প্রসঙ্গও তিনি বাদ দেন নি।

'শুভা' উপন্যাসে তিনি প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের 'সিঁদুর কৌটা'র উল্লেখ করেছেন এবং 'দ্বিতীয় পক্ষ' গল্পে রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের আলোচনা করেছেন। সমাজনীতি নিয়ে আলোচনায় তিনি দেখিয়েছেন নারীসমস্যা, বিবাহ সমস্যা, সমবায় পদ্ধতি, কৃষকদের সমস্যা, মার্ক্সবাদ ইত্যাদি আর মানবমনের অনন্ত রহস্য প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন বিভিন্ন মনস্তাত্ত্বিকের কথা। তিনি দেখাতে চেষ্টা করেছেন সভ্য ভদ্র মানুষেরও জান্তব দিক—ঈর্ষা, প্রতিহিংসাপরায়ণতা ইত্যাদি। নারীদের বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন সম্পর্কেও তিনি তাঁর চিন্তাভাবনা প্রকাশ করেছেন। তাঁর কোন কোন রচনায় দেখা যায় যে নারীর সতীত্ব সম্পূর্ণ মানসিক ব্যাপার অর্থাৎ চিত্তের পরিপূর্ণ শুদ্ধতা থাকলে, দৈহিক অশুদ্ধি নারীর সতীত্বকে ম্লান করতে পারে না। সেজন্যই স্বামীগৃহত্যাগিনী 'শুভা' আমাদের সহানুভূতি হারায় নি, সহানুভূতি হারায়নি রূপোপজীবিনী বিলাস (সতী), হাফ গেরস্ত সন্ধ্যার (পাঁকের ফুল) আচরণে আমরা সন্দেহ করি নি, কুমারী মাতা লতিকাকে (অসতী) আমাদের অসতী মনে হয় নি একবারও।

নরেশচন্দ্রের কথাসাহিত্যের চরিত্রদের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল আত্মহত্যা বা গৃহত্যাগ করার প্রবণতা। তার রচিত অনেক কাহিনীতেই নারীপুরুষ যখনই সমাজ সংসারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার অন্য উপায় খুঁজে পায় নি, অথচ প্রতিবাদ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছে, তখনই তারা বাধ্য হয়েছে—হয় আত্মহত্যা নয়তো গৃহত্যাগ করতে। যদিও সর্বক্ষেত্রেই এই গৃহত্যাগ বা আত্মহত্যাই কাহিনীর পরিসমাপ্তি নয়—শুধু মাত্র 'একা' গল্পে রামলোচনের গৃহত্যাগে গল্পটি সমাপ্ত হয়েছে এবং আত্মহত্যায় কাহিনী সমাপ্ত হয়েছে 'ঝি' গল্প ও 'রূপের অভিশাপ' উপন্যাসে। হয়তো প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আত্মসম্মান বজায় রাখার জন্য, দুর্বল ও অক্ষম মানুষের প্রতিবাদের প্রচলিত শেষ অস্ত্র হিসাবেই এদুটি উপায় নরেশচন্দ্র গ্রহণ করেছেন।

নরেশচন্দ্রের সমগ্র কথাসাহিত্যের অন্তর্গত প্রায় কুড়িটি গ্রন্থে এই আত্মহত্যা অথবা গৃহত্যাগের উল্লেখ আছে। তার প্রথম কথাসাহিত্য 'মুগ্ধা' [১৯১২] ক্ষুদ্র উপন্যাসে, আমরা দেখতে পাই যে, স্বামীর মিথ্যা সন্দেহের প্রতিবাদে সুশীলা গৃহত্যাগ করেছে। এই একই কারণে গৃহত্যাগ করেছে 'ঝি' [১৯১৯] গল্পে কমলা, মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় 'শুভা' [১৯২০], বঞ্চনার জ্বালায় 'রক্তের ঋণের' [১৯২২] সাঁওতাল মেয়ে রূপসী, স্বামীর সন্দেহের প্রতিবাদে 'দূরের আলো' [১৯২৬] উপন্যাসের কুমুদিনী, 'তৃপ্তি' [১৯২৭] উপন্যাসের নায়িকা মিনতি ও 'অসতী' [১৯২৯] গল্পের লতিকা।

'বিপর্যায়' [১৯২৪] উপন্যাসের হিন্দু বিধবা মনোরমা ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের জন্য গৃহত্যাগ করেছে। আর অনিতা গৃহত্যাগ করেছে প্রেমের অতৃপ্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায়, বৈষ্ণব ধর্মে আশ্রয় নিয়ে। 'একা' [১৯২৪] গল্পে সংসারের জ্বালায় অসহায় বৃদ্ধ রামলোচন গৃহত্যাগ করেছে। 'দুষ্টগ্রহ' [১৯২৮] উপন্যাসে করুণা গৃহত্যাগ করেছে নতুন ভাবে নতুন সংসার করে বাঁচার তাগিদে, নতুন ঘর বাঁধার স্বপ্ন নিয়ে সে ঘর ভেঙেছে।

'পাপের ছাপ' [১৯৩২, প্রথম প্রকাশ, মেঘনাদ নামে, ১৯২০] উপন্যাসে সরিৎ গৃহত্যাগ করেছে স্বামী মেঘনাদের সঙ্গে আদর্শগত বিরোধে এবং 'পিছল পথের শেষে' [১৯৩৭] সুজাতা বাড়ী ছেড়ে মেসে আশ্রয় নিয়েছে গৃহবিবাদের ফলে। 'হারজিত' [১৯২৯] উপন্যাসে মঞ্জুলিকার গৃহত্যাগের কারণ স্বামীর উপর অভিমান। এই একই কারণে 'খেয়ালের খেসারৎ' [১৯৩৭] গ্রন্থের অন্নপূর্ণাও গৃহত্যাগ করেছে। 'কণ্ঠাভরণ' [১৯৪৮] উপন্যাসের রেখার গৃহত্যাগের কারণ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তাকে ঠিক গৃহত্যাগও বলা চলে না। 'আমি ছিলাম' [১৯৫১] গ্রন্থে মণিকা গৃহত্যাগ করেছিল দেশের কাজ ও রাজনীতি করার জন্য আর তার বোন বাড়ী ছেড়েছে সিনেমার নায়িকা হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে কিন্তু তবু এই সব গৃহত্যাগের কারণও নিঃসন্দেহে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার প্রতিবাদ।

নরেশচন্দ্রের 'ঝি' [১৯১৯] গল্পের কমলা আত্মহত্যা করেছে। সেই গল্পের গৃহকর্ত্রীও আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে। আবার নরেশচন্দ্রের শেষ উপন্যাস 'স্বপ্নসৌধে' [১৯৬১] মূল চরিত্র শরৎও আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে। 'দূরের আলো' [১৯২৬] উপন্যাসে কুমুদিনী এবং 'কণ্ঠাভরণ' [১৯৪৮] উপন্যাসে রেখাও আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে। কিন্তু 'পাপের ছাপ' উপন্যাসের সুনীতি ও 'রূপের অভিশাপের' [১৯২৮] পরী তাদের সব জ্বালাযন্ত্রণার অবসান ঘটিয়েছে আত্মহত্যা করে, কেননা সমাজে বেঁচে থাকার কোন অর্থ তারা খুঁজে পায় নি —বেঁচে থাকার অর্থ খুঁজে পায় নি 'ব্রতী' [১৯৩০] উপন্যাসের নায়ক মৈনাকও।

নরেশচন্দ্রের অধিকাংশ রচনার ভাষাই সাধুভাষা। তিনি দীর্ঘবাক্য ব্যবহার করেছেন। সাহিত্যে উপমা, ব্যঞ্জনা বা আভাস ব্যবহারের ব্যাপারে তিনি ছিলেন অতিমাত্রায় সংযমী যেহেতু স্পষ্ট বক্তব্য ও তত্ত্ব প্রকাশের দিকেই তিনি ছিলেন অধিকতর সচেতন। ফলে তাঁর রচিত নরনারীর নিভৃত আলাপ বা আচরণ বর্ণনা অনেক স্থলেই বে-আব্রু হয়ে পড়েছে, ভাষার অবগুণ্ঠনে গোপন ও রহস্যময় থাকে নি। 'পিছল পথের শেষে' উপন্যাসে বিকাশ সুজাতাকে বলছে—'কাল বাগানে নিয়ে যাব। সেখানে হবে রাত্রি বাস।' কিন্তু কালানুক্রম লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে তাঁর ভাষা-রীতির পরিবর্তন হয়েছে। কোন কোন উপন্যাসে তিনি চলিত ভাষাও ব্যবহার করেছেন, যেমন, 'রবীনমাস্টার' [১৯৩৬], 'স্বপ্নসৌধ' [১৯৬১] ইত্যাদি।

নরেশচন্দ্রের রচনায় প্রকৃতির বর্ণনা খুব বেশী নেই, শুধুমাত্র কাহিনীর প্রয়োজনীয়তায় প্রকৃতির পটভূমি মাঝে মাঝে এসে দেখা দিয়েছে। তাঁর প্রথম দিকের প্রকৃতি বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ উভয়ের প্রভাবই স্পষ্ট। যেমন—

'সেদিন ভবানীপুরের এই নিভৃত বাড়ীখানিতে বসন্তের বড় উপদ্রব হইয়াছিল। পরিষ্কার সাজান বাগানখানিতে বাছা বাছা নানা জাতীয় ফুল মনের আনন্দে হাসিতেছিল ও তীব্র আনন্দময় মধুর দক্ষিণ সমীরণের তারে দুলিতেছিল।'

অথবা—'তখন রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর। সমস্ত জগৎ সুপ্ত, কেবল মাঝে মাঝে এক আধখানা ভাড়াটে গাড়ীর ঘড়ঘড়ানি ও তাহার সুকণ্ঠাভিমানী চালকের কর্কশ উচ্চ সঙ্গীতধ্বনি শুনা যাইতেছে। রাস্তার গ্যাসের আলোগুলি নিবাতনিষ্কম্প স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া যেন কিসের প্রতীক্ষা করিতেছে।' (মুক্তা ১৩১৮ : ১৯১২)

নায়ক নায়িকার আত্মস্থ সংলাপ বা ভাবনা নরেশচন্দ্র তাঁর প্রতিটি উপন্যাসেই ব্যবহার করেছেন। এই ধরনের ভাবনার উল্লেখ 'কল্লোল' পূর্ব যুগের একটা প্রচলিত রীতি। আমরা রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের উপন্যাসেও এই রীতির সন্ধান পাই। নরেশচন্দ্র অবশ্য এই রীতি একটু স্বতন্ত্রভাবে প্রয়োগ করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে ব্যবহারজীবী এবং যুক্তি বিজ্ঞানের ছাত্র নরেশচন্দ্র তাঁর বক্তব্য চারিদিক ঘিরে এমনভাবে প্রয়োগ করেছেন, যার ফলে পাঠক তাঁর কোন বক্তব্য বা চরিত্রকে লেখকের পরিকল্পনা ভিন্ন চিন্তা না করতে পারে। অর্থাৎ লেখক এ ব্যাপারে পাঠকদের স্বাধীনতায় সম্পূর্ণ হস্তক্ষেপ করেছেন। তবে এই রীতি ব্যবহারের মধ্যে তিনি যে ভাষা ব্যক্ত করেছেন তার মধ্যে এমন একটা সুন্দর বিস্ময়কর অভিব্যক্তি আছে যা পাঠক হৃদয়কে অনায়াসে স্পর্শ করে। যেমন 'শুভা' উপন্যাসে—

'হঠাৎ তাহার মনে হইল কি আশ্চর্য তাহার মন, চাঁপার প্রস্তাবে তাহার বড় অপমান বোধ হইয়াছিল, অথচ নগেনের প্রণয়িনী হইয়া আজ সে আনন্দে পাগল হইয়া উঠিয়াছে, কোথায় রহিল তার জীবনের সব আদর্শ আর কোথায় তাহার এই ঘৃণ্য জীবন।'

'কিন্তু সে পাপী কিসে? জগতে সে কেবল একজনকেই ভালবাসিয়াছে—একজনের রূপে গুণে মুগ্ধ হইয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছে। আর দশজন ধরিয়া বাঁধিয়া আর একটা লোককে তার উপর যথেচ্ছা প্রভুত্ব করিবার অধিকার দিয়াছিল, সে অধিকার ও সে অত্যাচার সে অস্বীকার করিয়াছে বলিয়া সে লোকের চক্ষে পাপী হইতে পারে, কিন্তু যদি ন্যায়বান ঈশ্বর থাকেন তবে তাঁর চক্ষে সে পাপী হইবে? অসম্ভব।'

'পাপের ছাপ'এর মেঘনাদের ভাবনার মধ্যে লেখক মেঘনাদকে আত্মসমালোচনার সুযোগ করে দিয়েছেন—'ত্যাগের গৌরবে সে অতিমাত্রায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল না। ... তাহাকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, তাহার আশাশূন্য উৎসাহশূন্য জীবনের এক অন্তহীন বেদনা। সে আজ হঠাৎ আবিষ্কার করিয়া ফেলিল যে এতদিন সে যে কর্তব্যনিষ্ঠার স্পর্দ্ধা করিয়া আসিয়াছে ও ত্যাগের গৌরবে উৎফুল্ল হইয়াছে, তার ভিতর একটা অতল অভিমান ও অপরিমেয় যশঃলিপ্সা আছে।·· ···আজ যে কর্তব্য সে মাথা পাতিয়া লইয়াছে তাহাতে কেবল ত্যাগ আছে, প্রতিষ্ঠা নাই, খ্যাতি নাই······বরং সমস্ত জীবন ভরিয়া একটা মিথ্যা ভিত্তিশূন্য কলঙ্ক ও তীব্র অভিসম্পাত ও উপহাস তাহাকে পরিপাক করিতে হইবে।'

মানুষ তার অতীতকে অস্বীকার করতে পারে না। আমরা অতীতকে যতই নির্বাসিত করতে চাই ততই সে জোর করে আমাদের ভাবনায় মধ্যে এসে পড়ে। লেখক তাঁর স্বভাবসুলভ গম্ভীর ভাষায় 'মেঘনাদের' ভাবনার মধ্যে এই সত্যটি প্রকাশ করেছেন।

"তার মনের ভিতর এই চায়াচ্ছন্ন অতীত কাহিনী ভাসিয়া উঠিয়া তার সমস্ত ভবিষ্যত কল্পনা আজ অন্ধকারে ঢাকিয়া দিল। তার মনের ভিতর যে একটা কুৎসিত কলঙ্ক-কাহিনী লুকান আছে, একটা পাপের কলুষস্পর্শ যে তার জীবনকে কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে সেকথা অতি তীব্র বেদনার সঙ্গে সে অনুভব করিল। তার মনে হইল যে, যে অতীতকে সে একেবারে সিন্দুকে বন্ধ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিল তার আশার এই প্রথম উন্মেষের সময় সে যেন কেমন করিয়া ছাড়া পাইয়া আসিয়া তাহার ভবিষ্যতের অমৃত ভাণ্ডারকে বিষাক্ত করিয়া দিতেছে।'

নরেশচন্দ্র তাঁর উপন্যাসের সংলাপে প্রায় সর্বত্রই চলিত ভাষা ব্যবহার করেছেন। কিন্তু চলিত ভাষার মধ্য দিয়েও তিনি সমাজ জীবন সম্পর্কে তার গূঢ় বক্তব্য রেখেছেন। সমাজে অরক্ষিত নারীর প্রতি ভালবাসা জানানোর অন্তর্নিহিত অর্থ অধিকাংশ ক্ষেত্রে একটাই। লেখক এই সম্পর্কে দুটি ভিন্ন আদর্শের নারীর মুখ দিয়ে প্রায় একই বক্তব্য বলিয়েছেন এবং আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করতে হয় যে সংলাপ দুটির রচনাকালের ব্যবধান প্রায় সতের বছর। 'শুভা' উপন্যাসের শুভা বলেছে—

'আমি যদি আপনাকে বলি, আমি আপনাকে ভালবাসি তবে কি আপনি খুসী হয়ে বাড়ী চলে যাবেন? নিশ্চয়ই নয়। আপনি আসলে চান আমার এই সুন্দর শরীরখানা দখল করতে, ভালবাসার অজুহাত দিয়ে এমন একটা সম্পত্তি আয়ত্ত করতে চান যা দশজনকে দেখিয়ে গর্ববোধ করতে পারবেন।' [শুভা। ১৯২০। পৃঃ ১১৪]

'পিছল পথের শেষে'র নায়িকা সুজাতাও এই 'ভালবাসা' সম্পর্কে বলেছে—'আপনারা আমায় ভালবাসেন, ভালবাসা চান কাজেই ভালবাসাবাসি বাজে কথা, আপনারা চান আমার যৌবন, আমার দেহ, পত্নীর সম্মান দিয়ে নয়, পতিতার পঙ্কে আমাকে ডুবিয়ে আপনারা আপনাদের ভোগ-লালসা পরিতৃপ্ত করতে চান।' [পিছল পথের শেষে। ১৯৩৭]

মৃত্যু সম্পর্কে চলিত ভাষায় নরেশচন্দ্র একটি আশ্চর্য সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন—

"বিভীষিকার মত মৃত্যু মানুষের জীবনটাকে ছায়াময় করে রাখে, অতি নির্দ্ধারিত সত্য বলে সবাই তাকে জানে। কিন্তু তবু মানুষ মৃত্যুর কথা নিয়ে খেলা করে, যখন মৃত্যু থাকে দূরে। হঠাৎ, সেই খেলার মাঝপথে মরণের সহসা আবির্ভাব বিকল করে দেয় অতি বড় শক্তিমান মানুষকেও। কলকণ্ঠ নীরব হয়ে যায়, ভাবস্রোত জমাট বেঁধে যায়, শত্রুর অস্ত্রও স্তব্ধ হয়ে যায়।" [রবীন মাস্টার। ১৯৩৬]

ছাত্রী তড়িৎ রবীন মাস্টারের জীবনে নিয়ে এসেছিল একটু সুখ, একটু আশার আলো। সেই তড়িতের মৃত্যুর পর রবীনমাস্টার সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লেখক তাঁর সহানুভূতি ঢেলে দিয়েছেন চলিত বাংলায়, অকৃপণভাবে—

"ঘনঘটাচ্ছন্ন অন্ধকার রাত্রে বন্ধুর কণ্টকাবৃত পথে চলছিল রবীন ক্ষতবিক্ষত চরণে, অভিযোগ করে নি সে কোন দিন কারও কাছে। জীবনে সুখের স্বাদ যে সে পেয়েছে

কোনও দিন তা-ও সে ভুলে গিয়েছিল। জীবনের সায়াহ্নে হঠাৎ আকাশ ফেটে ভেঙে পড়েছিল তার মাথার উপর আলো—তার সেই নষ্টস্বর্গের মধুর দ্যুতি হেসে উঠেছিল চারদিকে, পত্রপুষ্পে ভরে উঠেছিল তার পথ, শুধু একমুহূর্তের জন্য রঙীন হয়ে উঠেছিল তার অন্তর, কি দরকার ছিল সে সুখ স্বাদে ?" [রবীনমাস্টার। ১৯৩৬]

বিরহকাতর দুটি গ্রাম্য নারীর তাদের ভালবাসার জনের জন্য যে মানসিক কাতরতা তার বর্ণনা নরেশচন্দ্রের ভাষায়—

"পরী তার ঘরের উঁচু জানালার ভিতর দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়াছিল। তার দৃষ্টি পড়িয়াছিল দূরের সুপারী গাছের ডগার উপর।···ঐ গাছের পাতা কটার সঙ্গে তার অনেক স্মৃতি জড়িত।···তাঁর বিবাহের পর অনেকদিন সে হতাশ নয়নে ঐ গাছের দিকে চাহিয়াছে—সে জানিত ও-গাছ লতিফের পৈতৃক ভিটায়। কাসিমকে বিবাহ করিয়া তার মনে লতিফের জন্য যে একটা ব্যগ্র আশাশূন্য কামনা জাগিয়া উঠিয়াছিল ও গাছ কটার পাতার দিকে চাহিয়া চাহিয়া অনেকদিন তার মনে তার আগুন ধুক্ ধুক্ করিয়া জ্বলিয়াছে।" [রূপের অভিশাপ। ১৯২৮]

অথবা "গোপালের স্মৃতি তার অন্তরে মধুময় হইয়া রহিল···গোপালের সঙ্গে তার শৈশবের শত শত স্নেহ সম্বন্ধের কথা বার বার ঘুরিয়া তার চিত্তপটে ভাসিয়া উঠিয়া পুলক ও স্নেহের রসে সারা চিত্ত সরস করিয়া দেয়······। রোজ রোজ সে তার বেড়ায় ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া চাহিয়া থাকে, গোপাল যে পথে গিয়াছে সেই পথের দিকে মনটা তার ছুটিয়া যায় গোপালের সেই পথের পদচিহ্নের উপর দিয়া গড়াইতে গড়াইতে তার কাছে। কিন্তু উপায় সে খুঁজিয়া পায় না। [শেষ পথ। ১৯৩৪]

কথাসাহিত্য, সাহিত্যের অন্যান্য শাখা-প্রশাখার তুলনায়, অনেকবেশী বাস্তবধর্মী এবং লেখকের আদর্শানুসারে রচিত হলেও মূলত তা রসরচনা পর্যায়ের। নরেশচন্দ্রের কোন কোন রচনা বক্তব্য ও তত্ত্বের ঠাসাঠাসিতে সব সময় রসসিক্ত হয়ে উঠতে পারে নি। এটাও হয়ত লেখকের জনপ্রিয়তা হারানোর আর একটি কারণ। আবার সাহিত্যের বিষয় হিসাবে বিচিত্র এবং বিভিন্ন ধরনের তত্ত্বের প্রয়োগে বাংলা সাহিত্যের পরিধিকে যে তিনি অনেক বেশী ব্যাপক করে তুলেছেন তা-ও অস্বীকার করা যায় না। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত কিছুটা উদ্দেশ্যমূলক কথা-সাহিত্য রচনা করেছেন সত্যি কিন্তু তিনি যশের জন্য সাহিত্য রচনা করেন নি। তিনি বাংলা-সাহিত্য-পাঠকদের কাছে নিবেদন করতে চেয়েছিলেন সমাজবাদ সম্পর্কে কিছু বক্তব্য এবং এর পিছনে ছিল সমাজের মঙ্গল চিন্তা। দেবতা সম্পর্কে সমাজের অলীক ধারণাকে হেসে উড়িয়ে দিয়ে তাঁর রবীনমাস্টার বলেছে—

'এক দেবতা মানি সে পেট, এরচেয়ে বড় দেবতা নাই। এই পেট মানুষকে কিসের থেকে কি করেছে? পেটের খিদের জন্য বনের বাঁদর হয়েছে আজ প্রায় জ্যান্ত দেবতা। আর এই পেট দেবতাই সৃষ্টি করেছেন সব ঠাকুর দেবতা—কেন না তা নইলে বামুনের

দেবতা ভরে না।' [রবীন মাস্টার। ১৯৩৬। পৃঃ ৩১] জমিদারি সম্পর্কে তাঁর 'ব্রতী' উপন্যাসের নায়ক মৈনাকের অভিমত—

"আমার বিশ্বাস জমিদারী জিনিষটাই অন্যায়। চাষাদের পরিশ্রমের উপার্জনের উপর ভাগ বসাবার অধিকার জমিদারের নেই। তারা কোন কাজ করেন না পরের অর্জন শোষণ করেন।—এমন অধর্মনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকা আমি সঙ্গত মনে করি না।"—সে যা চায় তা হচ্ছে, এই সমাজের পরিবর্তন।

"আজ জগৎজোড়া যে ধনিকরাজ্য, এটা উচ্ছেদ করে শ্রমিক সমবায় প্রতিষ্ঠা করতে চাই। সমাজের একটা প্রকাণ্ড ওলট পালট করতে চাই। এখনকার সমাজে তারাই হচ্ছে প্রভু, তারাই কুলীন যারা পরিশ্রম করে না, পরের ধনে পোদ্দারী করে, আর তাদের পায়ের তলায় পড়ে আছে তারা যারা খেটে তাদের খাওয়ায় পরায়। যারা খেটে খায় তারা স্বভাবকুলীন যারা পরের পরিশ্রমে খায় তারা তাদের আশ্রিত, অধ্যধীন, অন্ত্যজ—এই প্রকৃত সত্যটাকে আমরা সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই।" [ব্রতী। ১৯৩০ পৃঃ ১০-১১]

পূজা উপচার ইত্যাদির অন্তঃসারশূন্যতা লক্ষ্য করে লেখক 'বিপর্য্যয়' উপন্যাসের বিধবা মনোরমাকে দিয়ে অনুভব করিয়েছেন—

"ঠাকুরকে একটা সংস্কৃত বুলি আওড়াইয়া ডাকিলে যে তিনি ঐ পাথর মধ্যে আসিয়া অধিষ্ঠিত হন, এবং তার নিবেদিত পাদ্য, অর্ঘ্য, পুষ্প ও নৈবেদ্য গ্রহণ করেন, এ কথা সে মনের সহিত বিশ্বাস করে না। কাজেই তার এই পূজানুষ্ঠান একটা বাহিক অসত্য আড়ম্বর মাত্র।" [বিপর্য্যয়। ১৯২৪। পৃঃ ৪১]

আর সমাজ, সংস্কার ও ধর্ম সম্পর্কে স্বামীবিতাড়িতা, সমাজ আশ্রয়হীনা দরিদ্র করুণা ভেবেছে—

"ধর্ম? ভগবান জানেন ধর্ম কোথায়, অদৃষ্টের ফেরে তার বিবাহ হইয়াছিল এমন লোকের সঙ্গে, যার কাছে সে কোনও দিন কিছুই পায় নাই, শুধু অপমান ও নির্য্যাতন ছাড়া। তার সঙ্গে সহবাস, তার কাছে নিদারুণ অপমান হাত পাতিয়া লইলে তার ধর্ম হইত, আর এই রমেন—যে মানুষের মধ্যে দেবতা, তার চরণে আপনার সর্বস্ব নিবেদন করিয়া আত্ম সমর্পণ করিলে হইবে পাপ?" [দুষ্টগ্রহ। ১৯২৯। পৃঃ ৪৫]

এই করুণাই তার সহজাত সংস্কারে ফকীরের মুসলমান পরিচয়ে চমকে উঠেছে, আর ফকীর তাকে শুনিয়েছে মনুষ্যত্বের চরম কথা—

"মেম সাহেব, শুনে কি অবাক হলে? বলি মানুষটিকে তো এতদিন থেকে জানছো, তাতে যদি তাকে অসহ্য না মনে হয়ে থাকে তবে তার জাতধর্মের নাম শুনে চমকাচ্ছ কেন বল দেখি? মানুষটা তো আর বদলায়নি।" [দুষ্টগ্রহ। ১৯২৯। পৃঃ ১৯২]

সমাজের পারিপার্শ্বিকতায় করুণা ধর্ম ও প্রথাসিদ্ধ সংস্কারে ক্রমশ অবিশ্বাসী হয়ে

উঠেছিল। ফকীরের কথায় তাই সে তার দৃষ্টিভঙ্গীর অর্থহীনতা বুঝতে পেরে ফকীরকে বলেছে—

'বাস্তবিক তুমি হিন্দুও নও মুসলমানও নও ওস্তাদ, আমার কাছে তোমার এক পরিচয়, তুমি আমার বন্ধু, এ জগতে একমাত্র বন্ধু'। প্রসঙ্গত করুণা আরও ভেবেছে, 'ধর্ম? সমাজ? কবে তারা কোন উপকার করিয়াছে? কিন্তু ফকীর তার জীবনে প্রথম সুখের সম্ভাবনা সঞ্চারিত করিয়াছে সে তাকে পুনর্জন্ম দিয়াছে। তার কাছ সমাজ ধর্ম সব তুচ্ছ।' [দুষ্টগ্রহ। ১৯২৯। পৃঃ ১৯৬-১৯৭]

নরেশচন্দ্র তাঁর প্রথম দিকের কয়েকটি উপন্যাসের সংলাপে পূর্ববঙ্গের উপভাষা ব্যবহার করেছেন। পরবর্তীকালে 'পরিণাম' উপন্যাসের মুখবন্ধে তিনি লিখেছেন……'পূর্ব-বাঙ্গালার ভাষা বেশীর ভাগ পাঠকের কাছে দুষ্পাচ্য—তার পরিচয় আমি পাইয়াছি।…' তবু আমরা এখানে নরেশচন্দ্রের উপন্যাস থেকে পূর্ববঙ্গের উপভাষায় রচিত দু'একটি সংলাপ উল্লেখ করছি।

'রূপের অভিশাপ' উপন্যাসে নেকজানের লতিফকে ফিরে আসার জন্য অনুরোধ—

'সোণা বেশী দেরী কইরো না, শীগ্‌গির আইসো। আমি তোমার পথ চাইয়া বইসা থাকুম—দেরী করলে বাচুম না—তোমার দিল্ যদি চায় সোণা তুমি আবার নিকা কইরো। কিন্তু আমারে ছাইর‍্যা যাইও না।' [রূপের অভিশাপ। ১৯২৮। পৃঃ ১৫৩]

'শেষ পথ' উপন্যাসে গোপাল শারদাকে যেতে দিতে চায় নি, আর শারদা তাকে তার নিজের উপায়হীন অবস্থার কথা জানিয়েছে।

"গোপাল : আমি যাইবার দিমু না তরে—তুই আমার সাথে চল।

শারদা : তর সাথে যামু কি? পোলাপানের মত কথা কস তুই এখনো।…

শারদা : আমার উপর রাগ কইরো না ভাই—দেখইতো আমি স্বাধীন না। কি করুম কও, ধর্মে আমারে ঠেকাইছে, নইলে তোমার মনে দুঃখু দিতাম না।" [শেষ পথ। ১৯৩৪। পৃঃ ১২০, ১২২]

নরেশচন্দ্রের সর্বশেষ উপন্যাসটি চলিত ভাষায় রচিত। 'রবীনমাস্টার' উপন্যাসে ব্যবহৃত চলিত ভাষার চাইতে এই উপন্যাসের ভাষা গম্ভীর হলেও সরল। এখানে সন্ধি ও সমাসবদ্ধ পদ অনেক কম এবং সংস্কৃত ঘেঁষা শব্দের ব্যবহারও তেমন নেই। এই উপন্যাসে লেখক বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও পুরোনো কলকাতার বর্ণনায় সে যুগের মানুষের চরিত্র সম্পর্কে একটু মন্তব্য করেছেন। উনআশি বছরের বৃদ্ধ, বহু ইতিহাসের সাক্ষী লেখকের পুরোনো দিনে ফিরে যাওয়ার ঝোঁকটি এখানে অস্পষ্ট নয়। লেখক এই উপন্যাসে লিখেছেন—

"তখন আরম্ভ হয়েছিল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন।…… এই প্রথম আন্দোলনটা করা হল সাবজনীনভাবে গ্রামে গ্রামে হাটে বাজারে, সারাদেশময় সর্বশ্রেণীর লোককে টেনে নিয়ে হৈ চৈ করা হল।" [স্বপ্নসৌধ। ১৯৬১। পৃঃ ৩১]

ঐ উপন্যাসের অন্যত্র লিখেছেন—"তখনও ইডেন গার্ডেনের ব্যাণ্ডস্ট্যাণ্ডের কাছে দেশীয়দের তফাৎ করে রাখা হত, সে গণ্ডী পার হয়ে দেশী লোক হাঁটতে পারতো না। রেড রোডে দেশীলোকের স্বচ্ছন্দ গমন বন্ধ ছিল। সেই সব বিধান সাড়ে-পনের-আনা বাঙ্গালী নীরবে মাথা পেতে মেনে নিত।" [পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃঃ ৬২]

গান্ধীজীর পরিচালিত আন্দোলনকে সমসাময়িক কালের কিছু বুদ্ধিজীবী অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেননি এবং মার্ক্সবাদী বা সন্ত্রাসবাদী দৃষ্টিতে নানা বিতর্ক উপস্থাপিত করেছেন। নরেশচন্দ্র তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসের সংলাপে গান্ধীজী সম্পর্কে সেই সব মন্তব্য ব্যবহার করেছেন,—অর্থাৎ গান্ধীজীর আন্দোলন তখন দেশে যে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল বাস্তবধর্মী লেখকের প্রকরণে স্বাভাবিক ভাবেই তা অনুপ্রবেশ করেছে। 'ব্রতী' গ্রন্থের যুবকদের সংলাপে আমরা এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাই। যেমন—

"মৈনাক : 'নন-কো-অপারেশন' কাপুরুষের পরামর্শ। শুধু হাত পা গুটিয়ে বসে থেকে আমরা ইংরাজ তাড়াব এ কল্পনা রাঁচীর বাইরে হতে পারে আমার জানা ছিল না।

ললিত : হাত পা গুটিয়ে আমরা সবাই যদি একবার সত্যি সত্যি নিশ্চেষ্ট হতে পারি তবে তার চেয়ে সহজ উপায় আর নেই স্বাধীনতা লাভ করার। এই কথা জগতকে শিখিয়েছেন মহাত্মা গান্ধী। শক্তি দিয়ে শক্তিকে হারাবে এই মনে করে মানুষ এতদিন শুধু পশুশক্তি বাড়াবার চেষ্টা করেছে। তাতে সংঘাত বন্ধ হয়নি, বেড়েছে। বাঁচবার চেষ্টায় মানুষ কেবলি মরছে আর মারছে। মহাত্মাজী এই কথাটা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছেন যে এ একটা প্রকাণ্ড ভুল······।

মৈনাক : মহাত্মাজী আমাদের দেশে যে এতটা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন তার কারণটা আমি এখন বুঝতে পারছি। তিনি দেশশুদ্ধ নিষ্কর্মা কাপুরুষদের অকর্মণ্যতা ঢাকবার জন্য একটা লম্বা কথার অজুহাত বের করেছেন, তাই তোমরা আহ্লাদে আটখানা—নন-কো-অপারেশন তারাই করতে পারে যারা দরকার হলে লড়াই করতে পারে। নইলে করলে তোমরা নন-কো-অপারেশন। ওরা গুলি চালায় যদি, জালিয়ানওয়ালাবাগ আবার হয় যদি?

নরেন : ······তোমার মতলবখানা কি, তাই শুনি? লড়াই করে ইংরাজ তাড়াবে?

মৈনাক : তাড়াব এমন স্পর্দ্ধা করি না, কিন্তু যদি স্বাধীন হতে হয় তবে সেই পথ (লড়াই) ছাড়া আর পথ নেই।" [ব্রতী। ১৯৩০। পৃঃ ২০]

'ব্রতী' গ্রন্থ ছাড়াও এধরনের বক্তব্য লেখকের 'রবীনমাস্টার', 'অন্তরায়' ইত্যাদি গ্রন্থেও পাওয়া যায়, এমন কি 'পাপের ছাপ' উপন্যাসটির প্রকৃতিগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সেখানে বিপ্লবী বন্ধু বোমা তৈয়ারীর জন্য মেঘনাদের ল্যাবরেটরী থেকে পিকরিক অ্যাসিড সংগ্রহ করেছে এ ঘটনার উল্লেখ আছে।

নরেশচন্দ্রের কথাসাহিত্যের তিন জায়গায় নায়ক ও সহনায়কের মধ্যে মারামারির উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। প্রতিটি ক্ষেত্রেই এর কারণ নারী প্রেমজনিত ঈর্ষা। কিন্তু

এ ধরনের ঘটনার উল্লেখ কাহিনী বা চরিত্র চিত্রণের ক্ষেত্রে অপরিহার্য তো নয়ই উপরন্তু আকস্মিক বা অস্বাভাবিক মনে হয়। হতে পারে মানুষের আদিম পাশববৃত্তির এই দিকটি সাহিত্যের পক্ষে সুচারু না হলেও, বাস্তবধর্মী লেখক তাঁর সাহিত্যের অলক্ষ্যে রাখতে পছন্দ করেন নি। যেমন—প্রেসিডেন্সী কলেজের স্টাফ্‌রুমে ইন্দ্রনাথকে ইংরাজ অধ্যাপক টমের মুষ্ট্যাঘাত। [বিপর্য্যয়। ১৯২৪]

জোন্সের বাড়ীতে ভূপতিকে বেকারের মুষ্ট্যাঘাত। [বহিষ্কার। ১৯২৬]

সুজাতার বাড়ীর সামনে বিকাশ ও সুকুমারের মুষ্টিযুদ্ধ। [পিছল পথের শেষে। ১৯৩৭]

নরেশচন্দ্রের আর একটি রীতির ব্যবহারে কিছুটা অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয়। স্বাভাবিক ভাবে যেখানে হাস্যরস সৃষ্টি অপ্রয়োজনীয় সেখানেও লেখক হঠাৎ সরস বাক্য প্রয়োগ করেছেন। গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার বর্ণনায় এই প্রয়োগরীতির কার্যকারণ অনুধাবন সম্ভব নয়, আবার পরিবেশকে শুধুমাত্র রমণীয় করে তোলাই তাঁর উদ্দেশ্য একথাও পুরোপুরি মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু এই ব্যবহার কিছুটা অসঙ্গতিপূর্ণ হলেও যে রসোত্তীর্ণ হয়েছে একথা অনস্বীকার্য, কেননা মাত্র কয়েকটি কথার সাহায্যে লেখক এখানে প্রাসঙ্গিক চরিত্র বা রূপ ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। যেমন—

দারিদ্র্যের জন্য পত্নীকে যে ধনী বৃদ্ধ স্বামীর সাথে বাধ্য হয়ে ঘর করতে হয়েছে সেই কাসিমের বর্ণনা—'মনে হয় যেন তাহার মুখের ভিতরের দুর্গন্ধ সহ্য করিতে না পারিয়া প্রত্যেকটি দাঁত বাহির হইয়া আসিয়াছে।' [রূপের অভিশাপ। ১৯২৮]

যখন শ্যামল দুশ্চিন্তায় সমস্ত রাত্রি জাগরণের পর তর্করত্ন মহাশয়ের কাছে সুনীতাকে বিবাহ করার প্রস্তাব করেছে, তখন—'তর্করত্ন উত্তেজনায় একেবারে বিবশের মত হইয়া শ্যামলকে বক্ষের মধ্যে টানিয়া লইলেন, তাঁর কাছা খুলিয়া পড়িয়া দোয়াতের সবটা কালি শুষিয়া লইতেছে তাহা তাঁহার লক্ষ্যও হইল না।' [হারজিৎ। ১৯৩৯]

নিরুদ্দেশ সুনীতাকে যখন তরণী খুঁজে বেড়াচ্ছে সেই প্রসঙ্গে উমেশবাবুর বর্ণনায়—'লোকটা বেঁটে খাটো। বিপরীত কালো। তাহার মুখ দেখিয়া মনে হয় যে জেলের বাইরে একদিনও থাকার তার অধিকার নাই।' [হারজিৎ। ১৯৩৯]

'শেষ পথ' [১৯৩৪] উপন্যাসটির শুরু ও শেষ এই দুটি অংশ বর্ণনার মধ্যে এমন সাদৃশ্যপূর্ণ যোগসূত্র রয়েছে যা নরেশচন্দ্রের অন্য কোন উপন্যাসে দেখতে পাওয়া যায় না উপন্যাসটির পাত্রপাত্রীর জীবনের আরম্ভে যে পথযাত্রা শুরু হয়েছে, জীবনের অন্তিমেও সে যাত্রা অব্যাহত রয়েছে—শুধু তার মাঝখানে রয়েছে কিছু বেদনাঘন বা আনন্দমধুর স্মৃতি। লেখকের সংবেদনশীল উপলব্ধিতে এই আরম্ভ ও শেষ অংশ দুটি অনুপম হয়ে উঠেছে এবং উপন্যাসটির মিলনান্ত সমাপ্তির পরেও একটা করুণরস প্রবাহ হৃদয়কে আপ্লুত করে রাখে। উপন্যাসপ্রকরণের দিক থেকে হয়ত এই রীতি স্বল্পমূল্য হতে পারে কিন্তু সৌন্দর্য বিচারে নিঃশর্তে উল্লেখযোগ্য। অংশ দুটি উদ্ধৃত করছি—

আরম্ভাংশ : 'নদীর ধারের লম্বা পথ দিয়া তারা হাঁটিয়া চলিয়াছে, একটি ছেলে ও একটি মেয়ে।...মেয়েটির বয়স দশ-এগার, ছেলেটির বড়জোর তের কিন্তু দু'জনেই খর্ব, দেখিতে শিশুর মত।

ছেলেটি কালো, মেয়েটি ফরসা। ছেলেটি খানসামা শ্রেণীর কায়স্থের ছেলে, মেয়েটি তাঁতির মেয়ে। ছেলেটির বাপ জমিদার বাড়ীর খানসামা, মেয়েটির বিধবা মা ভট্টাচার্য্যের বাড়ী বাসন মাজে, রান্নার জোগাড় দেয়।

ছেলেটির নাম গোপাল, মেয়েটির নাম শারদা।' [পৃঃ ১]

শেষাংশ : 'নদীর ধারের লম্বা পথ দিয়ে তারা চলিল।......জীবনের প্রারম্ভে একদিন এই পথ দিয়া এমনি হাতে হাত ধরিয়া তারা চলিয়াছিল। সেদিনও শরতের শোভায় ভরিয়া ছিল এই পথ।

সেদিন ছিল প্রভাত, আজ সন্ধ্যা। সেদিন প্রকৃতি তাদের একসূত্রে গাঁথিয়া দিয়াছিল, তাই তারা একসাথে চলিয়াছে।

যৌবনে সমাজ আসিয়া তাহাদের পৃথক করিয়া দিয়াছিল। আজ সমাজের সব দেনা চুকাইয়া আবার তারা একসাথে মিলিয়া চলিয়াছে—তাদের শৈশবের আরব্ধ সেই পথে।

সেদিন তারা ছিল জীবনের রসে ভরপুর। আজ তাদের জীবন পড়িয়া আছে পশ্চাতে, অন্তর তাদের ভরিয়া আছে পরপারের রসে।

সেদিন তারা ছিল উৎসাহভরা দুটি শিশু, আজ তারা জীবনের পথে পরিশ্রান্ত দুটি যাত্রী—ধরিয়াছে তাদের শেষপথ।' [পৃঃ ২৩১-২৩৬]

আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা নরেশচন্দ্রের বিষয়বস্তু, ভাষা, বর্ণনা, বিন্যাস, প্রবণতা ও প্রয়োগ কৌশল এবং ত্রুটি-অসঙ্গতি ইত্যাদির উল্লেখ করে, তাঁর সাহিত্য প্রকরণের স্বরূপ বিশ্লেষণে প্রয়াসী হয়েছি। যদিও নিজের লেখার উৎস ও আত্মপ্রকাশ সম্পর্কে নরেশচন্দ্র বলেছেন—"আমার কোনও গল্পই গ্রীক পুরাণের মিনার্ভার মত বর্মে চর্মে পূর্ণাঙ্গ হয়ে আমার মনে আকারিত হয় না। একটা ছোট ঘটনা বা অবস্থার কথা মাথায় এসে তা লতা-পল্লবিত হয়ে উঠে ক্রমে লেখার যোগ্য আকার ধারণ করে। এই যে লতা-পল্লব তা-ও প্রায় মনে মনে ধ্যান করে জন্মায় না, জন্মায় বেশীর ভাগ কলমের ডগায়। গোড়ার কথাটা মনের ভিতর আকারিত হলেই আমি কাগজ কলম নিয়ে বসি, তারপর কলম চলতে চলতে কথাচিত্র ও চরিত্র আমার মাথার চারপাশে ভিড় করে এসে কলমের মুখে আত্মপ্রকাশ ক'রে ফেলে।" [আকাশবাণী কলকাতা, বেতার ভাষণ, ৭ ই এপ্রিল, ১৯৪৫]

৭

সাহিত্য-বিতর্ক ও নরেশচন্দ্র

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের রচিত কয়েকটি উপন্যাস[১] বাংলা সাহিত্যের আসরে অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। সাহিত্যে শ্লীলতা অশ্লীলতার বাছবিচারে, এ ধরনের রচনাকে সেযুগে অনেকেই মেনে নিতে পারেননি। যদিও কেউ কেউ তাঁর এই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।[২] সবুজ পত্রের আবির্ভাবে প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে যে সমস্ত সমাজপতিরা সাহিত্যে শ্লীলতা অশ্লীলতা বা বাস্তব অবাস্তবতার রোগ নির্ণয়ে সাহিত্যের চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, প্রমথ চৌধুরীর কাছে পরাস্ত হওয়ার পর সেই ধরনের নীতিবাদীর দলই নরেশচন্দ্রের সাহিত্যে সমালোচনার রসদ পেলেন। সাহিত্যে নতুন করে বে-আব্রুতা নিয়ে আসার কারণে নরেশচন্দ্র অভিযুক্ত হলেন।

শনিবারের চিঠি[৩] নবপর্যায়ে প্রকাশিত হওয়ার পর তাঁদের সমালোচনার মুখ্য 'বিষয়বস্তু হয়ে উঠলো আধুনিক সাহিত্য ও আধুনিক সাহিত্যিক।'[৪] কিন্তু শনিবারের চিঠি'র অবিরাম চেষ্টাও সাহিত্যের এই নবত্বের ঝোঁক থেকে সেদিনের আধুনিক সাহিত্যিক-কুলকে বিরত করতে পারেনি। অপর দিকে 'শনিবারের চিঠি'তে পরিবেশিত 'মণিমুক্তা' বা আধুনিক সাহিত্যের বিরুদ্ধে লিখিত প্রবন্ধ পাঠে পাঠককুল এই সব অভিযুক্ত

সাহিত্যিকদের লেখা পড়ার জন্য আরো বেশী আগ্রহান্বিত হয়ে উঠলেন এবং নবীন লেখকরাও যৌবনদীপ্ত জ্বালা যন্ত্রণা অবলীলাক্রমে প্রকাশ করলেন সাহিত্যে। বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার নামে এই বে-আব্রুতা নিয়ে আসার জন্য এই অভিযানের দলপতি হিসাবে প্রধান সাহিত্যিক নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তই সবচাইতে বেশী অভিযুক্ত হলেন। কিন্তু 'শনিবারের চিঠি'র এই নব্য ধারার সাহিত্যকে সংশোধন করার প্রচেষ্টা একরকম ব্যর্থ হলো। এমন কি 'কালি কলমে' প্রকাশিত 'চিত্রবহা' নামে যে গল্প আইনের চোখে অশ্লীল বলে অভিযুক্ত হয়েছিল, 'শনিবারের চিঠি'ও সেই গল্পের আলোচনা প্রশংসার সুরে করেছিল।[৫]

আধুনিক সাহিত্যের উগ্র বে-আব্রুতার আলোচনা এতদিন সাময়িক পত্রের পাতায়ই সীমাবদ্ধ ছিল, সাহিত্যের প্রকাশ্য দরবারে এই অভিযোগ প্রথম তুলে ধরলেন অমল হোম—প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের পঞ্চম অধিবেশনে, আধুনিক সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের প্রসঙ্গে একটি প্রবন্ধ পাঠ করে।। দিল্লীর সেই অধিবেশনে পঠিত তাঁর প্রবন্ধ কিন্তু কোন জোরালো প্রতিবাদ রাখতে সক্ষম হয়নি। 'কল্লোলে' তখন সদ্য প্রকাশিত হয়েছে বুদ্ধদেব বসুর 'রজনী হল উতলা', অচিন্ত্য সেনগুপ্তের 'গা'ব আজ আনন্দের গান,' 'কালি কলমে' নজরুল ইসলামের 'মাধবী প্রলাপ', 'অনামিকা' ইত্যাদি। সজনীকান্ত দাস এবার অতি আধুনিক সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের বিব্রত করার জন্য অন্য পথ ধরলেন : 'তেরশ তেত্রিশ সালের ফাল্গুন মাসে 'শনিবারের চিঠি'র সজনীকান্ত দাস রবীন্দ্রনাথের কাছে আর্জি পেশ করলেন।'[৬]

"শ্রীচরণেষু

প্রণামনিবেদনমিদং, সম্প্রতি কিছুকাল যাবৎ বাঙলাদেশে একধরনের লেখা চলছে, আপনি লক্ষ্য করে থাকবেন। প্রধানত 'কল্লোল' ও 'কালি কলম' নামক দু'টি কাগজেই এগুলি স্থান পায়। অন্যান্য পত্রিকাতেও এধরনের লেখা ক্রমশঃ সংক্রামিত হচ্ছে। এই লেখা দুটি আকারে প্রকাশ পায়—কবিতা ও গল্প। কবিতা ও গল্পের যে প্রচলিত রীতি আমরা এতাবৎকাল দেখে আসছিলাম লেখাগুলি এই রীতি অনুসরণ করে চলে না। কবিতা stanza, অক্ষর, মাত্রা অথবা মিলের কোন বাঁধন মানে না, গল্পের form সম্পূর্ণ আধুনিক। লেখার বাইরেকার চেহারা যেমন বাধা-বাঁধনহারা ভেতরের ভাবও তেমনি উচ্ছৃঙ্খল। যৌনতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব অথবা এধরনের কিছু নিয়েই এগুলি লিখিত হচ্ছে। যাঁরা লেখেন তাঁরা Continental Literature এর দোহাই পাড়েন। যাঁরা এগুলি পড়ে বাহবা দেন তাঁরা সাধারণ প্রচলিত সাহিত্যকে রুচিবাগীশদের সাহিত্য বলে দূরে সরিয়ে রাখেন। পৃথিবীতে আমরা স্ত্রী-পুরুষের সকল পারিবারিক সম্পর্ককে সম্মান করে থাকি এই সব লেখাতে সেই সব সম্পর্ক বিরুদ্ধ সম্বন্ধ স্থাপন করে আমাদের ধারণাকে কুসংস্কার শ্রেণীভুক্ত বলে প্রচার করার একটা চেষ্টা দেখি। শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় এই শ্রেণীর লেখকদের অগ্রণী। Realistic নাম দিয়ে এগুলিকে সাহিত্যের একটা বিশেষ অঙ্গ বলে চালাবার চেষ্টা হচ্ছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নরেশবাবুর কয়েকখানি বই, কল্লোলে প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসুর 'রজনী হ'ল উতলা' নামক একটি গল্প, যুবনাশ্ব লিখিত কয়েকটি

গল্প এই মাসের (ফাল্গুনে) কল্লোলে প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসুর কবিতাটি (অর্থাৎ বন্দীর বন্দনা), 'কালি কলমে' নজরুলের 'মাধবী প্রলাপ' ও 'অনামিকা' নামক দুটি কবিতা ও অন্যান্য কয়েকটি লেখার উল্লেখ করা যেতে পারে। আপনি এসব লেখার দু'একটা পড়ে থাকবেন। আমরা কতকগুলি বিদ্রূপাত্মক কবিতা ও নাটকের সাহায্যে 'শনিবারের চিঠি'তে এর বিরুদ্ধে লিখেছিলাম। শ্রীযুক্ত অমল হোম মহাশয়ও এর বিরুদ্ধে একটা প্রবন্ধ লিখেছেন। কিন্তু এই প্রবল স্রোতের বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদ এত ক্ষীণ যে কোন প্রবল পক্ষের তরফ থেকে এর প্রতিবাদ বের হওয়ার একান্ত প্রয়োজন আছে। যিনি আজ পঞ্চাশ বছর ধরে বাঙলা সাহিত্যকে রূপে রসে পুষ্ট করে আসছেন তাঁর কাছেই আবেদন করা ছাড়া আমি অন্য পথ না দেখে আপনাকে আজ বিরক্ত করছি।

আমি জানি না, এসব লেখা সম্বন্ধে আপনার মত কি। নরেশবাবুর কোন বইয়ের সমালোচনায় আপনি তাঁর সাহসের প্রশংসা করেছেন। সেটা ব্যাজস্তুতি না সত্যিকার প্রশংসা, বুঝিতে পারিনা। আমি নিজে এগুলিকে সাহিত্যের আগাছা বলে মনে করি। বাঙ্গালা সাহিত্য যথার্থ রূপ নেবার পূর্বেই এই ধরনের লেখার মোহে পড়ে নষ্ট হতে বসেছে। আমার এই ধারণা। সেইজন্য আপনার মতামতের জন্য আমি আপনাকে এই চিঠি দিচ্ছি। বিরুদ্ধে বা পক্ষে যে দিকেই আপনি মত দেন, আপনার মত সাধারণের জানা প্রয়োজন।

.........ক্ষুদ্র লেখকের লেখনীতে সত্য প্রতিবাদও অনেক সময় ঈর্ষা বলে হেলা পায়। আপনি কথা বললে আর যাই বলুক, ঈর্ষার অপবাদ কেউ দেবে না। আমার প্রণাম জানবেন।

প্রণত সজনীকান্ত দাস"

এই চিঠির উত্তরে রবীন্দ্রনাথ খোলাখুলি ভাবে কোন মত ব্যক্ত করেন নি। তিনি লিখেছিলেন, "সুসময় যদি আসে তখন আমার যা বলবার বলবো"। আরও লিখেছিলেন "আলোচনা করতে হলে সাহিত্য ও আর্টের মূলতত্ত্ব নিয়ে পড়তে হবে।"[৭]

সজনীকান্ত দাসের চিঠি পাওয়ার পাঁচ ছয় মাস পরে রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্য ধর্ম'[৮] প্রবন্ধটি প্রকাশ করেন। সেই প্রবন্ধে সাহিত্য ও আর্টের মূলতত্ত্ব নিয়েই আলোচনা হয়েছিল।

বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় ও প্রবন্ধে ইতিপূর্বেই নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত একাধিক লেখকদ্বারা অভিযুক্ত হয়েছিলেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নরেশচন্দ্রে সম্পর্কে একটি প্রবন্ধে বিরূপ সমালোচনা করেন।[৯] এই প্রবন্ধের উত্তরে নরেশচন্দ্র একটি 'কৈফিয়ৎ' প্রকাশ করেন।[১০] সাহিত্য সমালোচনা করার সময় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোকপাত করলেও পাঠকদের রুচি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না। তাঁর রচিত উপন্যাসগুলি কখনোই পাঠকমহলে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি। তাই পাঠকদের রুচি বা বোধ সম্পর্কে কোন মন্তব্য না করে তিনি জনপ্রিয় সাহিত্যিকদের রচনার সমালোচনায় লেখকদের সামাজিক আদর্শের অবমাননার দিকটিকে বিশেষভাবে তুলে

ধরার চেষ্টা করেছিলেন। নরেশচন্দ্রের সাহিত্য সমালোচনাও তিনি সেই একই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই করেছিলেন। পরবর্তীকালে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-এর রচনা সম্পর্কে একটি প্রবন্ধে নরেশচন্দ্র লিখেছেন "ঐতিহাসিক তথ্যবহুল এই বইগুলি পাঠ করিবার জন্য বিদ্যা ও সংস্কৃতির যে উৎকর্ষ প্রয়োজন, তাহা অধিকাংশ পাঠকের ছিল না। হয়ত বা তাঁহার ভাষার আপেক্ষিক কাঠিন্যও তাদের রস গ্রহণের বাধা জন্মাইত। কিন্তু তাহার চেয়ে বড় কারণ হয়ত এই যে, বাঙালী পাঠকের রুচি ও আকাঙ্ক্ষা অতি দ্রুত পরিবর্তনশীল। তাই আজ যে লেখককে সবাই মাথায় তুলিয়া স্তুতি করিয়া শেষ পায় না, দু'দিন যাইতে না যাইতেই তাহাকে ভুলিয়া যায়।"[১১]

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর আধুনিক সাহিত্য ও নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তকে সাময়িক পত্রের মাধ্যমে প্রবন্ধাঘাত করেন যতীন্দ্রমোহন সিংহ মহাশয়। বাধ্য হয়ে নরেশচন্দ্র সাময়িক পত্রের এক প্রবন্ধে যতীন্দ্রমোহন সিংহ মহাশয়কে প্রশ্ন করেন, "তিনি আমার কয়খানি বই পড়িয়াছেন? আমার কয়খানি বইয়ে স্ত্রীপুরুষের প্রেমের ব্যভিচার প্রসঙ্গমাত্র আছে?......তিনি আমার প্রশ্নের উত্তরে আমার প্রত্যেক গ্রন্থ হইতে দৃষ্টান্ত উদ্ধার করিয়া তাহার নিন্দাবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিবেন, এবং যদি তাহা না পারেন তবে তার অক্ষমতা স্বীকার করিবেন।"[১২] বলা বাহুল্য, যতীন্দ্রমোহন সিংহ সেই চেষ্টা করেন নি।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সাহিত্য ধর্ম' প্রবন্ধে মূলত আর্টের মূলতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করলেও তাঁর প্রবন্ধে আধুনিক সাহিত্যের ক্রটি নির্ধারণের চেষ্টাও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অমল হোম, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস প্রভৃতি আধুনিক সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের প্রতি যে সকল অভিযোগ এনেছেন, মনে হয় রবীন্দ্রনাথও সেই সব দিকেই লক্ষ্য স্থির রেখে প্রবন্ধটি লিখেছিলেন। মনে রাখতে হবে, আধুনিক সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের বিরুদ্ধে সজনীকান্ত দাসের নালিশ পাওয়ার কয়েক মাসের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটি লিখেছিলেন।[১৩]

'সাহিত্য ধর্ম' প্রবন্ধের উত্তরে নরেশচন্দ্র তাঁর 'সাহিত্য ধর্মের সীমানা' প্রবন্ধের শুরুতেই লিখেছিলেন "এতদিন সাহিত্য সম্পর্কে যে সব নিন্দা শোনা গিয়াছে তার প্রধান কথা এই যে ইহা সমাজনীতি বিরুদ্ধ ......বিলাতী, এদেশের আবহাওয়া বা জীবনের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সাহিত্য ধর্ম' প্রবন্ধে যে সমালোচনা করিয়াছেন তাহার তলায় তলায় যে এই কথাগুলিই তাঁকে যে অনবরত খোঁচা মারিতেছে তাহা স্পষ্টই দেখা যায়।"[১৪]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধে এমন কয়েকটা মন্তব্য করেছেন যা সাম্প্রতিক সাহিত্যের অনুকূলে নয়। এই প্রবন্ধে real শব্দের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন "সাধারণ সত্য হল এক আর সার্থক সত্য হল আর"। আধুনিক সাহিত্যের রিয়েলিটির দাবীকে তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে "সাধারণ সত্যে একেবারে বাছবিচার নেই, সার্থক সত্য আমাদের বাছাই করা,

মানুষ মাত্রই সাধারণ সত্যের কোঠায়, কিন্তু যথার্থ মানুষ লাখে না মিলে এক" ইত্যাদি। এইসব কথায় বড় একটা আপত্তি ওঠেনি।

কিন্তু প্রবন্ধের শেষ অংশে তিনি লিখলেন "সম্প্রতি আমাদের সাহিত্যে বিদেশের আমদানী যে একটা বে-আব্রুতা এসেছে সেটাকেও এখানকার কেউ কেউ মনে করছেন নিত্যপদার্থ, ভুলে যান, যা নিত্য তা অতীতকে সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করে না। মানুষের রসবোধে যে আব্রু আছে সেইটেই নিত্য, যে আভিজাত্য আছে রসের ক্ষেত্রে সেইটেই নিত্য। এখনকার বিজ্ঞান মদমত্ত ডিমোক্রেসীর তাল ঠুকে বলছে, ওই আব্রুটাই দৌর্বল্য, নির্বিচার অলজ্জতাই আর্টের পৌরুষ। ……এই ল্যাঙট পরা গুলিপাকানো ধুলামাখা অধুনিকতারই একটা স্বদেশী দৃষ্টান্ত দেখেছি হোলিখেলার দিনে চিৎপুর রোডে, সেই খেলায় আবীর নেই, গুলাল নেই, পিচকারী নেই, গান নেই, লম্বা লম্বা ভিজে কাপড়ের টুকরো দিয়ে রাস্তার ধুলোকে পাঁক করে তুলে তাই চিৎকার শব্দে পরস্পরের গায়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পাগলামি করাকেই জনসাধারণ বসন্ত উৎসব বলে গণ্য করছে। পরস্পরকে মলিন করাই তার লক্ষ্য, রঙিন করা নয়।……কিন্তু মানুষের রসবোধ যে উৎসবের মূল প্রেরণা সেখানে যদি সাধারণ মলিনতায় সকল মানুষকে কলঙ্কিত করাকেই আনন্দ প্রকাশ বলা হয়, তবে সেই বর্বরতার মনস্তত্ত্বকে এ ক্ষেত্রে অসংগতি বলেই আপত্তি করব। অসত্য বলে নয়। ……সাহিত্যে রসের হোলিখেলায় কাদামাখামাখির পক্ষ সমর্থন উপলক্ষ্যে অনেকে প্রশ্ন করেন, সত্যের মধ্যে এর স্থান নেই কি। এ প্রশ্নটাই অবৈধ।……মত্ততার আত্মবিস্মৃতিতে এরকম উল্লাস হয়, ……অক্লান্ত উত্তেজনায় খুব একটা জোরও আছে। মাধুর্যহীন সেই রূঢ়তাকেই যদি শক্তির লক্ষণ বলে মানতে হয় তবে এই পালোয়ানির মাতামাতিকে বাহাদুরি দিতে হবে সেকথা স্বীকার করি।……এ পৌরুষ চিৎপুরের রাস্তায়, অমরাপুরীর সাহিত্য কলায় নয়।……সম্প্রতি যে দেশে বিজ্ঞানের অপ্রতিহত প্রভাবে অলজ্জ কৌতূহলবৃত্তি দুঃশাসনমূর্তি ধরে সাহিত্য লক্ষ্মীর বস্ত্র হরণের অধিকার দাবী করছে সে দেশের সাহিত্য অন্ততঃ বিজ্ঞানের দোহাই পেড়ে এই দৌরাত্মের কৈফিয়ৎ দিতে পারে। কিন্তু যে দেশে অন্তরে-বাহিরে বুদ্ধিতে-ব্যবহারে বিজ্ঞান কোনখানেই প্রবেশাধিকার পায়নি সে দেশের সাহিত্যে ধার করা নকল নির্লজ্জতাকে কার দোহাই দিয়ে চাপা দেবে।"[১৫]

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের শেষ অংশের উপরোক্ত বক্তব্য স্বাভাবিক কারণেই তদানীন্তন প্রগতিপন্থী সাহিত্যিককুলকে আঘাত হানলো। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তই প্রথম রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের উত্তরে প্রতিবাদ জানালেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছে 'বে-আব্রুতার সীমা নির্দেশ দেওয়ার' দাবী জানালেন, কেননা 'শারীর ব্যাপার মাত্রই বে-আব্রু নয়'। এর সীমারেখা রসের গভীরে নিহিত, কোনও বাহ্যিক দৃষ্টান্তে তা প্রমাণিত হয় না। তিনি সেই সঙ্গে 'বিদেশের আমদানি' কথাটারও ব্যাখ্যা চাইলেন। এই প্রসঙ্গে নরেশচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধে লিখলেন—"বিদেশের আমদানী কথাটা পরিচয় হিসাবে কোন নির্দেশই দেয় না, কেননা এক হিসাবে রাজা রামমোহনের পরবর্তী সমস্ত সাহিত্যই অল্প বিস্তর বিলাতের

আমদানী। বিদেশী কবিতার রসাস্বাদে যারা অভ্যস্ত নয়, তাদের কাছে রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতার রসাস্বাদই অসম্ভব, একথা হয়তো কবির কোন ভক্তই অস্বীকার করিবেন না।……নূতন সাহিত্যকে 'বিদেশের আমদানী' বলিয়া কবিবর কটাক্ষ করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের কাছে একথা লইয়া কটাক্ষপাতের প্রত্যাশা করি নাই। ……রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে অনেকটারই উদ্দীপনা আসিয়াছে পশ্চিমের সাহিত্য ও সমাজ হইতে। টমসন সাহেব……একটা বাজে ও অসত্য কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন যে, 'রাজা ও রাণী' Doll's House-এর ছায়ায় রচিত……কিন্তু সমগ্রভাবে Ibsen ও Maeterlinck এর প্রভাব যে তাঁহার লেখায় আসিয়াছে,……অন্ততঃ কবি স্বয়ং তাহা অস্বীকার করিবেন না।" ঐ প্রবন্ধের শেষ অংশে নরেশচন্দ্র দাবী জানালেন "আজ বিশ্বব্যাপী ভাব বিনিময়ের দিনে বিলাতে যেটা ঘটিয়াছে, সে সম্বন্ধে আমরা নিরপেক্ষ থাকিতে পারি কি? যে হাট আজ পশ্চিমে বসিয়াছে তাতে আমার সওদা করিবার অধিকার কোন প্রতীচ্যবাসীর চেয়ে কম নয়।"

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের প্রবন্ধ প্রকাশের পরের মাসেই দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী মহাশয় নরেশচন্দ্রের প্রবন্ধের বিরুদ্ধে এক দীর্ঘ প্রতিবাদ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন,[১৬] এবং সেই প্রবন্ধে লেখেন যে, নরেশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের পরিবর্তে নিজস্ব কল্পিত মত রবীন্দ্রনাথের নামেই "চালাইয়া তাহারই খণ্ডন করিয়াছেন।"

রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্য ধর্ম' প্রবন্ধের প্রতিবাদে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও এক প্রবন্ধে[১৭] রবীন্দ্রনাথের 'ভাবগত বোধের ক্ষুধা' ও 'সাহিত্যের নিত্যরস' প্রভৃতি শব্দের দুর্বোধ্যতা নিয়ে কটাক্ষ করেন এবং রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, ঐ সব অভিযোগ কবি "লোকপরম্পরা শুনিয়া থাকিবেন।" তাঁর প্রবন্ধে তিনি লিখলেন—"কবি ত থাকেন বারো মাসের মধ্যে তের মাস বিলাতে। কি জানেন তিনি কে আছে তোমাদের খড়্গহস্তা শুচিধর্মী অনুরূপা, আর কে আছে তোমাদের বংশীধারী অশুচিধর্মী শৈলজা প্রেমেন্দ্র-নজরুল-কল্লোল-কালি-কলমের দল? কি করিয়া জানিবেন তিনি কবে কোন মহীয়সী জননী অতি আধুনিক সাহিত্যিক দলন করিতে ভবিষ্যৎ মায়েদের সূতিকা গৃহেই সন্তান বধের সদুপদেশ দিয়া নৈতিক উচ্ছ্বাসের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, আর কবে শৈলজানন্দ কুলিমজুরের নৈতিক হীনতার গল্প লিখিয়া আভিজাত্য খোয়াইয়া বসিয়াছে? এ সকল অধ্যয়ন করিবার মত সময়, ধৈর্য এবং প্রবৃত্তি কোনটাই কবির নাই, তাঁহার অনেক কাজ। দৈবাৎ এক-আধটা টুকরো-টাকরা লেখা যাহা কবির চোখে পড়িয়াছে তাহা হইতেই তাঁহার ধারণা জন্মিয়াছে আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের আক্রতা ও আভিজাত্য দুইই গিয়াছে। শুরু হইয়াছে শুধু চিৎপুর রোডের খচো-খচো খচ্‌কার যোগে একঘেয়ে পদের পুনঃ পুনঃ আবর্তিত গর্জ্জন। আধুনিক সাহিত্যের প্রতি কবির এত বড় অবিচারে শুধু নরেশচন্দ্রের নয়, আমারও বিস্ময় ও ব্যথার অবধি নাই।

ভক্ত বাক্যের মত প্রামাণ্য সাক্ষ্য আর কি আছে? অতএব, তাঁহার নিশ্চয় বিশ্বাস জন্মিয়াছে আধুনিক সাহিত্যে কেবল সত্যের নাম দিয়া নরনারীর যৌন মিলনের শারীর

ব্যাপারটাকেই অলঙ্কৃত করা চলিয়াছে। তাহাতে লজ্জা নাই, সরম নাই, শ্রী নাই, সৌন্দর্য নাই, রসবোধের বাষ্প নাই,—আছে শুধু ফ্রয়েডের সাইকো-এনালিসিস্। অথচ যে-কোন সাহিত্যিককেই যদি তিনি ডাকিয়া পাঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিতেন ত শুনিতে পাইতেন তাহারা প্রত্যেকেই জানে যে সত্য মাত্রই সাহিত্য হয়না।······সাহিত্য সৃষ্টি অনুকরণের মধ্যে নাই। ভালরও না, মন্দেরও না।······অনুভূতিহীন বাক্য যত অলঙ্কৃতই হোক ব্যর্থ। পতিতার অনুকরণও ব্যর্থ, গীতাঞ্জলির অনুকরণও ঠিক ততখানিই ব্যর্থ। দেশের সাহিত্য-সম্পদ ইহাতে কণামাত্র বর্ধিত হয় না।

······কবির বোধের ক্ষুধা ও আত্মার ক্ষুধা ঠিক যে কি এবং কিসে মেটে সে আমার অনধিগম্য। কিন্তু একটা কথা জানি যে কাব্য সাহিত্য ও কথা সাহিত্য এক বস্তু নয়। আধুনিক উপন্যাস সাহিত্য ত নয়ই। সোনার তরীর যা লইয়া চলে চোখের বালির তাহাতে কুলায় না। সাজনা ফুলে বকফুলে সোনার তরীর প্রয়োজন নাই, কিন্তু বিনোদিনীর রান্নাঘরে সেগুলা না হইলেই নয়। তেপান্তরের মাঠ এবং পক্ষীরাজ ঘোড়া লইয়া কাব্যের চলে, কিন্তু উপন্যাস সাহিত্যের চলে না। এখানে ঘোড়ার চার পায়ে ছুটিতে হয়, পক্ষ বিস্তার করিয়া উড়ার সুবিধা হয় না।······বিজ্ঞানের প্রতি কবির হয়ত একটা স্বাভাবিক বিমুখতা আছে, কিন্তু বিজ্ঞানের ক্ষেত্র বলিতে যে কি বুঝায় আমি বুঝিলাম না। বিজ্ঞান বলিতে শুধু Sex-psychology, Anatomy অথবা Gynaecology বুঝাইত তাহা হইলে সাহিত্যের মধ্যে ইহার অবধারিত প্রবেশে আমি ও বাধা দিতাম। কেবল অবাঞ্ছিত বলিয়া নয়, অহেতুক ও অসঙ্গত বলিয়া আপত্তি করিতাম। ······বিজ্ঞানকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া ধর্মপুস্তক রচনা করা যায়, আধ্যাত্মিক কবিতাও রচনা করা যায়, রূপকথা সাহিত্যও রচনা করা না যায় তাহা নহে, কিন্তু উপন্যাস সাহিত্যে ইহা শ্রেষ্ঠ পন্থা নহে।······কবি বলিয়াছেন, "সে দেশের সাহিত্য অন্ততঃ বিজ্ঞানের দোহাই পেড়ে এই দৌরাত্ম্যের কৈফিয়ত দিতে পারে। কিন্তু যে দেশে অন্তরে বাহিরে বুদ্ধিতে ব্যবহারে বিজ্ঞান কোনখানেই প্রবেশাধিকার পায়নি—"এ যদি সত্য হইয়া থাকে ত ভারতের দুঃখের কথা, দুর্ভাগ্যের কথা। হয়ত প্রবেশাধিকার পায় নাই, হয়ত এ বস্তু সত্যই ভারতে ছিল না, কিন্তু কোন একটা জিনিষ শুধু কেবল ছিল না বলিয়াই কি চিরদিন বর্জ্জিত হইয়া থাকিবে ? ইহাই কি তাঁহার আদেশ ? পরের লাইনেই কবি বলিয়াছেন—"সে দেশের (অর্থাৎ বাঙ্‌লা দেশের) সাহিত্যে নকল নির্লজ্জতাকে কার দোহাই দিয়ে চাপা দেবে ?" দোহাই দেওয়ার প্রয়োজন নাই, চাপা দেওয়াও অন্যায়, কিন্তু ভক্তের মুখের ধার করা অভিমতটাকে অসংশয়ে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করাতেই কি ন্যায়ের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয় না ?" শরৎচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধের শেষ অংশে নরেশচন্দ্র "সেনগুপ্ত সম্পর্কে লিখেছেন"······নরেশচন্দ্রের প্রতি অনেকেই প্রসন্ন নহেন জানি। কিন্তু, মত্ততার আত্মবিস্মৃতিতে মাধুর্যহীন রূঢ়তাকেই শক্তির লক্ষণ বলিয়া মনে করিয়া পালোয়ানির মাতামাতি করিতে তাঁহাকে কোন বইয়েই দেখিয়াছি বলিয়া মনে করিতে পারিনা। তাঁহার সহিত পরিচয় আমার নাই, কখনো তাঁহাকে দেখিয়াছি বলিয়াও স্মরণ

হয় না, কিন্তু, পাণ্ডিত্যে, জ্ঞানে, ভাষার অধিকারে, চিন্তার বিস্তারে এবং সর্বোপরি স্বাধীন অভিমতের অকুণ্ঠিত প্রকাশে বাঙলা সাহিত্যে তাঁর সমতুল্য লেখক কেহ আছেন বলিয়াও ত স্মরণ হয় না।"

রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্য ধর্ম' প্রবন্ধে যে সকল আধুনিক সাহিত্যিকদের রচনাকে লক্ষ্য করে কটাক্ষ করেছেন তার মধ্যে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তও একজন, এ অনুমান তখন প্রায় প্রত্যেকেই করেছেন। তার প্রথম ও প্রধান কারণ এই যে, নরেশচন্দ্রই প্রথম রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের প্রতিবাদে প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন এবং সে যুগে নরেশচন্দ্র এমন একজন আধুনিক ও বাস্তববাদী সাহিত্যিক হিসাবে পরিচিত, শারীর ব্যাপার মাত্রকেই সাহিত্যে নিয়ে আসাকে যিনি অশুচিতা মনে করেন নি। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও তাঁর প্রবন্ধে তাই নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত সম্পর্কে তাঁর মনোভাব স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন।

আশ্বিন মাসের (১৩৩৪) বঙ্গবাণীতে শরৎচন্দ্রের প্রবন্ধ 'সাহিত্যের রীতি ও নীতি' প্রকাশিত হয় এবং সে মাসেরই বিচিত্রায় দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচি মহাশয়ের 'সাহিত্য ধর্মের সীমানা বিচার' প্রবন্ধটি প্রকাশ পায়। দ্বিজেন্দ্রবাবুর সেই প্রবন্ধের উত্তরে নরেশচন্দ্র একটি 'কৈফিয়ৎ'[১৮] প্রকাশ করেন। সেই আলোচনায় নরেশচন্দ্র লিখেছেন "অনেকেরই বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথ আমার লেখা লক্ষ্য করিয়া তাঁর 'সাহিত্য ধর্ম' প্রবন্ধ লিখিয়াছেন এবং আমার গায়ে লাগিয়াছে বলিয়াই আমি তার প্রতিবাদ করিয়াছি। কোনও এক কাগজে কোনও ব্যক্তি তাঁর একখানা পত্র ও কবির উত্তর প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা হইতে এ অনুমান অসঙ্গত মনে হয় না যে রবীন্দ্রনাথ যাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াছিলেন, আমি তার মধ্যে একজন। তবে একথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে আমি যখন 'সাহিত্য ধর্মের সীমানা' লিখিয়াছিলাম তখন পর্যন্ত আমার মনে এ ধারণা মোটের উপর ছিল না যে তাঁর প্রবন্ধের লক্ষ্যের কোনওখানে আমি নিজে আছি। যদি তাহা ভাবিতাম তবে হয়তো আমি এ প্রবন্ধ লিখিতাম না। পক্ষান্তরে আমি যে লক্ষ্য নই এ কথা ভাবিবার আমার যথেষ্ট হেতু ছিল। কেননা, আমার যে বইখানা লইয়া স্বাস্থ্যরক্ষার দলে খুব বেশী হৈ চৈ হইয়াছে সেখানা 'শান্তি'। শান্তি বইখানা প্রকাশিত হইবার পরই আমি রবীন্দ্রনাথকে তাহা উপহার দিয়াছিলাম, এবং পরে, আলিপুরে শ্রীযুক্ত প্রশান্ত মহলানবিশ মহাশয়ের বাড়ীতে একদিন কবির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁর সঙ্গে 'শান্তি' সম্বন্ধে আলোচনা হয়। তিনি যেভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন তাহাতে বুঝিয়াছিলাম যে তিনি বইখানা ভাল করিয়াই পড়িয়াছেন। সে আলোচনায় তিনি 'শান্তি'র প্রশংসা করিয়াছিলেন, দুই-একটা ত্রুটি দেখাইয়াছিলেন, স্থল বিশেষে আর একটু বিশদ আলোচনার উপদেশ দিয়াছিলেন—কিন্তু তাহার রুচি বা নীতির কিম্বা সাহিত্য ধর্মের পরিপন্থিতা সম্বন্ধে কোনও কথাই বলেন নাই। সুতরাং 'সাহিত্য ধর্ম' প্রবন্ধ পড়িয়া আমার একথা মনেই আসে নাই যে, আমার লেখা সম্বন্ধে ইহাতে তিনি কোনও বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়াছেন, এবং আমার এখনও বিশ্বাস যে তিনি আমাকে লক্ষ্য করিয়া কিছু লেখেন নাই।

সুতরাং আমি আত্মরক্ষার জন্য লিখিয়াছি এরকম যে ধারণা চারিদিকে প্রকাশিত হইতেছে—'বঙ্গবাণী'তে শরৎবাবুও যে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন,—সে ধারণার কোনও ভিত্তি নাই।

এই সব প্রবন্ধ থেকে 'শনিবারের চিঠি' এমন সব অংশ প্রকাশ করতে থাকে যাতে নরেশচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে একজনকে অন্ততঃ অসত্য প্রচারের অভিযোগে অভিযুক্ত হতে হয়।

রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাত মুখোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, "মালয় সফর শেষে কলিকাতায় ফিরিয়া গত তিনমাসের সাহিত্য ধর্ম লইয়া আলোচনার অতিরঞ্জিত বর্ণনা নিশ্চয়ই শুনিতে পাইলেন। অনুরোধে উপরোধে পড়িয়া বা অন্যকে oblige করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ অনেক সময়ে এমন সব কাজ করেন বা মত ব্যক্ত করেন, যাহার জন্য তাঁহাকে বহুবার দুঃখভোগী হইতে হইয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্বে একপত্রে তিনি নরেশচন্দ্র সেনের কোন রচনাকে ভাল বলিয়াছিলেন, এই সব কথা লইয়া যখন জোড়াসাঁকোর বাটীতে কথাবার্তা চলে, প্রসঙ্গতঃ কবি বলেন যে তিনি নরেশচন্দ্রের প্রবন্ধের প্রশংসা করিয়াছিলেন, উপন্যাসের নহে। এই ব্যক্তিগত তুচ্ছ কথা কাগজে প্রকাশিত হইলে বিতর্কটি বিবাদে পরিণত হইয়া উঠিল। রবীন্দ্রনাথ উত্তেজিত মনে নরেশচন্দ্রকে একখানি পত্র দেন, তাহার ভাষা কবিজনোচিত হয় নাই।"[১৯]—রবীন্দ্রনাথের এই পত্র লেখার কারণ সম্পর্কে জীবনীকার লিখেছেন "ইহার কারণও ঘটিয়াছিল, এই সময়ে একদিন 'শনিবারের চিঠি'র দল কবির সঙ্গে দেখা করিতে আসেন, যেমন অন্য সকলে আসে তেমনিভাবেই তাঁহারা আসিয়াছিলেন। বাহিরের লোক ভাবিল যে কবি এই দলে যোগ দিয়াছেন এবং সেই সম্বন্ধে লোকে পত্র লিখিয়া কৈফিয়ত দাবী করিল। এই ধরনের পত্র পাইয়া কবির মন খুব তিক্ত হইয়া ওঠে এবং সেই দুর্বল মুহূর্তে নরেশচন্দ্রকে পত্রখানি লিখিত হয়।"[২০]

সাহিত্য ধর্মের সীমানা বিচার নিয়ে যে সাহিত্য-দ্বন্দ্বের শুরু হয়েছিল ব্যক্তিগত আলোচনা ও আক্রমণের ফলে তা ক্রমশঃ তিক্ত হয়ে প্রায় বিবাদে পরিণত হলো। 'সাহিত্যের রীতি ও নীতি' প্রবন্ধে শরৎবাবু নরেশ সেনগুপ্তের ভাষাজ্ঞানের যে প্রশংসা করেছিলেন তাকে চ্যালেঞ্জ করে 'শনিবারের চিঠি' নরেশচন্দ্রের ভাষা জ্ঞানের দুর্বলতা প্রমাণের জন্য এক বিরাট তালিকা প্রকাশ করলো—বলা বাহুল্য তালিকাটি নরেশচন্দ্রের কথা-সাহিত্য থেকে উদ্ধৃত বাক্য বা বাক্যাংশ।

'রবীন্দ্রনাথ নরেশচন্দ্রের প্রবন্ধের প্রশংসা করেছিলেন, উপন্যাসের নয়' একথাটা 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত হলে নরেশচন্দ্র অত্যন্ত বিব্রত বোধ করেন। কেননা নরেশচন্দ্র তাঁর গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে রবীন্দ্রনাথের প্রশংসাটি ব্যবহার করেছিলেন, তাই বাধ্য হয়ে তিনি সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য রবীন্দ্রনাথকে একটি পত্র দেন। সেই চিঠিতে তিনি লিখলেন "……আপনার কোনও অখ্যাত অনুচর……নাকি লিখিয়াছে যে আপনি আমার লেখা সম্বন্ধে যে প্রশংসাপত্র দিয়াছিলেন তাহা কেবল আমার প্রবন্ধ সম্বন্ধে

লিখিয়াছিলেন, গল্প উপন্যাস সম্বন্ধে নয়। লেখককে যে আপনি একথা বলিয়াছেন এবং একথা প্রকাশ করিবার অনুমতি দিয়াছেন সে বিষয় সন্দেহ থাকিতে পারে না। ......কথাটা সত্য কিনা বিচার নিষ্প্রয়োজন। আপনি যখন আমাকে চিঠি লিখিয়াছিলেন ......সে পত্রে আপনি কোথাও এরূপ আভাস দেন নাই যে আমার লেখা অর্থে আমার প্রবন্ধ বুঝিয়াছিলেন এবং গল্প সম্বন্ধে ওকথা প্রযোজ্য নয়।

তারপর যখন 'কাঁটার ফুল' উপন্যাস প্রকাশিত হয়, তাতে আপনার পত্রাংশ প্রকাশিত হয়েছিল।......বইখানা হস্তগত হইবার পরই আমি সেজন্য আপনাকে বইখানা পাঠাইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া চিঠি লিখিয়াছিলাম, কেননা আমার মনে হইয়াছিল যে আপনার নিকট প্রকাশের অনুমতি না লইয়া ঐ পত্র ছাপা অন্যায় হইয়াছে......। আমার সে পত্রের উত্তর পাওয়ার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। সে উত্তরে আপনি কোনরূপ অসন্তোষ প্রকাশ করেন নাই।...ওকথা যে আপনি আমার প্রবন্ধ সম্বন্ধেই লিখিয়াছিলেন এবং উহা আমার উপন্যাস সম্বন্ধে প্রয়োগ করা উচিত নয় ইহার আভাসও আপনি সে পত্রে দেন নাই।...কিন্তু দুঃখ এই যে আপনার সে অভিপ্রায় আমাকে না জানাইয়া আপনি আমার পরোক্ষে অন্য ব্যক্তিকে জানাইয়া তাহা প্রচার করিবার অনুমতি দিয়াছেন। ইহা এভাবে প্রচারিত হইলে যে আমি জগতের কাছে মিথ্যাবাদী ও বঞ্চক বলিয়া পরিচিত হইব এ সহজ কথাটা আপনার মনে হয় নাই, ইহা মনে হয় না। আপনার অনুচরটি খবরটা অত্যন্ত ছড়াইয়াছে এবং তার চালে হয়তো আমি লোকের কাছে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হইয়া গিয়াছি। সেজন্য এই পত্রখানি প্রকাশ করিতে বাধ্য হইতেছি। আপনার যদি সে বিষয়ে কোনও আপত্তি থাকে, তবে জানাইলে বাধিত হইব।"

১৩৩৪ সালের ১৩ই অগ্রহায়ণ রবীন্দ্রনাথ নরেশচন্দ্রের পত্রের উত্তরে জানালেন "সামাজিক প্রবন্ধে আপনার সাহসিকতা দেখিয়া আপনাকে প্রশংসা করিয়াছি......যখন আপনার গল্পের বহির বিজ্ঞাপনে উক্ত প্রত্রাংশ দেখিতে পাই তখন বিস্মিত হইয়াছিলাম এবং যে কেহ আমাকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছেন তাঁহাদিগকে এইভাবেই উত্তর দিয়াছি। বিনা প্রশ্নে, একথা লইয়া আলোচনা করিবার কথা সম্প্রতি বা পূর্বে আমার মনেও উদয় হয় নাই।"

রবীন্দ্রনাথের উপরোক্ত পত্রাংশ থেকে একথা স্পষ্টই বোঝা যায় যে তিনি 'শনিবারের চিঠি'র দলের বা সজনীকান্ত দাসের প্রশ্নের উত্তরেই নরেশচন্দ্রের লেখা সম্পর্কে তাঁর নিজের মনোভাবের কথা ব্যক্ত করেছেন। নরেশচন্দ্রকে লিখিত এই পত্রে আরো দু'টি বিষয় উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ নিজের মনের ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। প্রথমত, তিনি উল্লেখ করলেন যে, তাঁর 'সাহিত্য ধর্ম' প্রবন্ধ তিনি নরেশচন্দ্রকে উদ্দেশ্য করে লেখেননি এবং অভিযোগ করলেন যে, কবি যখন প্রবাসে তখন নরেশচন্দ্র কবিকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করার জন্য চেষ্টা করেছেন। কবির এই পত্রের উত্তরে নরেশচন্দ্র কবির প্রবাসে থাকা কালীন অবস্থায় 'ফরোয়ার্ড' কাগজে যে পত্র প্রকাশ করেছিলেন, তার উদ্ধৃতি দিয়ে

রবীন্দ্রনাথকে ব্যাপারটা বোঝানোর চেষ্টা করেন এবং সন্দেহ প্রকাশ করেন যে কবি হয়ত নরেশচন্দ্রের সেই চিঠি দেখবার অবকাশ পাননি, লোক পরম্পরা শুনেছেন মাত্র।[২১] এই সব ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের জন্যই নরেশচন্দ্রের সঙ্গে কবির সম্পর্ক মতান্তরে পরিণত হয়।

ইতিপূর্বে বিদেশে থাকাকালীন রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করেছিলেন 'সাহিত্যের নবত্ব' নামে আরও একটি প্রবন্ধ। সেই প্রবন্ধ প্রকাশের পূর্বেই হয়ত তিনি তাঁর 'সাহিত্য ধর্ম' প্রবন্ধ সম্পর্কিত আলোচনা দেখেছিলেন বা শুনেছিলেন, তাই এই প্রবন্ধটি তাঁর পূর্ব প্রবন্ধটির পরিপূরক হয়ে উঠেছে। দিলীপকুমার রায়কে লেখা কবির চিঠিই [২২] একথা অনুমান করতে আমাদের প্ররোচিত করে।

সজনীকান্ত দাস ও শনিবারের চিঠি-র দলের সঙ্গে কল্লোল ইত্যাদির নব্য-লেখক-কুলের সাহিত্যাদর্শ নিয়ে যে মতান্তর দেখা দিয়েছিল, তা-ও মনান্তরে পরিণত হয়। "দুদলই নিজস্ব সাহিত্যাদর্শে প্রচণ্ড রকমের আস্থাশীল এবং পরস্পর অপরের মত সম্পর্কে সন্দিহান।" এই অবস্থা নিরসনের জন্য নিরপেক্ষ অধ্যাপক সাহিত্যসেবীর দল এই ঝগড়ার মীমাংসা করে দেওয়ার জন্য রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেন। এই নিরপেক্ষ সাহিত্যসেবী দলের মুখপাত্র ছিলেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ ও অপূর্বকুমার চন্দ। কলকাতায় বিশ্বভারতী সম্মেলনের উদ্যোগে জোড়াসাঁকোর 'বিচিত্রা' ভবনে ৪ঠা চৈত্র ও ৭ই চৈত্র ১৩৩৪, শনিবার ও মঙ্গলবার ঐ সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিনের সভার এক রিপোর্ট 'বাংলার কথা' সাপ্তাহিকে[২৩] প্রকাশিত হয়। সেই রিপোর্ট সঠিক না হওয়ায় রবীন্দ্রনাথ নিজে সেই সভায় তাঁর পরিবেশিত বক্তৃতা 'সাহিত্যরূপ' নামে প্রবন্ধাকারে 'প্রবাসী'তে প্রকাশ করেন[২৪] এবং তাঁর 'সাহিত্য সমালোচনা' প্রবন্ধের শুরুতেই লেখেন "·····আমরা গেলবারে যে আলোচনা করেছি তার একটা রিপোর্ট বেরিয়েছে। সে রিপোর্ট যথাযথ হয়নি।"[২৫]

বিচিত্রা ভবনের সেই সভায় প্রথমদিন, ৪ঠা চৈত্র অর্থাৎ শনিবার 'শনিবারের চিঠি'র দল উপস্থিত হয়নি। সেই সভায় রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতা করেছিলেন সাহিত্যের রূপকলা নিয়ে, সাহিত্যের বিষয়বস্তু সম্পর্কে কবি কোন আলোচনাই করেননি। দ্বিতীয় দিনের সভায় সাহিত্য বিতর্কের শরিক উভয়পক্ষ এবং নিরপেক্ষ অনেকেই যোগ দিয়েছিলেন। রক্ষণশীল দলে ছিলেন সজনীকান্ত দাস, অমল হোম, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার, নীরদচন্দ্র চৌধুরী, গোপাল হালদার, রবীন্দ্রনাথ মৈত্র ও অশোক চট্টোপাধ্যায়। আর আধুনিকদের সঙ্গে এসেছিলেন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, দীনেশ রঞ্জন দাশ ও রাধারাণী দেবী। নিরপেক্ষদের দলে ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অপূর্ব কুমার চন্দ, প্রশান্ত মহলানবীশ, প্রমথ চৌধুরী, নরেন্দ্র দেব এবং প্রভাত গঙ্গোপাধ্যায়।

সেই সভায় রবীন্দ্রনাথের কাছে সর্বপ্রথম অভিযোগ জানিয়েছিলেন রাধারাণী দেবী। কারণও ছিল। 'শনিবারের চিঠি' 'সাহিত্য কণা' ও 'মণিমুক্তা' অংশে রাধারাণী দেবীর পরিচয় দানের অছিলায় খুবই অনুচিত উক্তি করে। নরেন্দ্র দেবের সঙ্গে একটি যৌত

কবিতা রচনাকে কেন্দ্র করে শনিবারের চিঠি মন্তব্য করে যে কবিদ্বয়ের একাত্ম অনুভূতি ও অন্তরঙ্গতার কারণ আরও গভীরে ইত্যাদি। শুধু তাই নয়, রাধারাণী দেবীর 'কল্লোল'-এ প্রকাশিত একটি গল্পের মধ্য থেকে এমন কয়েকটি লাইন 'শনিবারের চিঠি' প্রকাশের জন্য বেছে নিয়েছিল, যা পড়লে অত্যন্ত অস্বস্তি হয়। অংশটি ছিল পুরীর সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে সমুদ্রস্নান সম্পর্কিত দু'টি মেয়ের নিভৃত সংলাপ। রাধারাণী দেবী বলেছিলেন যে, লেজমুড়ো কেটে নিলে শুধু মাছের টুকরো দেখে যেমন সম্পূর্ণ মাছ বা মাছের জাতকে সনাক্ত করা যায় না, এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। যাঁরা এভাবে খণ্ডিত অংশ প্রকাশ করছে, তাদের উদ্দেশ্য সাধু নয়, সংকল্প সৎ নয়, শুধু আধুনিক লেখকদের কালিমা লেপনই তাদের একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই ঘটনার বিবরণে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখেছেন—"......রবীন্দ্রনাথের বিচিত্রাগৃহে আধুনিক সাহিত্যের যে বিচারসভা বসে তাতে ফরিয়াদীপক্ষের প্রথম বক্তা রাধারাণী। সেদিনকার তাঁর সেই দার্ঢ্য ও দীপ্তি ভোলবার নয়।"[২৬] সেই সভা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন—"কথাকাটাকাটি আর হট্টগোল হয়েছিল মন্দ নয়, এর কি কোন ডিক্রি ডিস্‌মিস্ আছে, না এ নিয়ে আপোষ নিষ্পত্তি চলে? দল করে যদি সাহিত্য না হয়, তবে সভা করেও তার বিধিবন্ধন হয় না। চরম কথা বলেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। বলেছিলেন 'এদের লেখা যদি খারাপ তবে তা পড় কেন বাপু? খারাপ লেখা না পড়লেই হয়।' শুধু নিজেরা পড়েই ক্ষান্তি নেই অন্যকে চোখে আঙুল দিয়ে পড়ানো চাই...।"[২৭]

এই সভার কিছু উত্তর রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্য সমালোচনা' প্রবন্ধে প্রকাশিত হয়। 'শনিবারের চিঠি'র দলকে সাহিত্য সমালোচনার ধারা সম্পর্কে কবি বলেছিলেন—"যে সমালোচনার মধ্যে শান্তি নেই, যা কেবলমাত্র আঘাত দেয়, কেবলমাত্র অপরা-রাধটুকুর প্রতিই সমস্ত চিত্ত নিবিষ্ট করে, আমি তাকে ঠিক মনে করিনে।"[২৮] 'শনিবারের চিঠি'র 'মণিমুক্তা' সম্পর্কে কবি বলেছিলেন—"যা মনকে বিকৃত করে সেগুলোকে সংগ্রহ করে সকলের কাছে প্রকাশ করলে উদ্দেশ্যের বিপরীত দিকে যাওয়া হয়।"[২৯] সাহিত্য সংস্কারের ক্ষেত্র সম্পর্কেও তিনি বলেছেন......"সাহিত্য সংস্কার কার্যে তাদের (শনিবারের চিঠি) কর্তব্যের ক্ষেত্র আছে—কিন্তু কর্তব্যটি অপ্রিয় বলেই এই ক্ষেত্রের সীমা তাঁদের একান্তভাবে রক্ষা করতে হবে। অস্ত্র-চিকিৎসায় অস্ত্র চালনার সতর্কতা অত্যন্ত বেশী দরকার, কেননা আরোগ্য বিধানই এর লক্ষ্য, মারা এর লক্ষ্য নয়।"[৩০]

রবীন্দ্রনাথের মধ্যস্থতার 'বিচিত্রা' ভবনের সেই সভায় সাহিত্যদ্বন্দ্বের কিন্তু পুরোপুরি মীমাংসা হল না। কেননা, সেই সভার আলোচনায় কোন দলই সন্তুষ্ট হতে পারেনি। "অতি আধুনিক সাহিত্যিকদের পিছনে রবীন্দ্রনাথের প্রশ্রয় আছে মনে করে 'শনিচক্র' তাঁকে আক্রমণ করতে কসুর করলেন না। রবীন্দ্রনাথ নজরুল ইসলামকে উৎসর্গ করেছিলেন 'বসন্ত' গীতিনাট্য (১৯২৩)। প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত প্রভৃতির রচনাশক্তির প্রশংসা করেছিলেন বিভিন্ন সময়ে। 'বিচিত্রা' ভবনের বৈঠকে রবীন্দ্রনাথ নবীন সাহিত্যিকদের বলেছিলেন—"তাদের সঙ্গে তার মতের কোন

পার্থক্য নেই এবং তিনি এটি জানতেন বলেই তাঁদের ডেকে পাঠিয়েছিলেন।"[৩১] আবার সাহিত্যের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা না করাতে নবীনপন্থীরাও অস্বস্তি ভোগ করেছিল। বিচিত্রা ভবনের সেই সভা সম্পর্কে রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাত মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেন, "......এই সভা আহ্বান দ্বারা যে কোন পক্ষের কোন উপকার সাধিত হইয়াছিল তাহা কেহ মনে করেন নাই। নিতান্তই কয়েকজনের অনুরোধে কবি এই অসম্ভব কার্যে নামিয়াছিলেন।"[৩২]

রবীন্দ্রনাথের মধ্যস্থতায় দুদলের দৃষ্টিভঙ্গী বা সাহিত্যাদর্শগত ভিন্নমত যে জায়গায় এসে দাঁড়াল তা হচ্ছে, সাহিত্যকে সাহিত্য হতে হবে। অবশ্য ইতিপূর্বেই নরেশচন্দ্র তাঁর সাহিত্যবিষয়ক একাধিক প্রবন্ধে এই মত ব্যক্ত করেছেন। 'উত্তরা' পত্রিকায় ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় একটি প্রবন্ধে[৩৩] লিখলেন যে সাহিত্য সাহিত্যই। কু-সাহিত্য বা সু-সাহিত্য বলে কিছু নেই। সেই প্রবন্ধে তিনি একথাও বললেন যে, দল বেঁধে আবেদন নিবেদন বা আর্জি নিয়ে জোড়াসাঁকোতে রবীন্দ্রনাথ বা অবনীন্দ্রনাথের কাছে বা বালিগঞ্জে প্রমথ চৌধুরীর কাছে প্রথম গিয়ে হাজির হ'তে পারাটাই সাহিত্য সেবার মূল উদ্দেশ্য নয় এবং বর্তমান আধুনিক সাহিত্যিকদের লেখা পড়ে বাঙ্গালা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিরাশ হওয়ারও কিছু নেই, যদিও তাঁরা রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ বা প্রমথ চৌধুরীর মত লিখছেন না। আর সমাজের 'বয়াটে' শরৎ চাটুজ্জে ও নরেশ সেনগুপ্তের জনপ্রিয়তা অবজ্ঞা করার মত নয়। অবজ্ঞা করার মত নয় কল্লোল-কালিকলম-প্রগতি পত্রিকা বা শৈলজা-অচিন্ত্য-প্রেমেন্দ্র-নজরুলের দল, অনুরূপা—যতীন্দ্রমোহন সিংহ বা সজনীকান্তের সমধর্মী না হলেও।

বিদেশযাত্রা স্থগিত রেখে রবীন্দ্রনাথ যখন বাঙ্গালোরে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের বাড়ীতে অবস্থান করছেন, তখন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত রবীন্দ্রনাথকে একটি চিঠি দেন। সেই চিঠির উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন যে তাঁরা পরস্পরকে আঘাত করতে গিয়ে এক মোহজালে জড়িয়ে পড়েছেন ইত্যাদি। এর পর নরেশ সেনগুপ্তের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে সাময়িক বিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল সেটা মিটে যায়। কিন্তু কবির সেই ভক্তদল, তখনও সন্তুষ্ট হতে পারেনি।

অনেকের ধারণা নরেশচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যাদর্শ ঘটিত বিরোধের সূত্রপাত 'বিচিত্রা' ভবনের আলোচনা সভা ও 'সাহিত্যরূপ' প্রবন্ধ।[৩৪] কিন্তু এ ধারণা ভ্রান্ত। সজনীকান্ত দাসের রবীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠি এবং রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্য ধর্ম' প্রবন্ধই এই সাহিত্যবিরোধের সম্ভাব্য কারণ হিসাবে অধিকতর গ্রহণযোগ্য। ('সাহিত্য ধর্ম' প্রথম প্রকাশ, 'বিচিত্রা', শ্রাবণ ১৩৩৪ এবং 'সাহিত্যরূপ' প্রথম প্রকাশ, 'প্রবাসী' বৈশাখ ১৩৩৫। বিচিত্রা ভবনের সভার তারিখ ৩রা ও ৭ই চৈত্র ১৩৩৪।)

সাহিত্য ধর্মের বিতর্ক মিটে যাওয়ার পরও কবির সেই ভক্তদল, যারা কবির কানের কাছে অহরহ গুঞ্জন তুলে নরেশচন্দ্রের বিরুদ্ধে কবিকে উত্তেজিত করে তুলেছিলেন, তাঁরা তখনও কারণে-অকারণে নরেশচন্দ্রকে কটূক্তি করে চলছিলেন। উদাহরণ হিসাবে সুনীতি

কুমার চট্টোপাধ্যায় রচিত 'যবদ্বীপের পথে' রচনার অংশ এবং সেই প্রসঙ্গে 'মানসী ও মর্মবাণী'র সমালোচনা উল্লেখ করা চলে।[৩৫]

প্রবাসীতে 'মালয়ে রবীন্দ্রনাথ' রচনাংশে সুনীতিবাবু লিখলেন—"২০শে জুলাই (১৯২৭) আমরা সিঙ্গাপুরে পৌঁছেচি।……সাধারণ ইউরোপীয়েরা কিন্তু এদেশে ভারতবাসীদের অতি হীন চোখে দেখে থাকে, কুলীর জাত বলে মনে করে। রবীন্দ্রনাথ সেই ভারতের লোক হয়ে এদেশে এসে রাজাধিরাজের চেয়েও বেশী সম্মান পাচ্ছেন,…… অনেক শ্বেতচর্মের কাছে বড্ড একটা অস্বস্তির কথা হয়ে উঠেছিল ; মালয়দেশের মধ্য দিয়ে তাঁর ভ্রমণ যে একটা Triumphal progress হয়ে দাঁড়িয়েছিল, এটা অনেকের ভাল লাগছিল না। এই অস্বস্তি আর বিরূপ ভাবকে প্রকাশ করলে সিঙ্গাপুরের 'মালয়া ট্রিবিউন কাগজ।…২রা আগষ্টের 'মালয়া ট্রিবিউন' এ সম্পাদকীয় প্রবন্ধ বেরুল—Dr. Tagore's politics : রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ imperialism এর বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেছেন, তিনি 'সাংহাই টাইমস' সংবাদ পত্রে ইংরেজদের দ্বারা চীনে ভারতীয় সৈন্য পাঠানোকে আর চীনদেশে ইংরেজ জাতের রাজনৈতিক কীর্তিকলাপকে কঠোর কষাঘাত করেছেন,…তিনি ব্রিটিশ শাসিত মালয় দেশে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করছেন, রাজার আদর পাচ্ছেন, সর্বত্র সমস্ত ইংরেজ কর্মচারীর সহানুভূতি আর সহযোগিতা পাচ্ছেন ; বাইরে সত্যি ব্রিটিশ জাতির নিন্দা করে বেড়াচ্ছেন কি না।……মালয়া ট্রিবিউন মালাইদেশের মালিক ইংরাজদের কবির বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দেবার চেষ্টা করলে।……কুআলালুম্পুরের ভারতীয়দের সংবাদপত্র 'মালায়ান ডেলিএক্সপ্রেস' তাদের ৬ই আগষ্টের তারিখের সংখ্যায় এইসব কথা খুলে লিখে দিলে—Anti Tagore bubble pricked—an object lesson in dishonest journalism……mischievous propaganda exposed…… বলে কড়া মন্তব্য লিখলে।……ব্যাপারটা সহজেই মিটলো মালাইদেশে, কিন্তু ভারতে তার ঢেউ এসে পৌছলো। দেশে ফিরে শুনলুম, এই নিয়ে দেশের খবরের কাগজের মধ্যে দু'একটিতে রবীন্দ্রনাথকে তাঁর অবর্তমানে তাঁর দেশের লোকের চোখে হীন প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা হয়েছে। কাগজগুলিতে…এইরূপ ইঙ্গিত করা হয় যে, রবীন্দ্রনাথ চীনে ভারতীয় সৈন্য পাঠানো সম্বন্ধে যা বলেছিলেন, মালয়দেশে গিয়ে সেখানকার ইংরেজদের খুসী রাখবার জন্য তিনি নিজ উক্তি প্রত্যাহার করেছেন।…… বাঙলার আধুনিক সাহিত্যের একজন দিগ্‌গজ মোড়ল, যিনি নিজের সম্বন্ধে নাকি ছাপায় উক্তি করেছেন যে সাহিত্য রঙ্গমঞ্চের আসরে তিনি অনেক নাচই নেচেছেন, সম্প্রতি অবসর নিতে চাচ্ছেন তিনি কাগজে চিঠি লিখে তাঁর righteous indignation বলে স্থায্য ক্রোধ প্রকাশ করলেন যে, লাট বাড়ীর ভোজের আর আরামের লোভে বুড়া বয়সে রবীন্দ্রনাথ সাহসের অভাব দেখিয়ে কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হয়ে নিজের উক্তিগুলি ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করেছেন।……তাঁর সম্বন্ধে আমাদের গেঁয়ো ঘেঁটমঙ্গলের পাণ্ডা নূতন পরকীয়া-তত্ত্বের সাহিত্যের ওস্তাদ এসে শিষ্টজনোচিত ভদ্র ভাষা প্রয়োগ করে বলেছেন to save his skin and to retain for himself

the comfort and the honour of the Government hospitality······ ইত্যাদি।"

সুনীতিবাবুর 'মালয়ে রবীন্দ্রনাথ' প্রসঙ্গে নরেশ সেনগুপ্তের চিঠির উক্তি অপ্রাসঙ্গিক নয়, কিন্তু নরেশ সেনগুপ্তের নাম না উল্লেখ করে তাঁর সম্পর্কে যে সব বিশেষণ সুনীতিবাবু ব্যবহার করেছেন তাঁদের সাহিত্যে রুচিনীতির বিরোধের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়, স্মরণ করিয়ে দেয় শনিবারের চিঠিতে মুদ্রিত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের ব্যঙ্গচিত্রের কথা।

সুনীতিবাবুর উক্ত লেখাটির প্রতিবাদে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত লিখলেন[৩৬] "চৈত্রের 'প্রবাসী'তে শ্রীযুক্ত সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একটা পুরাতন তর্কের পুনরুল্লেখ করিয়া আমার প্রতি কতকগুলি অযথা কটূক্তি করিয়াছেন। মালয়ে রবীনাথের উক্তি লইয়া আমি Forward পড়িয়া যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহাই তাঁহার কটূক্তির বিষয়। কিন্তু বোধ হয় তাঁহার লেখনী কলঙ্কিত হইবার আশংকায়—তিনি আমার নামটি করেন নাই।

এ বিষয় সম্বন্ধে পুনরালোচনা করিবার স্বাধীনতা আমার এখন নাই। কাজেই তাঁর বক্তব্য বিষয়টি লইয়া রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কোনও মতামত আমি প্রকাশ করিতে অক্ষম কিন্তু একথা আমি স্বীকার করিতেছি যে, টেলিগ্রাফে কবির উক্তির যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা সুনীতিবাবুর বর্ণিত বিবরণ হইতে ভিন্ন—এবং তন্মূলে আমি যে কথা বলিয়াছিলাম তার সব কথা সঙ্গত হয় নাই। সেজন্য আমি ত্রুটি স্বীকার করিতেছি।

আর একটা কথা। সুনীতিবাবু বলিয়াছেন যে রবীন্দ্রনাথ তার চামড়া বাঁচাইবার জন্য কিংবা লাট সাহেবের আতিথেয়তার লোভে তাঁর উক্তি প্রত্যাহার করিয়াছেন এই কথা আমি বলিয়াছিলাম। অনুগ্রহপূর্বক আমার পত্রখানি আদ্যোপান্ত যত্ন করিয়া পাঠ করিলে তিনি দেখিতে পাইবেন যে, আমি বাস্তবিক এই কথা বলি নাই। আমি বলিয়াছিলাম যে, রবীন্দ্রনাথের সত্যনিষ্ঠা ও তাহার আন্তরিকতার প্রতি বিন্দুমাত্র সন্দেহ করি না। কিন্তু স্থান কাল হিসাবে তাঁর কথাটা সঙ্গত হয় নাই এবং ইহা হইতে লোকে সহজেই বলিবে যে, তিনি একথা কেবল to save his skin বলিয়াছেন। আমার এ অভিপ্রায় আমি যথাজ্ঞান সরল ইংরাজী ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছিলাম এবং ইংরাজী ভাষায় আমার অপরিসর জ্ঞান অনুসারে আমার কথার দ্বারা ইহাই প্রকাশ হইয়াছিল মনে হয়। অবশ্য সুনীতিবাবুর মত ইংরাজীতে এম.এ. আমি নই এবং আমার ভাষাজ্ঞানে ত্রুটি থাকিতে পারে।

বিচার্য বিষয়ের সঙ্গে আমার সাহিত্যিক জীবনের কোন সম্পর্ক না থাকিলেও তাহা লইয়া সুনীতিবাবু ব্যক্তিগতভাবে আমাকে কটূক্তি করিয়াছেন। তাঁর এই অপ্রাসঙ্গিক আলোচনার উত্তরে কোন কথা বলিয়া অবান্তর বিষয়ের অবতারণা করিতে ইচ্ছা করি না। এ বিষয়ে আলোচনার স্থান অন্যত্র। কিন্তু আমার বিবেচনায় এরূপ কটূক্তি সুনীতি বা সুরুচি দু'য়ের একটারও পরিচয় দেয় না। ভাষাতত্ত্বে আমার অধিকার নাই, কিন্তু শুনিয়াছি সুনীতিবাবু সে সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করিয়াছেন। ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় ইতরের ভাষা ও ভাবে তাঁর এতটা দখল হইয়াছে জানিতাম না।"

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সেই সংখ্যার প্রবাসীতেই নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের প্রতিবাদের এক প্রত্যুত্তর[৩৭] প্রকাশ করেন। কিন্তু সেই প্রত্যুত্তরে নরেশবাবু সম্পর্কে তাঁর নিজের অপ্রাসঙ্গিক উক্তি সম্বন্ধে কোন কথাই লেখেন নাই, অপরপক্ষে বহুবচনে প্রকাশ করেছেন যে তাঁদের 'ভদ্র-ইতর' সম্বন্ধে 'রুচি ও ধারণা' নরেশবাবু থেকে পৃথক।

'মানসী ও মর্ম্মবাণী'র[৩৮] মাসিক সাহিত্য সমালোচনায় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রচিত 'যবদ্বীপের পথে'র উপরোক্ত আলোচ্য অংশের এক বিস্তারিত সমালোচনা প্রকাশিত হয়। সেই আলোচনায় লেখা হয়েছিল—

"কবি ও রসিকের দিগ্বিজয় যাত্রার কথা ভাষার anatomist এর হাতে পড়িয়া যতটা নীরস হইতে পারে তাহা হইয়াছে। এবারে কিন্তু একটা রস আছে—সেটা নিরতিশয় তিক্ত রস।

মালয় টাইমস্ পত্রে রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করিয়া যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার উত্তরে কবি কি বলিয়াছেন তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ সে সময়ে খবরের কাগজে প্রকাশিত হইয়াছিল, এবং Forward পত্রে ডঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এক পত্র লিখিয়াছিলেন। তাহা লইয়া সেই সময় এবং রবীন্দ্রনাথ দেশে ফিরিবার পর কিছুদিন পর্যন্ত কতকটা অপ্রীতিকর আলোচনা হইয়াছিল।

সুনীতিবাবু বর্তমান প্রবন্ধে সেই পুরাতন কথা ঘাঁটাইয়া তুলিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় না তুলিলেই ভাল ছিল। সে সময়কার সেই তর্কযুদ্ধ কাহাকেও আনন্দ দেয় নাই। সাময়িক উত্তেজনা প্রশমিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই অরুচিকর কথাটা থিতাইয়া পড়িয়াছিল, তাতে লোকে সুখী বই দুঃখিত হয় নাই। এতদিন পর সেকথা ঘাঁটাইয়া তুলিয়া বিরোধের নির্বাপিত অগ্নি আবার প্রজ্জ্বলিত করিবার চেষ্টার কোন প্রয়োজন ছিল না।

......(সুনীতিবাবুর) উদ্দেশ্য বোধ হয় কবির নামে যে অযথা গ্লানি হইয়াছে তাহা দূর করা। দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, তাঁর বক্তব্যের অপরিচ্ছন্নতায় তাঁর সাধু উদ্দেশ্যের হানি হইয়াছে। আমাদের মনে কোনও সন্দেহ নাই যে সুনীতিবাবু যে কথা বলিবার জন্য যত্ন করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ ঠিক—রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই মালয়ে গিয়া এমন কিছুই বলেন বা করেন নাই যাহাতে তাঁহার বা তাঁর দেশবাসীর মুখ হেঁট হইয়াছে। কিন্তু আমাদের একথা বুঝাইবার জন্য লেখকের যত্নের প্রয়োজন ছিল না। যাঁহাদের বুঝাইবার দরকার ছিল, তাহাদের সন্তুষ্ট করিবার মত করিয়া সুনীতিবাবু কথাটা বলিতে পারেন নাই।

সুনীতিবাবুর দেশে ফিরিয়া গিয়া অবিলম্বে মালয়-ঘটিত কথার প্রকৃত বিবরণ প্রকাশ করা উচিত ছিল। যখন কথাটা উঠিয়াছিল, মিথ্যা হইলে তখনই সেকথার উত্তর দেওয়া উচিত ছিল। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং কথাটা তুচ্ছ করিতে পারেন, কিন্তু তাঁর ছায়া প্রত

প্রসাদপুষ্ট অনুচর যাঁরা, তাঁদের সে সময় কথাটা প্রকাশ করিবার কোনও চেষ্টা না করা গর্হিত হইয়াছে। তারপর দুই বৎসর চলিয়া গিয়াছে—এতদিন পর সুনীতিবাবুর কর্তব্য বুদ্ধির বিলম্বিত চেতনা হইয়াছে। এখন তুলিবার প্রয়োজন ছিল না, আর এতদিনকার বাসি উত্তরের মূল্যও লোকচক্ষুতে খুব বেশী হইবে না। অভিযোগের বিলম্বিত উত্তরে লোকে সহজেই আস্থা করে কম।

…রবীন্দ্রনাথের কার্যের সুসঙ্গতি প্রতিষ্ঠার জন্য যে সব প্রমাণ লেখক অনায়াসে দিতে পারিতেন সেগুলি প্রকাশ না করিয়া তিনি দিয়াছেন সমস্ত ঘটনা ও উক্তিগুলি সম্বন্ধে তাঁর নিজের Impression, এ অতি অপটু তার্কিক লক্ষণ। তাঁর পক্ষ সত্য পক্ষ হইলেও তাঁর ওকালতির ত্রুটিতে সত্যটা সন্দেহে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

যে কথা তাঁর বিশেষভাবে বক্তব্য সে বিষয়ে এমন অপ্রচুর বিবরণ উপস্থিত করিয়া লেখক পরিশেষে রক্তচক্ষু হইয়া নিন্দুকদের প্রতি দীর্ঘছন্দে তর্জন গর্জন করিয়াছেন। যাঁহারা এখানে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের সমালোচনা করিয়াছিলেন তাঁহাদের গালি দিতে গিয়া লেখক শিষ্টতা বা সত্যনিষ্ঠা কোনওটারই পরিচয় দেন নাই। ডঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের সম্বন্ধে তাঁর উক্তিগুলিই ধৃষ্টতা ও অশিষ্টতার চরম নিদর্শন।

আমাদের যতদূর স্মরণ হয়, ফরোয়ার্ড ও বেঙ্গলী পত্রে নরেশবাবুর যে দু'খানি চিঠি এ বিষয়ে প্রকাশ হয়েছিল তার একটিতেও তিনি নিজে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এমন কথা বলেন নাই যে, রবীন্দ্রনাথ মিথ্যাকথা বলিয়াছেন কিম্বা অসরলভাবে কোনও কথা বলিয়াছেন……নরেশবাবু রবীন্দ্রনাথের উক্তির তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁর নামে কটু কথা বলা 'শিষ্টজনোচিত ভদ্র ভাষা' বলিয়া আমাদের মনে হয় না। আর নরেশবাবুর পত্রের যে বিস্তৃত ভাবানুবাদ লেখক দিয়াছেন তাহাতেই সন্দেহ হয় যে 'মালয় টাইমস' বা রবীন্দ্রনাথের উক্তির যে ভাবানুবাদ তিনি দিয়াছেন তাহাও হয়তো তেমনি পক্ষপাত-দুষ্ট ও অসত্য।"

সুনীতিবাবুর 'যবদ্বীপের পথে' ও 'মালয়ে রবীন্দ্রনাথ' ইত্যাদি রচনায় নরেশচন্দ্রের বিরুদ্ধে যে সব কটূক্তি আছে তা নিয়ে আর খুব বেশী হৈ চৈ হয় নি, কেন না ইতিমধ্যে, রবীন্দ্রনাথ ও নরেশচন্দ্রের প্রীতির সম্পর্ক তখন পুনঃ প্রতিষ্ঠিত, এবং তাঁদের মধ্যে আর কোনও বিরোধের মালিন্য ছিল না। পরবর্তীকালে নরেশচন্দ্রকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একাধিক পত্রেই সেই প্রমাণ পাওয়া যায়।

অনেকের মতে রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' (১৩৩৫) প্রকাশের পর আধুনিক লেখককুল রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিয়েছিলেন কিন্তু নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত তার ব্যতিক্রম। তিনি রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিয়েছিলেন তার অনেক আগে, তাঁর 'আনন্দমন্দির' (১৩৩০) নাটকের উৎসর্গ পত্রে, এবং রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখে যখন সাময়িক বিরোধের অবসান ঘটিয়েছেন সে সময় বাঙ্গালোরে কবি নতুন উপন্যাসের কল্পনা করছেন, সেই উপন্যাসই 'শেষের কবিতা'।

কয়েকটি প্রাসঙ্গিক চিঠি

নরেশচন্দ্রকে শরৎচন্দ্র

সামতাবেড়
পাণিত্রাস পোস্ট
জেলা হাবড়া

মান্যবরেষু,

আপনার পত্র পাইয়াছি। আমাদের সাক্ষাৎ পরিচয় নাই বটে, কিন্তু পরিচয় একটা ত আছেই। এবার যখন ভবানীপুরের দিকে যাইব আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়া আসিব।

এই চিঠিটা যদি একটা দিনও আগে পাইতাম ত আমার একটু উপকার হইত। যে প্রবন্ধটা বঙ্গবাসীতে পাঠাইয়া দিয়াছি তাহার অল্প স্বল্প বদলাইয়া দিতাম।

আপনার প্রতি একটা বিরুদ্ধ ভাব যে কিছুদিন হইতে জমা হইয়া উঠিতেছিল তাহা জানিতে পারিয়াছিলাম, কিন্তু হঠাৎ কবি যে এম্‌নিধারা কিছু একটা লিখিয়া বসিবেন ভাবি নাই।

আমি আপনাকে 'আশ্রয়' দিব কি রকম? আমার শক্তি কতটুকু? তাছাড়া আমি বিশেষ কিছু লেখাপড়া করি নাই, মূর্খ বলিলেও অতিশয়োক্তি হয়না, অতি বিনয়ও হয়না। আপনার কাহারও আশ্রয়ের প্রয়োজন নাই। আপনি যেমন দ্রুত লিখিতে পারেন, তেমনি গুছাইয়া লিখিতে পারেন—এ আপনার পেশা—আপনাকে পরাজয় মানিতে হইবে না। দিন কতক পরে এই সব আক্রমণ এই সব ছোট ছোট তীর কোথায় যে থাকিবে তাহার স্থিরতা নাই। ইহাতে বিচলিত হইবার কি আছে?

আপনার অনেক লেখাই আমি পড়িয়াছি। অবশ্য মাসিকের পাতায়। অনেক জায়গায় আপনার লেখার সহিত আমার মতের অনৈক্য আছে কিন্তু সে সাহিত্যের ধর্ম বা সত্যকার principle লইয়া নয়। দেশ ও কালের উপযোগিতা লইয়াই। কিন্তু সে তো ব্যক্তিগত মতামতের ব্যাপার। এবং আমার মতই যে অভ্রান্ত একথা বলিবার দুঃসাহসও আমার নাই, ভাবিবার স্পর্দ্ধাও নাই। আপনার গোড়ার দিকের দুই একটা বই কিছু কঠিন হইয়া গিয়াছিল বলিয়াই আমার ধারণা। কিন্তু তাহার পরের গ্রন্থগুলায় সে দোষও দেওয়া চলে না। কিন্তু ইচ্ছা করিয়া সাহিত্যের রুচিকে আপনি বিকৃত করিয়াছেন এই অভিযোগ যেমন অসঙ্গত তেমনি অন্যায়।

মতবিভেদও থাকে রুচি ভেদও থাকে কিন্তু তাই বলিয়া আপনার সাহিত্যিক শুভবুদ্ধি ও সততার প্রতি এই ধরনের অপরাধ চাপানোর চেষ্টার মত অপরাধ অল্পই আছে।

এ বিপদ একদিন আমারও ছিল। রবীন্দ্রনাথের নিজের কি? আমার কথা এই যে এ সকলের স্থায়িত্ব নাই।

আপনার সহিত একদিন আমি শীঘ্রই দেখা করিব। তখন অন্যান্য কথা হইবে। আমাকে বই পাঠাইবেন না, আমি আপনিই সংগ্রহ করিয়া লইব।

আশাকরি কুশলে আছেন।

ইতি ২৯শে ভাদ্র ১৩৩৪
বিনীত
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

Forward-এ আপনার চিঠি (রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে) পড়িয়াছি, অমল হোমের জবাবও পড়িয়াছি। এ যে কি জবাব এবং কি লেখা সে আর বলিব না, কিন্তু আপনারও ও চিঠি লিখিলেই হইত। একটা কথা মনে রাখিবেন লজ্জিত মানুষকে লজ্জা দিতে নাই।

রবীন্দ্রনাথকে নরেশচন্দ্র

পরমশ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার কোন অখ্যাত অনুচর সম্প্রতি আমাকে গালাগালি দিয়া খ্যাতিলাভের সংক্ষিপ্ত পথ আবিষ্কার করিয়াছে। সে ব্যক্তির সঙ্গে আপনার কিঞ্চিৎ নিবিড়পরিচয় সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে এরূপ পরম্পরায় শ্রুত হইলাম। তার লেখা আমার পড়িবার অবসর হয় নাই কিন্তু শুনিলাম যে সে নাকি লিখিয়াছে যে আপনি আমার লেখা সম্বন্ধে যে প্রশংসা পত্র দিয়াছিলেন তাহা কেবল আমার প্রবন্ধ সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন গল্প বা উপন্যাস সম্বন্ধে নয়।

লেখককে যে আপনি একথা বলিয়াছেন এবং একথা প্রকাশ করিবার অনুমতি দিয়াছেন সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। কেন আপনি একথা বলিতে গিয়াছিলেন আর একথা বলিয়া তাহা প্রকাশ করিবার জন্যই বা কেন ব্যগ্র হইয়াছিলেন, সেই হেতুটা বুঝিতে পারিলাম না।

কথাটা সত্য কিনা বিচার নিষ্প্রয়োজন। আপনি যখন আমাকে চিঠি লিখিয়াছিলেন তখন আমার কতকগুলি প্রবন্ধ গুটিকয়েক গল্প এবং খানকয়েক উপন্যাস প্রকাশিত হইয়াছিল। আমি কয়েকখানা উপন্যাস আপনাকে উপহার দিয়াছিলাম। তারপর আপনি লিখিয়াছিলেন যে আমার 'লেখা' আপনি কতক পড়িয়াছেন এবং পড়িয়া সাধুবাদ করিয়াছেন ইত্যাদি এবং আপনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সে পত্রে আপনি কোথাও এরূপ আভাস দেন নাই যে আমার লেখা অর্থে আমার প্রবন্ধ বুঝাইয়াছিলেন এবং গল্প সম্বন্ধে একথা প্রযোজ্য নয়।

তারপর 'কাঁটার ফুল' উপন্যাস প্রকাশিত হয়, তাতে আপনার পত্রাংশ প্রকাশিত হইয়াছিল। আমার ঢাকার কোনও যুবক বন্ধু কলিকাতায় আসিয়া এ কার্য্যটি করাইয়াছিলেন, আমি ইহার কথা পূর্বে জানিতাম না। বইখানা হস্তগত হইবার পরই আমি সেজন্য আপনাকে বইখানা পাঠাইয়া ক্ষমাভিক্ষা করিয়া চিঠি লিখিয়াছিলাম, কেননা আমার মনে হইয়াছিল আপনার নিকট, প্রকাশের অনুমতি না লইয়া ঐ পত্র ছাপা অন্যায় হইয়াছে, এবং যেভাবে উহা ছাপা হইয়াছে তাহাতে উহা 'কাঁটার ফুল' বিষয়েই লেখা হইয়াছে লোকে এরূপ মনে করিতে পারে, উহা হয়ত আপনার অনুমোদিত না হইতে পারে।

আপনার সে পত্রের উত্তর পাইবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। সে উত্তরে আপনি কোনরূপ অসন্তোষ প্রকাশ করেন নাই এবং এই প্রকাশ যে আপনার অননুমোদিত এমন কথাও জানান নাই। ওকথা যে আপনি আমার প্রবন্ধ সম্বন্ধেই লিখিয়াছিলেন এবং উহা আমার উপন্যাস সম্বন্ধে প্রয়োগ করা উচিত নয় ইহার আভাসও আপনি সে পত্রে দেন নাই।

তারপর বহু বৎসর চলিয়া গিয়াছে। এতদিন পর আপনার সে প্রশংসা প্রত্যাহার বা তার অর্থসংকোচন করিবার ইচ্ছা হওয়া কিছুই আশ্চর্য্য বা অন্যায় বলিয়া মনে করি না। কিন্তু দুঃখ এই যে আপনার সে অভিপ্রায় আমাকে না জানাইয়া আপনি আমার পরোক্ষে অন্য ব্যক্তিকে জানাইয়া তাহা প্রচার করিবার অনুমতি দিয়াছেন। ইহা এভাবে প্রচারিত হইলে যে আমি জগতের কাছে মিথ্যাবাদী ও বঞ্চক বলিয়া পরিচিত হইব এ সহজ কথাটা আপনার মনে হয় নাই ইহা মনে হয় না।

আপনার নিকট প্রশংসা ও সমাদর লাভে আমার লোভ যতই থাকুক, তাতে আমার কর্তব্যজ্ঞান ক্ষুণ্ণ করিতে পারে না। সুতরাং আপনি যদি আপনার অভিপ্রায় আমাকে জানাইতেন তবে আমি স্বয়ং প্রকাশ্যে ভুল বুঝিবার জন্য ত্রুটি স্বীকার করিয়া সে পত্র প্রত্যাহার করিতাম। কেননা যিনি আমাকে সমাদর করিয়া লজ্জিত তাঁর সমাদর লইয়া বড়াই করিয়া বেড়াইব এতটা দৈন্য আমার নাই।

তাছাড়া সময়ে জানিলে আর একটা উপকার হইত। গত অগ্রহায়ণের বিচিত্রায় আমার যে লেখা বাহির হইয়াছে, বোধ হয় পরম্পরায় শ্রুত হইয়াছেন যে তাতে আমি প্রকাশ করিয়াছি যে 'শান্তি' প্রকাশিত হইবার পর আপনি আমাকে সাক্ষাতে সে বইয়ের সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। আপনি আমাকে প্রশংসা পত্র দিয়াই যে রকম কুণ্ঠিত দেখিতেছি, তাতে একথা প্রকাশ হওয়ায় নিশ্চয়ই অত্যন্ত বিব্রত বোধ করিতেছেন। আপনার মত পরিবর্তনের বিষয় আগে জানা থাকিলে কথাটা প্রকাশ করিয়া আপনাকে বিড়ম্বিত করিতাম না।

যাহা হউক, আমার প্রকাশককে জানাইয়া আমার বইয়ের বিজ্ঞাপন হইতে আপনার পত্রখানি উঠাইয়া লইতে উপদেশ দিতেছি। যাহা ছাপা হইয়া গিয়াছে তাহার উপর আমার হাত নাই, সেজন্য মার্জ্জনা ভিক্ষা করি।

পরিশেষে নিবেদন করিতেছি যে যদিও কর্তব্যানুরোধে সম্প্রতি আমাকে আপনার অপ্রীতিভাজন হইতে হইয়াছে, তথাপি প্রকাশ্যে আমার গ্রন্থাবলীর বহুস্থানে আপনার সম্বন্ধে যে মতামত প্রকাশ করিয়াছি এখনও তার কোন অংশ বিন্দুমাত্র সঙ্কোচন বা প্রত্যাহার করিয়া দত্তাপহারকের প্রত্যবায় অর্জ্জন করিবার কিছুমাত্র আকাঙ্ক্ষা আমার নাই। আপনার প্রতিভার প্রতি আমার ভক্তি ও শ্রদ্ধা অচলা আছে এবং আশা করি চিরদিন থাকিবে।

আর একটা কথা বলি। আমার মত নগণ্য ব্যক্তির উপর যদি আপনার ক্রোধের কোনও কারণ হইয়া থাকে তবে স্বয়ং আঘাত করিতে কি আপনি কুণ্ঠিত? আপনি যদি আঘাত করিতে ইচ্ছা করেন তাতে নিন্দার কোন কথা নাই, আর আমিও যদি সাধ্যমত আত্মরক্ষার চেষ্টা করি তাতেও কেহ দোষ দিতে পারিবে না। কিন্তু যাদের বিরুদ্ধে আমি অস্ত্রধারণে অক্ষম সেই শিখণ্ডীর দল দাঁড় করাইয়া গোপনে অস্ত্রাঘাত কি শিষ্ট যুদ্ধরীতি?

এমন একটা ব্যক্তিগত বিষয় লইয়া কাগজে ঘাঁটাঘাঁটি হয় ইহা আমার ইচ্ছা ছিল না কিন্তু দেখিতে পাইতেছি যে আপনার অনুচরটি খবরটা অত্যন্ত ছড়াইয়াছে এবং তার চালে হয়ত আমি লোকের কাছে মিথ্যাচারী সাব্যস্ত হইয়া গিয়াছি সেজন্য এই পত্রখানি প্রকাশ করিতে বাধ্য হইতেছি। আপনার যদি সে বিষয়ে কোন আপত্তি থাকে তবে জানাইলে বাধিত হইব।

প্রণত

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

নরেশচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথ

ওঁ

কলিকাতা

বিনয়সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন—

সামাজিক প্রবন্ধে আপনার সাহসিকতা দেখিয়া আমি আপনাকে প্রশংসা করিয়াছি। সে সময় সমাজবিরুদ্ধ মত অসঙ্কোচে প্রকাশ করা সহজ ছিল না। গল্প রচনায় যদি কিছুর প্রশংসা করিতে হয় তাহা ভাষা নৈপুণ্য ও কল্পনাশক্তির, সামাজিক দুঃসাহসিকতা গল্প সাহিত্যের মুখ্য ও প্রশংসাযোগ্য পরিচয় হইতে পারেনা। যখন আপনার গল্পের বাহির বিজ্ঞাপনে উক্ত পত্রাংশ দেখিতে পাই তখন বিস্মিত হইয়াছিলাম এবং যে কেহ আমাকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছেন তাহাদিগকে এই ভাবেই উত্তর দিয়াছি। বিনা প্রশ্নে একথা লইয়া আলোচনা করিবার কথা সম্প্রতি বা পূর্বে আমার মনেও উদয় হয় নাই।

আপনার সহিত মতের বা রুচির পার্থক্য লইয়া ক্ষোভ অনুভব করি নাই। 'সাহিত্য ধর্ম্ম' প্রবন্ধে আমি আপনাকে লক্ষ্য করি নাই, আপনার গল্প আপনি কি ভাষায় ও কি ভাবে লেখেন তাহা আমি জানিও না। সাময়িক পত্রে বা গ্রন্থ আকারে যে গল্প বা কবিতা পড়িয়া আমি লজ্জা ও দুঃখবোধ করিয়াছি আপনার লেখা তাহার অন্তর্গত নহে। সুদীর্ঘকাল আপনার লেখা পড়িবার অবকাশ হয় নাই।

যখন আমি বিদেশে ছিলাম আপনি আমাকে মিথ্যাচারী প্রমাণ করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহের সহিত চেষ্টা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সাক্ষ্যের অপেক্ষা মাত্র করেন নাই। হয় আপনি বিশ্বাস করিয়াছেন এরূপ মিথ্যাচার আমার পক্ষে অসম্ভব নহে, নয় বিশ্বাস না করিয়াই লিখিয়াছেন। ইহা মত বা রুচিগত আচরণ নহে, চরিত্রগত, এই কারণেই ইহা ক্ষোভের বিষয়।

ইতি ১৩ অগ্রহায়ণ
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথকে নরেশচন্দ্র

পরমশ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার পত্র পাইলাম। আপনার পত্রাংশ আমার বইয়ের বিজ্ঞাপন স্বরূপ বাহির হইবার পর আপনি সে বিষয়ে আলোচনা ও মত প্রকাশ করিবার একাধিক অবসর পাইয়াছিলেন। আমার এক পত্রেই এ বিষয়ে আপনাকে নিবেদন করিয়াছিলাম এবং উত্তরে আপনি জানাইয়াছিলেন যে ইহাতে আপনার অসন্তুষ্ট হইবার কোনও কারণই নাই। সে কথা বোধহয় আপনি বিস্মৃত হইয়াছেন। যাহা হউক এ বিষয় লইয়া আপনার সহিত বাগবিতণ্ডা করা আমার পক্ষে অমার্জনীয় ধৃষ্টতা হইবে। আমি কেবল নিজের মান রক্ষার জন্য যাহা লিখিতে বাধ্য হইয়াছি তাহাতে আমি আনন্দ বোধ করি নাই।

এই প্রসঙ্গে আপনি যে আপনার মালয়ে কার্য্য সম্বন্ধে আমার পত্রের কথা উপস্থিত করিয়াছেন তার প্রসক্তি করিতে পারিলাম না। যাহা হউক আমার সে পত্র বোধহয় আপনার দেখিবার অবসর হয় নাই, তার বিবরণ পরম্পরায় শ্রুত হইয়া থাকিবেন। সে পত্রে আপনার উপর কোনও মিথ্যাচার আরোপ করা হয় নাই, পক্ষান্তরে বলা হইয়াছিল যে "I do not doubt the truth or sincerity, of his statement, but the question is whether that was the time or place for making it."

স্থান কাল হিসাবে আমি আপনার উক্তি অসঙ্গত বিবেচনা করিয়া বলিয়াছিলাম যে

ইহার পর যদি কেহ আপনাকে বলে যে গভর্ণরের নিমন্ত্রণের খাতিরে আপনি একথা বলিয়াছিলেন তবে তাহা আশ্চর্য্যের হইবে না—ইহা যে আমি মনে করিয়াছি এমন আভাস মাত্র দেই নাই।

আপনার কথার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেখিয়াই কথাটা লিখিয়াছিলাম সত্য কিন্তু ঐ পর্যন্ত, ঐ ব্যাপারের এমন কোনও পূর্ণতর বিবরণ দেখি নাই যাহাতে আমার ঐ মত পরিবর্ত্তন করিতে হইতে পারে। যদি তেমন বিবরণ দেখিতাম তবে সর্বাগ্রে অপরাধ স্বীকার করিয়া আমার উক্তি প্রত্যাহার করিতাম।

আপনি এ ব্যাপারে আমার মত বা রুচিগত প্রভেদ না দেখিয়া আমার চরিত্রের ক্রটি লক্ষ্য করিয়াছেন। আপনার অন্তর্দৃষ্টি চিরদিনই অসাধারণ বলিয়া বিখ্যাত। ইহা বোধ হয় সেই অসাধারণত্বের একটা নিদর্শন। কোনও কথা বিশ্বাস না করিয়া বলা বা কাহারও ওপর অযথা দুরভিসন্ধি আরোপ করা যে আমার চরিত্র নয় একথা আমার সঙ্গে আপনার পরিচয় থাকিলে আপনি জানিতে পারিতেন। যার চরিত্র বা আচরণ সম্বন্ধে কিছুই জানা নাই তার একটা বিশিষ্ট অভিমতের অপব্যাখ্যা করিয়া তার চরিত্রে দোষারোপও চরিত্রের একটা গুরুতর ক্রটি প্রকাশ করে। মতভেদ সম্বন্ধে যে অসহিষ্ণুতা ও অতিরিক্ত আত্মাভিমান এই প্রবৃত্তির সৃষ্টি করে তাহা আমাদের দেশে বিরল নয়। দুঃখ এই যে আপনার মত লোকের প্রতিভাও সে দোষ হইতে মুক্ত নয়।

ইতি
প্রণত
শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

নরেশচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথ

ওঁ

বাঙ্গালোর

বিনয়সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন

আপনার কাছ থেকে যে চিঠিখানি আজ আমার হাতে এসে পৌঁছল সেটিতে আমার বিশেষ প্রয়োজন ছিল এই কথাটি আমি অনুভব করেচি। কোথাও বেদনার কারণ ঘটিয়ে রেখে দিয়েছি একথা মনে করতে অত্যন্ত অশান্তি বোধ করি—এজন্য আপনার চিঠিখানি পেয়ে বিশেষ সান্ত্বনাবোধ করেচি। আমি জানি এরকম চিঠি লেখা সহজ নয়, খুব অল্পলোকই পারে। পরস্পরকে আঘাত করতে গিয়ে আমরা যে মোহজালে জড়িয়ে পড়ি আশা করি আমাদের দুজনের সম্বন্ধে সেটা সম্পূর্ণ কেটে গেছে।

ইতি
২২ জুন ১৯২৮
ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮

উপসংহার

একদা জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের নাম আজ বিস্মৃতপ্রায়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসগুলিতে বা বাংলা সাহিত্য সমালোচনার পাতায় তাঁর প্রসঙ্গ নামমাত্র উল্লেখিত হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাও হয় না।

তাঁর সাহিত্য-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত আলোচনায় সেকালে ও একালে যেটুকু দেখা গেছে, তাতে প্রায় সবাই তাঁকে অভিযুক্ত করেছেন বাংলা কথা-সাহিত্যে নারী-পুরুষের জৈবিক সম্পর্ক উত্থাপনের জন্য। বাংলা সাহিত্যে বিদেশী ঢঙে বাস্তবতা আমদানীতে তাঁর ভূমিকাও কারও কারও লক্ষণীয় হয়েছে। এসব সমালোচনা থেকেই অনুভব করা যায়, যে যাঁরাই তাঁকে নিয়ে আলোচনা করেছেন তাঁরা নরেশচন্দ্রের বিখ্যাত 'সাহিত্য ধর্মের সীমানা' প্রবন্ধটির আলোকেই তাঁকে দেখেছেন। ফলত তাঁর সমগ্র সাহিত্যকর্ম এবং তাঁর অভিনবত্ব সঠিকভাবে অদ্যাবধি নির্ণীত-হয় নি। তাঁর প্রচলিত পরিচয় তিনি 'রবীন্দ্র-বিরোধী' এবং সাহিত্যে অশ্লীলতা আনয়নের ক্ষেত্রে পথিকৃৎ। কিন্তু আমরা এই একদেশদর্শী ও খণ্ডিত ধারণা ও সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত নই।

নরেশচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য আলোচনা করে আমরা দেখেছি যে, নরেশচন্দ্র চেয়েছিলেন একটা সুস্থ সমাজব্যবস্থা। জমিদারী প্রথা লোপ করে কৃষকদের মধ্যে জমির

সুষম বিলিব্যবস্থার প্রস্তাব তাঁর সাহিত্যকর্মে উচ্চারিত। এই পরিবর্তন ঘটান ও নতুন সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা যে সহসা সম্ভব নয়, একথা তিনি বুঝতেন। তাই, এই পরিবর্তনের জন্য তিনি কোথাও কোনও সহজ পন্থার কথা বলেন নি। বাঞ্ছিত পরিবর্তনের পথে অন্তরায় হিসাবে তিনি দেখিয়েছেন সাধারণ মানুষের অশিক্ষা ও মিথ্যা সংস্কার, জমিদার শ্রেণীর শোষণনীতি ও তাদের ব্যক্তিগত জীবনের লাম্পট্য এবং মানবমনের জটিল আবর্ত। আর নারীর স্বতন্ত্র অধিকার সম্পর্কেও তাঁর বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর চিন্তাভাবনায়। তিনি বিশ্বাস করতেন যে নারীদের একমাত্র আদর্শ নিছক গৃহিণীপনাই নয়। সমাজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ভূমিকা গ্রহণের অবকাশ ও অধিকার নারীর আছে। কিন্তু নারীকে সে অধিকার অর্জন করে নিতে হবে যুগোপযোগী শিক্ষার সাহায্যে। তাদের স্বাবলম্বী হতে হবে, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উভয় দিক থেকেই। তাদের শুধু পুরুষের সহধর্মিণী হলেই চলবে না, তাদের হতে হবে পুরুষের সহকর্মিনীও। তিনি বিশ্বাস করতেন যে উপার্জনশীলা নারীর পক্ষে যতটা স্বাধীনতা ভোগ করা সম্ভব, অসহায় উপার্জনহীনা, পরনির্ভরশীলা নারীর পক্ষে ততটা সম্ভব নয়। তাঁর উপন্যাসের শুভা, করুণা, সুজাতা যে স্বাধীনতা পেয়েছে, গোপা বা অনীতা তা পায়নি, অবস্থাপন্ন ঘরের হলেও, এবং অবশেষে তাদের ধর্মের মধ্যে আশ্রয় নিতে হয়েছে। ধর্মের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে গোপাল—শারদাও কিন্তু এই ধর্মের মধ্যে আশ্রয় নেওয়ার কারণ স্বতঃস্ফুর্ত ও স্বাভাবিক আধ্যাত্মব্যাকুলতা নয়। তারা প্রচলিত ধর্মাবরণের মধ্যেই আত্মসমর্পণ করেছে যেন বাধ্য হয়েই। এই প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় তারা কিছুই পায় নি, পেতে পারে না। তাই তাদের শেষপথ ধর্মের পথ, আত্মরক্ষার পথ, পালিয়ে বাঁচার পথ। ধর্মের বেদনার মধ্যে, কৃচ্ছ্র-সাধনার মধ্যে ব্যথা ভোলার জন্য আত্মোৎসর্গ। কার্ল মার্কসের কথায়—

"Religious suffering is at the same time an expression of real suffering and a protest against real suffering. Religion is the sign of the oppressed creature, the feeling of a heartless world and the soul of a soulless circumstances···"

(Early Texts, Basil Blackwell, 1972. P-115)

নরেশচন্দ্রের সাহিত্য অনুসন্ধান করে আমরা পেলাম সাহিত্যে কিছু নতুন বিষয়বস্তু। যে বিষয়বস্তু আগে সাহিত্যে উপস্থাপিত হলেও এত স্পষ্টভাবে এতটা জোরের সঙ্গে তা সাহিত্যে তুলে ধরতে কেউ সাহসী হয়নি। তাঁর সাহিত্যে নারী বড় ঘরের দয়াময়ী গৃহিণীর ভূমিকায় অধিষ্ঠিত না হয়ে রাজপথে এসে দাঁড়িয়েছে বৃত্তির অন্বেষণে, খুঁজেছে মুক্তির পথ। স্বামীর অত্যাচার বা অবজ্ঞায় নীরবে নিভৃতে অশ্রু বিসর্জন করে তারা সান্ত্বনা খোঁজেনি গৃহদেবতার পদপ্রান্তে। তারা জীবনে যথার্থ প্রেমের সন্ধান করেছে, যে প্রেমের মধ্যে শ্রদ্ধা আছে অথচ রক্ত-মাংসের ক্ষুধাতৃষ্ণাও যেখানে স্বীকৃত। শিক্ষার

আলোতে, অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তাদের মনের রূপান্তর ঘটেছে, তাদের কাছে জীবন সম্পর্কে প্রচলিত মূল্যবোধ অর্থহীন হয়ে উঠেছে। পূর্ব প্রথাগত সংস্কারে আবদ্ধ হয়ে তারা থাকতে পারে নি, স্বামীর সঙ্গে প্রেমহীন সহবাসের সম্পর্ক থেকে অনায়াসে মুক্তি খুঁজেছে। নরেশচন্দ্রের সাহিত্যে নরনারী জীর্ণ সমাজব্যবস্থার মিথ্যা 'ট্যাবু' ও 'টোটেমের' মুখোস খুলে দিয়ে দৃপ্ত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়েছে।

এইসব সংস্কার ভাঙলেও, নরেশচন্দ্র কিন্তু ব্যভিচারকে প্রশ্রয় দেন নি। পরকীয়া প্রেমের লাগাম ধরেছেন শক্ত হাতে। গোপন ও অসামাজিক আসক্তির পরাজয় দেখিয়েছেন প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে, অথচ একবারও অস্বীকার করেননি মানব মনের বিচিত্র রহস্যময়তাকে বা নরনারীর যৌন আকর্ষণকে। এই আকর্ষণ বহুক্ষেত্রেই সামাজিক বিধি সম্মত নয়। তাই সামাজিক দৃষ্টিতে তাকে অবৈধ বলা যায়। অবৈধ, কেননা অসামাজিক। আর তাই এই অবৈধ অসামাজিক যৌন আকর্ষণ যখন যৌন সম্পর্কে পরিণত হয়, তখন তাকে সামাজিক বিচারে 'অপরাধ' বলেই বিবেচনা করা হয়। কিন্তু এ জাতীয় অপরাধের স্বরূপ কী? তার কারণই বা কী? এই জাতীয় যৌন আকর্ষণ যে সমাজের ব্যাধির বাহ্যপ্রকাশ একথা তিনি বিশ্বাস করতেন। তিনি বলেছেন যে এ সমাজে 'মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতাই অপরাধের দিকে' এবং 'পাপীকে বস্তুত মানুষ খুব বেশী ঘৃণা করে না।'

অবশ্য লেখকের আদর্শে রচিত তাঁর সাহিত্যের এই নায়ক-নায়িকারা সর্বাংশে সময় ও কালের প্রতিনিধিত্ব করে না কারণ তাঁর নায়ক-নায়িকারা নিজেদের সময়ের অগ্রবর্তী-রূপেই প্রতিভাত হয়। কিন্তু তবু তাদের অবাস্তব চরিত্র মনে হয় না। কেননা এসব আখ্যানের চরিত্রগুলির মধ্যে লেখক পূর্বাভাস দিলেন আগামী দিনের মানুষ ও সমাজের প্রতিচ্ছবির—যখন শোষণ থাকবে না, আর নারী ও পুরুষের প্রেম সম্মান ও সমানাধিকারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবে। কোনও জীর্ণ রুগ্ন অসুস্থ ও দেউলিয়া এবং প্রেরণাবিহীন সমাজব্যবস্থার দ্বারা নারী-পুরুষের সেই অসামান্য মহিমাময় প্রেম সেদিন আর নিয়ন্ত্রিত হবে না।

নরেশচন্দ্রের নায়িকা শুভা স্বামীগৃহ ত্যাগ করে শেষ পর্যন্ত সেবিকার ব্রত গ্রহণ করেছে যার পেছনে ছিল মুক্তির প্রয়াস। (শুভা। ১৯২০)

বিধবা মনোরমা বুঝতে পেরেছে যে, সে যে তার মৃত স্বামীর পট পুজো করে সতীত্ব ও একনিষ্ঠতার পরকাষ্ঠা দেখাচ্ছে সেটা আসলে একটা প্রচণ্ড আত্মপ্রবঞ্চনা। কারণ এ আবরণ তার দেহমন ও যৌবনধর্মের স্বাভাবিক আশা-আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধাচরণ ছাড়া কিছু নয়। (বিপর্য্যয়। ১৯২৪)

হিন্দু সধবা করুণা মুসলমান ফেরিওয়ালার সঙ্গে ঘর বেঁধেছে, কেননা প্রতারক স্বামী তাকে দিয়েছে শুধু নির্যাতন। আর ধনী লম্পট মন্মথ তার দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে, তার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে, হরণ করেছে তার সর্বস্ব। তথাকথিত ভদ্র সমাজ তাকে শুধু এই প্রতিদানই দিয়েছে। (দুষ্টগ্রহ। ১৯২৯)

সুজাতা তার রূপমুগ্ধ দেহলুব্ধ যুবকদলের মধ্য থেকে বেছে নিয়েছে শিল্পী প্রবীরকে, যে তাকে যথার্থ ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে। (পিছল পথের শেষে। ১৯৩৭)

শৈবলিনী চটকল-এর শ্রমিকদের মধ্যে সাংগঠনিক কাজ করেছে সতীনাথের কমরেড হয়ে, সমাজ, সংস্কার, স্বামী ও দুর্নামের ভয়কে জয় করেছে অনায়াসে। (অন্তরায়। ১৯৩১)

আর মণিকা একই রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী সহকর্মী সুকুমারকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং সামাজিক বিয়ে না করেই প্রেমের জোরে মাতৃত্বকে বরণ করেছে। (আমি ছিলাম। ১৯৫১)

তবু এই সব চরিত্র পাঠকদের কাছে বিন্দুমাত্র সহানুভূতি হারায়নি, তারা সবাই 'শুভা, অর্থাৎ মঙ্গলের অগ্রদূত', তাদের আচরণের গভীরে রয়েছে প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

নরেশচন্দ্র সমাজের বঞ্চনার ছবিও এঁকেছেন তাঁর রচিত চরিত্র ভৃত্যপুত্র গোপাল প্রচুর উপায় করেও ভদ্রলোক হ'তে পারে নি, তথাকথিত ভদ্রলোকেরা তাকে বাধা দিয়েছে। (শেষপথ। ১৯৩৪)

গোয়ালার ছেলে কৃষ্ণধন, বি. এ. পাশ করেও ভদ্রজীবিকার সন্ধান পায় নি, তাকে গোয়ালাগিরিই করতে হয়েছে। (পরিণাম। ১৯৩৩)

মৃৎশিল্পীর ছেলে হরিচরণ কলকাতার আর্ট স্কুলে পড়ে হতে চেয়েছিল শিল্পী কিন্তু কলকাতায় এসে সে শুধুই দারিদ্র্যকে সঙ্গী করেছে। (সর্বহারা। ১৯৩০)

চটকলের বিলাত ফেরৎ ইঞ্জিনিয়ার সতীনাথ শ্রমিক স্বার্থে কাজ করার জন্য চাকরী থেকে হয়েছে বিতাড়িত। (অন্তরায়। ১৯৩১)

'আর গ্রামের গরীব স্কুল মাষ্টার রবীন মার্কসের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে গ্রামের উন্নতি চেয়েছিল বলে তাকে গ্রামে, সমাজে ও সংসারে পরিচিত হতে হয়েছে 'অপদার্থ' পাগল বলে।' (রবীন মাষ্টার। ১৯৩৬)

মানুষের যৌন আসক্তি ও অপরাধ প্রবণতার কথাও নরেশচন্দ্র গোপন করেন নি। রক্তের ঋণে (১৯২২) জননীর লালসা পুত্রের জীবনকে হৃতসর্বস্ব করে তুলেছে।

আদর্শবাদী ডাক্তার মেঘনাদ (পাপের ছাপ। ১৯৩২) অবচেতন মনের লালসার আবর্তে পড়ে বার বার 'জন্ম-অপরাধিনী' মনোরমার জৈবিক আকর্ষণে ধরা দিয়েছে।

আর শান্তিপ্রিয় পরোপকারী গৃহস্থ ললিতবাবু (ললিতের ওকালতি। ১৯৩৯) তাঁর বিধবা যুবতী মক্কেলের অবৈধ প্রেম আকাঙ্ক্ষা করেছে।

কিন্তু এই সব চরিত্র কখনো সুখ পায়নি সান্ত্বনা পায়নি। একটা অসহ অপরাধ-বোধের গ্লানি তাদের শান্তি দেয় নি। লেখক এই চেতন-অবচেতন মনের, বৈজ্ঞানিক সুলভ নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন, কোথাও তার সহৃদয়তার অভাব ঘটে নি। যদিও কোন ব্যভিচার বা চরিত্রের স্খলনকে তিনি অভিনন্দিতও করেননি। কারণ সুস্থ ও সবল একটা সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর ছিল।

'নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত রবীন্দ্র বিরোধী' এই প্রচলিত মন্তব্যের যথার্থতা অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমরা দেখেছি যে রবীন্দ্রনাথ ও নরেশচন্দ্রের সাহিত্যাদর্শ এক না হলেও তিনি রবীন্দ্রবিরোধী নন। কেননা তিনি জানতেন এবং বিশ্বাস করতেন রবীন্দ্রনাথের এই নির্ণয়কে—'যা নিত্য তা অতীতকে সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করে না।' আর রবীন্দ্রনাথ তো অতীত নন তিনি জলন্ত বর্তমান। পঞ্চাশ বছরের বেশী তিনি সাহিত্য চর্চা করেও সে সময় সাহিত্যাকাশের মধ্যগগনে সমহিমায় ভাস্বর। যাই হোক 'সাহিত্য ধর্ম' বিতর্ক আলোচনায় আমরা দেখতে পেয়েছি যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সাহিত্য ধর্ম' প্রবন্ধ নরেশচন্দ্রকে উদ্দেশ্য করে লেখেননি আর নরেশচন্দ্রও এই প্রবন্ধে তিনি আক্রান্ত হয়েছেন ভেবে তাঁর 'সাহিত্য ধর্মের সীমানা' প্রবন্ধটি লেখেন নি।

নরেশচন্দ্র চিরদিনই রবীন্দ্রভক্ত। রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার পরিচয় আমরা পাই তাঁর 'আনন্দমন্দির' (আষাঢ়, ১৩৩০) নাটকের উৎসর্গ পত্রে, যেখানে তিনি লিখেছেন যে তিনি একলব্যের মত দূর থেকে রবীন্দ্রনাথকে গুরুদেব বলে স্বীকার করে নিয়ে শুরু করেছেন তাঁর সাহিত্যচর্চা এবং 'মধ্যবিত্ত' (বৈশাখ, ১৩৬১) পত্রিকার সম্পাদকের প্রশ্নের উত্তরেও একথাই স্বীকার করেছেন। (নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের 'আত্মকথা' দ্রষ্টব্য)

উপসংহারে বলা যায় নরেশচন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবন ও তাঁর সাহিত্যকর্ম উভয়ই বিশিষ্ট এবং স্বাতন্ত্র্য যুক্ত। নরেশচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য আধুনিক বাঙালীর তেমন পরিচিত নয়, তাছাড়া কোন লেখকের সাহিত্যকর্ম তাঁর জীবনভাবনা থেকে আদৌ বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। এই কারণেই নরেশচন্দ্রের জীবন পরিক্রমা আমাদের করতে হয়েছে।

নরেশচন্দ্রের সাহিত্যকর্ম বিশিষ্ট ও স্বাতন্ত্র্য যুক্ত—এটুকু বললেই যথেষ্ট বলা হয় না। বস্তুতপক্ষে বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে অনেকদিন থেকেই নরেশচন্দ্র 'প্রথম' রূপেই বিবেচিত হওয়ার যোগ্য, বহু বিষয়ে কথাসাহিত্যিক নরেশচন্দ্র পথিকৃতের আসনটি দাবী করতে পারেন।

প্রথমত শরৎচন্দ্রের কথা মনে রেখেও স্বীকার করা উচিত যে বাংলা সাহিত্যে নরেশচন্দ্রই বাঙালী জীবনের প্রথম রূপকার যিনি সর্বপ্রকার শুচিবায়ুর ঊর্ধ্বে ছিলেন। সাহিত্যে সর্বস্তরের জীবন এবং জীবনের সর্বস্তরকেই তিনি প্রথম সাদরে বরণ করে নিয়েছিলেন। জীবনের কোন অংশই সাহিত্যে পরিহার্য বলে তিনি মনে করেন নি। জীবনের আপাততুচ্ছ ও আপাতনিন্দনীয় দিকগুলিকেও তিনি সাহিত্যে রূপায়ণ ও বিশ্লেষণের উপাদানরূপে গ্রহণ করেছিলেন।

শুধু এই কারণেও, এই একটি মাত্র কারণেও অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যের বিষয় পরিধির সীমাকে ব্যাপকতা দানের জন্যও বাংলা কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁকে স্মরণীয় পুরুষরূপে আমরা চিহ্নিত করতে পারি।

দ্বিতীয়ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব ও প্রেরণা বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম তাঁর সাহিত্যেই

স্পষ্ট ও নির্দিষ্টরূপে প্রতিফলিত হয়েছে। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের রুশ বিপ্লবের প্রভাব ও প্রেরণা তাঁর উপন্যাসেই স্পষ্টত স্থান পেয়েছে।

তৃতীয়ত রুশ বিপ্লবের সূত্রেই তাঁর কথাসাহিত্যে সাম্যবাদী ধ্যান-ধারণা এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতনতা তাঁর উপন্যাসকে একটি বিশিষ্ট চরিত্র দান করেছে, এ বিষয়ে তাঁকে শুধু পথিকৃৎ বললে কম বলা হবে। এ বিষয়ে তিনি যে মুক্ত উদার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন তা আমাদের এই অতি বিপ্লবী অধ্যুষিত আধুনিক কালের পক্ষেও চমকপ্রদ বলে প্রতিভাত হয়।

চতুর্থত রুশ বিপ্লব তথা মার্কসীয় ধ্যান ধারণার পটভূমিতে আমাদের দেশের তদানীন্তন অর্থনৈতিক ও সামাজিক অসাম্য ও বিচার বৈষম্যগুলি তাঁর সাহিত্যে সময় উপযোগী গুরুত্ব লাভ করেছে। জমিদারী প্রথা প্রসঙ্গে, ব্যক্তিগত মালিকানা প্রসঙ্গে, পুঁজিবাদ প্রসঙ্গে, নরেশচন্দ্রের আক্রমণাত্মক বিশ্লেষণ এবং শোষিত ও নিপীড়িত মানুষের মর্মবেদনায় তাঁর সহৃদয় সহযোগ আমাদের বিস্ময়ে বিমুগ্ধ করে।

পঞ্চমত উপরের চিন্তাসূত্রগুলির আলোকেই ভেবে দেখতে হবে—কেন ও কিভাবে তাঁর কথাসাহিত্য হয়ে ওঠে সেই সব নারীপুরুষের মিছিলের যাত্রাপথ, যারা অনেকেই সমাজ-কারাগারের প্রাচীর লঙ্ঘনকারী মানুষ। অসামাজিক ও অবৈধ প্রেম তাঁর উপন্যাসের একটি প্রধান বিষয় সন্দেহ নেই, কিন্তু একালের তথাকথিত অশ্লীল রচনাবলীর সঙ্গে নরেশচন্দ্রের সাহিত্যের প্রধান পার্থক্য সম্পর্কে আমাদের অবহিত হতে হবে। সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে অনেক সময়ই নরনারীর সম্পর্ক বিশ্লেষণে যে যৌন অভিপ্রায়টি ফুটে ওঠে তা সামাজিক, অর্থ নৈতিক এবং বাস্তবিক পটভূমি থেকে প্রায়শঃই সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন। যৌনতা আসে যেন অশ্লীলতা সৃষ্টির তাগিদে। নরেশচন্দ্রের কথা-সাহিত্যে নরনারীর যৌন সম্পর্ক বিশ্লেষণে একটা সামাজিক, অর্থনৈতিক কারণ ও তাৎপর্য সুস্পষ্ট। সেজন্য তাঁকে কোনভাবেই অশ্লীলতার পরিপোষক কল্পনা করাও অন্যায় এবং অসঙ্গতহবে।

বাংলা কথাসাহিত্যে একাধারে ফ্রয়েডীয় ও মার্কসীয় চিন্তাসূত্রের বিশ্লেষণ তাঁর রচনাতেই প্রথম দেখা গেল। এদিক থেকে জগদীশ গুপ্ত ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নরেশচন্দ্রেরই আত্মীয়। শরৎচন্দ্র বাংলা কথাসাহিত্যে সমাজের উপেক্ষিত নরনারীদের অবতারণা করেছিলেন একথা সত্য বটে কিন্তু শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গী সর্বাংশে বাস্তব সম্মত ছিল কিনা তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করা হয়ে থাকে। নরেশচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গী ও বিশ্লেষণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিকে অবলম্বন করেছে বলে তাকে এ বিষয়ে অধিকতর অগ্রবর্তী বলে মনে হয়।

অবশ্য ভাষা, বাক্য গঠন ও স্টাইল অর্থাৎ সামগ্রিক উপস্থাপনারীতির বিচারে নরেশচন্দ্রের সার্থকতা প্রশ্নাতীত বলে মনে হয় না। তাঁর চিন্তার এবং উপন্যাসের বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব যতটা চমকপ্রদ তাঁর রচনা শৈলী যদি সেই পরিমাণে পরিশীলিত হত তা হলে তাঁকে বাংলা কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে সর্বকালের অন্যতম সেরা কথাশিল্পী রূপে দ্বিধাহীনভাবে আমরা তাঁকে চিহ্নিত করতে পারতাম কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর চিন্তার

স্বকীয়তা ও অভিনবত্ব তাঁর রচনাশৈলীর সীমাবদ্ধতায় কতকাংশে অনতিস্ফুট ও অচরিতার্থ। এই শৈল্পিক সীমাবদ্ধতাই নরেশচন্দ্রের ঔপন্যাসিক সিদ্ধিকে কিঞ্চিৎ দ্বিধাগ্রস্ত করেছে। বেদনা ভারাক্রান্ত চিত্তে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়।

নির্ঘণ্ট